ভারতের গুরু ও গুরুমুখী বিদ্যা

ভূমিকা

মহামণ্ডলেশ্বর ১০০৮ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ গিরি

সম্পাদক

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

শিবরাণী প্রকাশনী

৮বি/২ টেমার লেন ।। কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক
আভা মুখার্জী
শিবরাণী প্রকাশনী
৮বি/২ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি—১৯৫৯

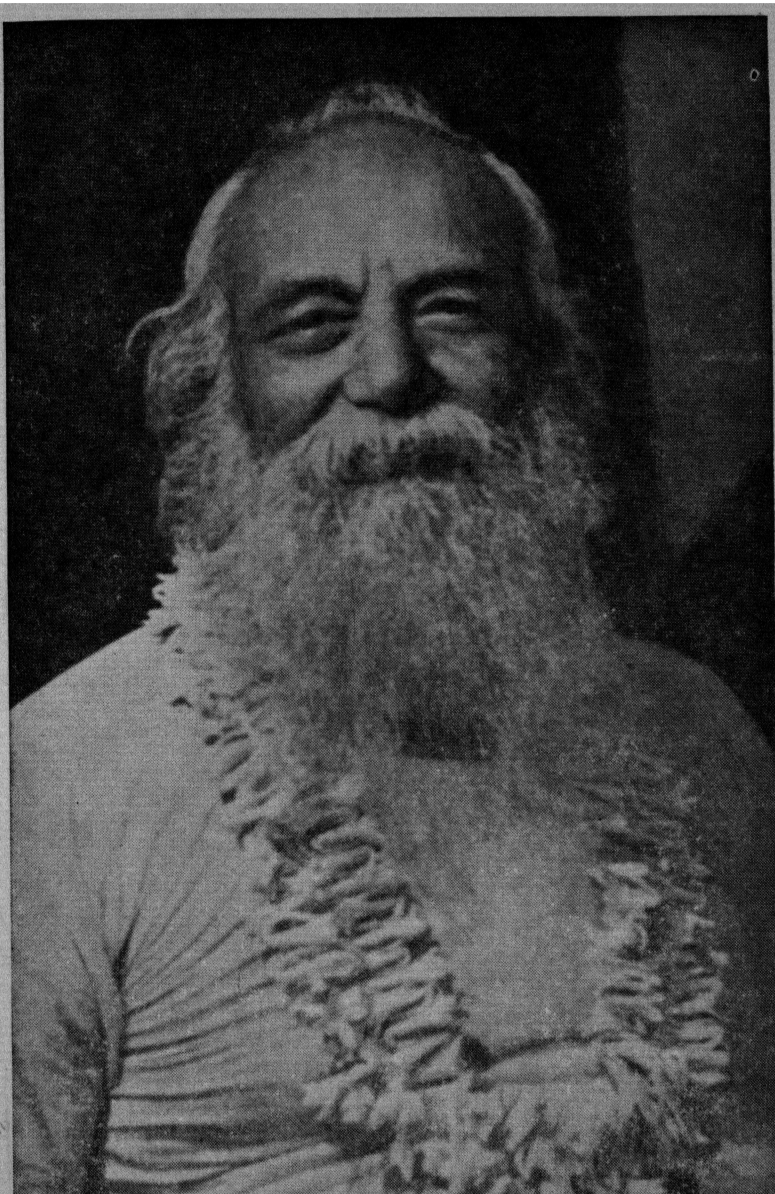
ব্লক : মডার্ন প্রসেস

প্রচ্ছদ শিল্পী :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি মুদ্রণ :
শ্রীকৃষ্ণ আর্ট প্রেস
স্মৃতিকণ্ঠ পাণ্ডা
১, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা—১২

মুদ্রাকর
শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
কলকাতা-৭০০০০৭

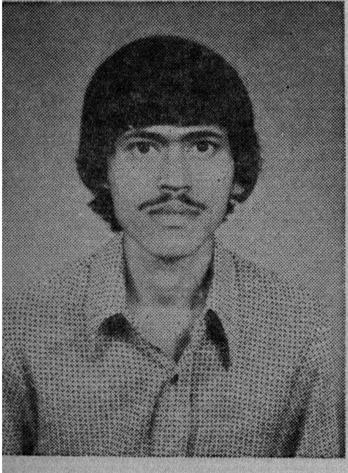
সূচীপত্র



অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব



ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী



উমাশঙ্কর



মধুমিতা দাশগুপ্ত

ভূমিকা

ধর্ম কি ?

ধর্ম-ধারায়তি ইতি ধর্ম। যা ধরে রাখে তাই ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'যাহা পতন হইতে রক্ষা করে তাই ধর্ম।' কোন কারণেই ধর্ম মানে কিন্তু riligion (রিলিজিয়ন) নয়। আমাদের ইংরেজী পড়া বিদ্যে বলেই আমরা riligion-এর অনুবাদ করে 'ধর্ম' শব্দ ব্যবহার করি। তার ফল হচ্ছে আমরা 'ধর্ম' বলতে ভিন্ন বস্তুকে বোঝাচ্ছি। যেমন জলের ধর্ম তৃষ্ণা নিবারণ করা, তরলতা (তরলাকার ধারণ করা); আগুনের ধর্ম তাপ বিকীরণ করা, আলো দেওয়া। যদি কোনো কারণে জল বলে আমি তৃষ্ণা নিবারণ করবো না, কিম্বা জল তার তরলতা ত্যাগ করে, অগ্নি আলো দেওয়া বন্ধ করে—তাহলে বুঝতে হবে জল কিম্বা আগুন তার নিজের স্বধর্মে নেই। হয় জল ফ্রিজে থেকে বরফ হয়েছে নয় আগুনের সঙ্গ করে আগুনের ধর্ম পেয়েছে। জলের পক্ষে তা কল্যাণকর নয়, তেমনি কল্যাণকর নয় আগুনের জলের সঙ্গ করা। সেরকম মানুষের যে বস্তু বজায় থাকলে মানুষ মানুষ থাকে বা যে বস্তু হারিয়ে ফেললে মানুষ আর মানুষ থাকে না—সেই বস্তুই মানুষের ধর্ম।

মানুষের ধর্ম কি ?

'পরোপকার মানুষের একমাত্র ধর্ম। পরপীড়ন একমাত্র পাপ।' —একথা ব্যাসদেব মহাভারতে বলেছেন। যুধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্ম এই প্রশ্ন করেছে। এই ধর্ম কিন্তু ধর্মরাজ যম। যুধিষ্ঠির ধর্মের ছেলে। যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করেছিলেন ধর্মরাজ।

মানুষ ধর্মচ্যুত হয় কখন ?

যখন মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, যখন সে আত্মবিস্মৃত হয়, যখন তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে তখনই সে ধর্মচ্যুত হয়। তাই জন্য গীতা শ্রবণ করে অর্জুন যখন তার

নিজের ধর্ম ফিরে পেয়েছিল তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—'নষ্ট মুহ স্মৃতি র্লব্ধা'। অর্থাৎ আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি স্মৃতিকে ফিরে পেয়েছি। যখন মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হয় তখন তার অনুভব থাকে না কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। স্মৃতি ফিরে গেলে মানুষের চেতনা ফিরে আসে। করণীয়, অকরণীয় সম্বন্ধে বোধ জাগে।

ধর্মের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের কি সম্পর্ক ?

শ্রীমদ্‌ভাগবদগীতায় ভগবান বলেছেন, 'স্বধর্মে নিধনম্ শ্রেয়। পরধর্ম ভয়াবহ।' এই স্বধর্ম কি ? যখন কৃষ্ণ একথা বলেছেন তখন একমাত্র সনাতন ধর্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম ছিল না। গীতার বয়স ৫০৭৮ বছর (আমার মতে ১৯৮৬র এপ্রিলে)। খ্রীষ্টের ধর্ম দু হাজার বছর পুরনো, ইসলাম ধর্ম দেড় হাজার বছর পুরনো। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মে থাকতে বলছেন, পরধর্মে যেতে নিষেধ করছেন। এর অর্থ কি ? তাহলে নিশ্চয়ই ধর্ম বলতে অন্য কিছু বোঝায়।

তোমার পরিচয়, তোমার গুণ, তোমার সত্বা তোমার ধর্ম। তা ত্যাগ করে তুমি ধার করা ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনধারা, জীবনবেদ, মূল্যায়ন গ্রহণ করে নিজেকে বদলালে অনুকরণ করা হবে—কিন্তু তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। একথার প্রমাণ প্রতিদিন আমরা অনুভব করছি না কি ? মহাপ্রভু বলছেন, জীব মাত্রেই কৃষ্ণের দাস। জীব সেবা, ঈশ্বর সেবা। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি চৈতন্য চিন্তার পুনরুক্তি মাত্র।

পরিস্থিতি পরিবেশ আমাদের মনকে কলুষিত করে, চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, বিচারকে বিভ্রান্ত করে, মোহ সৃষ্টি করে, স্মৃতি নষ্ট করে। তখন মানুষ তার স্বধর্মে থাকে না। স্বধর্মে থাকে না বলেই শুধু মত পার্থক্যের অজুহাতে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মারে, বাপ ছেলের সমস্ত গ্রাস করে, স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী হয়, স্বামী স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারে, ঋণ নিয়ে সুযোগ পেলে ঋণদাতাকে ঋণী অস্বীকার করে, কৃতজ্ঞতার স্থান দখল করে কৃতঘ্নতা। এই বিস্মৃত স্বধর্মকে ফিরিয়ে দেওয়াই হলো আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। 'আচার' শব্দের অর্থ আচরণীয় কি তা বলে দেওয়া।

যিনি বলে দেন তিনি আচার্য। যিনি শিষ্টভাবে তা পালন করেন তিনি শিষ্য।

এই আচারের জন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

'মন না রাঙায়ে বসন রাঙালি, কি ভুল করলি যোগী'—কথাটা ঠিক। কিন্তু বাহ্যিক আচরণের কিছু প্রয়োজন আছে। সাধুকে বলে, ধুনিকে চেতন রাখো। অর্থাৎ তোমার ধুনি যেন স্বশিখায় জ্বলে। যতক্ষণ ধুনি স্বশিখায় জ্বলে তার লেলিহান শিখা বাতাসে দোলে, ততক্ষণ কাঠের ছাই কাঠের নীচে পড়ে যায়। যখন কাঠকয়লার মত কাঠ ধিকিধিকি জ্বলে তখন কাঠের ছাই কাঠের ওপরে জমে। তারপর সেই জমা ছাই আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

তেমনি আমাদের নিত্য অভ্যাসের অভাব, আচার অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে তোলে। সেই নিষ্ক্রিয়তা আমাদের জীবনে আনে জড়তা, অনুৎসাহ, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আত্মহনন ও চরিত্র হনন। যুদ্ধ তো পরের কথা, শিবিরে সৈনিক নিত্য প্যারেড করে শুধুমাত্র প্রস্তুত থাকার জন্য। যাতে বিউগল্ বাজা মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। নইলে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে দোল ফুরিয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দুঃখ করেছেন প্রস্তুত না থাকার জন্য। পাওয়ার মুহূর্ত বৃথা চলে যায়। কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী,/(সে) পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনী।/ কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধূলো যত।/কে জানিতো আসবে তুমি গো অনাহতের মত/—সেই চরম মুহূর্ত অনাহতের মতোই আসে, অলস নিদ্রায় দিন কেটে যায়। হয়তো সে মুহূর্ত আর ফিরে আসে না, জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়। 'আপন কাজে অচল হলে চলবে না। ফল ফলবে না ফল ফলবে'না।' নিত্য আচরণ সেই চেতনাকে জাগিয়ে রাখা, অনুভবকে সচেতন করে রাখার উপায় মাত্র।

মানুষের করণীয় কি?

আমরা কামনা-বাসনা এই যে রিপুগুলো আছে এগুলোকে সংযমের দ্বারা, প্রত্যাহারের (withdrawn) দ্বারা, তিতিক্ষার দ্বারা দাবিয়ে রাখি। খানিকটা স্প্রিং (spring) এর মত। সুযোগ পেলেই সে বাঁধ ভেঙে যায়। রামকৃষ্ণ-দেব বলেছেন, যার ঈশ্বর দর্শন হয় তার দেহ থেকে কাম-কামনা চলে যায়, সে আর দেহ-সুখ ভোগ করতে পারে না। কিন্তু ক'জনের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ঘটে? তারা কি করবে? অভ্যাস এবং প্রত্যাহারের দ্বারাই ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের তপস্যা করতে হবে। বাসনা-কামনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ভোগ্যবস্তু থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু দূরে থাকলেই মন থেকে কামনা-বাসনার

বিসর্জন ঘটে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, যারা ভোগ্যবস্তু থেকে বাহ্যত বিরত থাকে, কিন্তু মনের মধ্যে তাদের তৃষ্ণা ও বাসনা থেকে যায় তারা তস্কর। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলিতে' গানের মধ্যে বলেছেন, যা জলবার আছে তা একেবারে জ্বলে যেতে দাও, তাতে আবার জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে না।

এ নিয়ে দীর্ঘ তর্ক চলছে সাধু সমাজের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে। বেদান্ত বলছে, আগুনে ঘি দিয়ে আগুন নেভানো যায় না, তাতে আগুন বেড়ে যায়। তেমনি ভোগের দ্বারা নিবৃত্তিতে পৌঁছনো যায় না, ভোগ-বাসনা বেড়ে যায়। কখনো তৃপ্তি আসে না। দেহের এই রিপুগুলোকে শত্রু জ্ঞানে শরীব থেকে বিতাড়িত করার জন্য মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন করে। উপবাস করে। নামমাত্র আহার গ্রহণ করে। এমন কি ব্রহ্মচারী অবস্থায় দুধ পর্যন্ত খেতে বারণ করে। উদ্দেশ্য একই। তাতে শরীরটা শুকিয়ে যায়। রসবৃদ্ধি কম হয়। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, তারা বলতে চায় যে মনের ভেতর থেকে যদি বৈরাগ্য না আসে তাহলে বাহ্যত বিষয়বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়।

বৈষ্ণবেরা সুন্দর কথা বলে। বলে, কামনা জয় করতে পারছো না। কৃষ্ণকে কামনা করো। কৃষ্ণ তৃষ্ণা, কৃষ্ণ ক্ষুধার মধ্যেই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হলে কামনা-বাসনা নিঃশেষ হয়ে যায়।

কোন কোন তন্ত্র বা শৈব মতে ভিন্ন কথা বলে। তারা নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করতে চায় প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে দিয়ে। তাই তারা এমন বিধিও দিয়েছেন যে বিবস্ত্র উলঙ্গ সুন্দরী যুবতী নারীকে বাম উরুতে রেখে দক্ষিণে কারণ-পাত্র রেখে তুমি এমন ভাবে ধ্যান মগ্ন হয়ে যাও যেন তোমার হৃদয় কামনা স্পর্শ করতে না পারে। খানিকটা সোনার পাথরবাটির মত শোনায়। জলে নামবে জল ছোঁবে না—এই ভজন পদ্ধতি এই তন্ত্র চিন্তা থেকে এসেছে। আবার রামকৃষ্ণদেবের কথা বলি। তিনি বলেছেন, এটি বিপদ্‌জনক পথ। এই পথে পদস্খলনের সম্ভাবনা বেশি। আমাদের এই পথে না যেতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সহজ সরল নাগা—তারা—তারা তো তত্ত্বকথায় নেই। তাদের শাস্ত্র চচা কম। গুরুভক্তিতে বিশ্বাসী। গুরুর কাছে প্রার্থনা করে আমার কামনা-বাসনা তুমি হরণ করে নাও। তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের রক্ষা করো। এই রক্ষা করার সহজ উপায় হিসাবে ওরা আবিষ্কার করেছে যে যদি কামভোগের ইন্দ্রিয়কেই নষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে তার পক্ষে কাম জয় সহজে করা সম্ভব। এমনও নাগা আছে যারা লিঙ্গের ওপর লোহার আংটি পরিয়ে

রাখে। উদ্দেশ্য একই। বৈষ্ণবদের মধ্যে কাঠিয়া সম্প্রদায় পাওয়া যায়। যারা কাঠের কৌপীন পড়ে। উদ্দেশ্য তাদেরও এক।

কিন্তু এই কথা মানতে বাধ্য এগুলিও বাহ্যিক। মানসিক সংযম ভিন্ন কোন সংযমই ফলবতী হয় না। সেকারণে শৈব এবং তন্ত্রের বহু সাধক সনারী সাধনায় বিশ্বাসী। আমাদের সনাতন ধর্মেও স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলেছে। শুধু শয্যাসঙ্গিনী নয়, সাধনসঙ্গিনী। ভজন সহযোগী। সত্যি বলতে কি, দেহ যদি অনুকূলে না থাকে তাহলে সেই দেহের পক্ষে ভজন সাধন যেমন অসম্ভব, তেমনি একজন পুরুষের পক্ষে যদি তার সহধর্মিণী ভজন অনুকূল না হন তাহলে তার ভজন অসম্ভব। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সহজ সরল প্রার্থনা আছে—মার কাছে চাইছে : "ভার্যাং মনোরমাং দেহি মম বৃত্তানুসারিণী"—অর্থাৎ আমার মনোরঞ্জন করে এমন ভার্যা আমাকে দাও, যে আমার মনোবৃত্তির অনুগামী।

কিন্তু এ প্রার্থনা প্রার্থনাই থেকে যায়। দাসী বলে যারে আনি ঘরে, দাস কবে রাখে সে আমারে। এবং এই দাসত্ব করার মধ্যে আমরা সুখ পাই। কুকুরে হাড় চিবোয়, মাড়ি থেকে রক্ত ঝরে। কুকুর ভাবে হাড় দিয়ে রস বেরুচ্ছে। সুখে চিবিয়ে যায়। আমাদের ভোগ চিন্তা সহজে নিবৃত্তিমার্গে যেতে চায় না। যখন আঘাত পাই, যখন শোক পাই তখন সাময়িকভাবে মর্কট বৈরাগ্য আসে। যার নাম শ্মশান বৈরাগ্য। বউয়ের সঙ্গে রাগ করেছি। বললাম, 'রইলো তোমার ভাত আমি চললাম।' এক ঘণ্টা পর এক চক্কর ঘুরে এসে বলি, 'যাক্ এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম। ভাত দাও।' শ্মশানে মড়া পোড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরলাম না। সাময়িক বৈরাগ্য। কিন্তু এ থেকেও অনেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

আসলে কি জানো, গাছ থেকে টেনে ফুলটা বার করা যায় না। গাছে ফুল ফোটার জন্য গাছের চর্যা করতে হয়। আবার গাছের বীজকে অস্বীকার করা যায় না। বীজটা গুরুমন্ত্র, বীজটা সংকল্প, বীজটা উদ্দেশ্য, কারণ শুদ্ধি। শ্রীবিদ্যায় এর সহজ সমাধান করেছেন। একটি বিন্দুকে মাঝখানে রেখে একটি ত্রিভুজ এঁকে দিয়েছেন। আর একটা ত্রিভুজ উল্টে দিয়েছেন সমান সমান ভাবে। এর তিন কোণে তিন কথা। ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান। যেমন ইচ্ছা তেমন ক্রিয়া। যেমন ক্রিয়া তেমন জ্ঞান। আবার যেমন জ্ঞান, তেমনি ইচ্ছা, তেমনি ক্রিয়া। যারা বলে ইচ্ছাবৈ তারা তো নেই। সকলি তোমার ইচ্ছা। তারা ইচ্ছাশক্তির একটা বিরাট ভূমিকাকে অস্বীকার করে। যদি কামনা বাসনার উর্দ্ধে উঠতে হয় তাহলে মূল ভোগ ইচ্ছাকে পরিবর্তন করা দরকার। এবং তা সম্ভব জ্ঞানের

দ্বারা। সেই জ্ঞান সম্ভব তোমার ক্রিয়াকে অনুকূল প্রবাহে আনতে পারার ওপর।

একটা কুকুর যার শিক্ষা আছে সে অপরের খাবারে মুখ দেয় না। একটা শিক্ষিত বেড়াল মাছ পাহারা দেয়, শিক্ষিত মনের নাম বিবেক। বিবেক জন্মগতভাবে জ্ঞানের প্রদীপ। ইচ্ছার বাতাস দিয়ে সে প্রদীপকে নিভিয়ে দিই আমরা। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ছোটখাট ইচ্ছা পুড়িয়ে নিবি। বড ইচ্ছাব জন্য মাকে ডাকবি। বড় কিছুর জন্য মাকে ডাকবি।

মহামণ্ডলেশ্বর ১০০৮ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ গিরি

['বর্তমান' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে পবম পূজনীয় মহাবাজেব অতিথি হয়ে ১৯৮৬ সালেব এপ্রিল মাসে হবিদ্বারে কুম্ভমেলায় উপস্থিত হই। সেই সময় প্রতিদিন তিনি আমাকে আমাব পবিকল্পিত গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে এই প্রশ্নগুলি এবং উত্তবগুলি লিখে নিতে বলেন। বিগত ৫ই আগষ্ট ৮৭ (১৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪) বিনামেঘে বজ্রাঘাতেব মত তিনি ব্রহ্মলোকে লীন হযেছেন। গ্রন্থটি এবং লেখাগুলি তিনি দেখে যেতে পারলেন না। —সম্পাদক]

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক আত্মাকে সম্পূর্ণ হতেই হয় এবং প্রত্যেকটি জীবই শেষ পর্যন্ত পেঁাছায় সম্পূর্ণতার স্তরে। আমাদের বর্তমান অবস্থা হল আমাদেরই অতীতের কর্ম ও চিন্তার ফলাফল; আর ভবিষ্যতে আমরা যা হব তা হ'ল আমাদের বর্তমান চিন্তা ও কর্মের ফলাফল। কিন্তু এই যে আমাদের ভবিতব্য গঠন—এখানে বাহির থেকে সহায়তা লাভের কথাটা বাদ যাচ্ছে না। বরং অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় এইরকম সহায়তা একান্তই দরকার। এই সহায়তা যখন আসে আত্মার ঐ সমুচ্চক্ষমতা ও সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়, অধ্যাত্মজীবন জাগ্রত হয়, বৃদ্ধি সতেজ হয় এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ পবিত্র ও সম্পূর্ণ হয়।

এই তরান্বিত প্রেরণা গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায় না। এক আত্মা কেবল অন্য আত্মা থেকেই প্রেরণা পেতে পারে। সারা জীবন ধরে আমরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ পাঠ করে যেতে পারি, খুব ধীসম্পন্ন হতে পারি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই আমরা আধ্যাত্মিক দিক থেকে মোটেই উন্নত হইনি। মানুষের ভিতর উচ্চস্তরের ধী-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমানুপাতিক ভাবে আধ্যাত্মিক দিকটারও উন্নতি হবে একথা যথার্থ নয়। বই পড়তে পড়তে আমরা ভ্রান্তি-বশত এমনটা ভাবি যে এতে আমাদের আধ্যাত্মিক দিক থেকে সাহায্য হচ্ছে, কিন্তু আমাদের উপর গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রভাবটা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব এতে আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিই লাভবান হয়—আভ্যন্তরীন শক্তি নয়। আধ্যাত্মিক বিকাশ তরান্বিত করতে গ্রন্থের এই অপর্যাপ্ততার কারণেই আমরা অধ্যাত্ম বিষয়ে অতি চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ও সত্যিকার অধ্যাত্ম জীবন যাপনে বড় ভয়ানকভাবেই অযোগ্য হয়ে পড়ি। শক্তিকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে অন্য আত্মা থেকে প্রেরণা লাভ করতেই হয়।

যাঁর আত্মা থেকে এইরূপ প্রেরণা আসে তাঁকেই বলা হয় গুরু বা শিক্ষাদাতা; আর, যাঁর আত্মায় ওই প্রেরণা সঞ্চারিত হয় তাকে বলে শিষ্য বা ছাত্র। প্রেরণাকে এক আত্মা থেকে অন্য আত্মায় সঞ্চারিত করতে হলে প্রথমত আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হল প্রেরণাদানকারী আত্মার যেন প্রেরণা সঞ্চালিত করার মতো ক্ষমতা থাকে, এবং দ্বিতীয়ত, প্রেরণা গ্রহণকারী

আত্মারও যেন সঞ্চালিত হবার মতো যোগ্যতা থাকে। বীজকে হতে হবে প্রাণবন্ত; এবং জমিনকে হতে হবে প্রস্তুত এক কর্ষিত ক্ষেত্র; এই দুই শর্তই পূর্ণ হলে পরমাশ্চর্যরূপে এক বিশুদ্ধ ধর্মভাব দেখা দেয়। "যথার্থ ধর্মপ্রচারককে হতে হয় আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং তাঁর শ্রোতাদেরও হতে হবে সচেতন কুশলী।"—আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা; এবং দুজনেই আশ্চর্য প্রকৃতির ও অসাধারণ ব্যক্তি হলে ঘটে যায় এক বিস্ময়কর অধ্যাত্ম জাগৃতি, অন্যথায় তা হয় না। একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তিই হন যথার্থ শিক্ষাদাতা, এবং একমাত্র ঐরূপ ব্যক্তি হন যথার্থ ছাত্র—যথার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অন্য সবাই কেবল আধ্যাত্মিকতা নিয়ে ছেলেখেলা করে থাকে। তাদের মধ্যে একটুখানি ঔৎসুক্যই মাত্র জাগ্রত হয়, তাদের মধ্যে জলে ওঠে একটুখানি বুদ্ধি জাতীয় উচ্চাকাঙ্খা, তবে তারা ধর্মরাজ্যের দিগন্ত সীমায় একটুখানি দাঁড়াতেই পারে মাত্র। অবশ্য, এরও যে কিছু মূল্য না আছে তা নয়, কারণ কালক্রমে তা ধর্মের জন্য সত্যিকার তৃষ্ণাও জাগিয়ে তুলতে পারে। আর, প্রকৃতির এক রহস্যময় বিধান হল—জমিন তৈরী হলেই বীজ এসে পড়ে, এবং এসে পড়বেই। মানুষ যখন মনে প্রাণে ধর্মলাভের জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে ধর্মীয় শক্তির সঞ্চালক নিজে দেখা দিয়ে আত্মার সহায়ক হবেই। গ্রহণকারী আত্মা যখন ধর্মের আলোক-জাত আকর্ষণ-ক্ষমতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন ঐ আকর্ষণে সাড়া দিয়ে স্বতই আলোক প্রেরণ করে।

অবশ্য, এই পথে কিছু ভয়ানক ধরণের বিপদও থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রহণকারী আত্মার ক্ষণিকের আবেগকেই যথার্থ ধর্মীয় তৃষ্ণা বলে ভুল করা এক বিপদ। আমরা তা আমাদের মধ্যেও দেখতে পারি। আমাদের জীবনে কতবার দেখি আমরা যাকে ভালোবাসতাম সে মারা গেল, আমরা ভয়ানক আঘাত পেলাম, মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল; তখন চাই সুনিশ্চিত ও উচ্চতর কিছু—তখন আমাদের মনে হয় আমাদের ধার্মিক হতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ অনুভবের তরঙ্গ মিলিয়ে যায় এবং আমরা পড়ে থাকি ঠিক আগে যেখানে ছিলাম। এহেন প্রেরণাকে আমরা সকলেই ধর্মের জন্য সত্যিকারের তৃষ্ণা বলে ভুল করি; কিন্তু যে পর্যন্ত এই সাময়িক আবেগের ভ্রান্তি ঘটে সে পর্যন্ত অবিরাম ধর্মের জন্য আত্মার সেই অবিরাম এক যথার্থ আকাঙ্খা দেখা দেবে না, এবং আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও আমরা আধ্যাত্মিক প্রেরণা-সঞ্চালক সত্যকার কিছুরও সন্ধান পাব না। তাই, যখনই আমরা সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে অভিযোগ করে বলি—এত আকাঙ্খার

ফলও ব্যর্থ হল, তখন অমনধারা অভিযোগের বদলে আমাদের প্রথম কর্তব্য হল আমাদেরই আত্মার ভিতরে দৃষ্টিপাত করা এবং সন্ধান করা আমার হৃদয়ের আকাঙ্খাটি যথার্থ কিনা। এবং তখন ধরা পড়বে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরাই সত্যকে লাভ করার যোগ্য ছিলাম না—যথার্থ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা আমাদের ছিল না।

যে গুরু সঞ্চালক তাঁর সম্পর্কে রয়েছে আরো বড় রকমের বহু বিপদ। অজ্ঞানতায় মগ্ন থেকেও অনেকেই আত্ম-অহঙ্কারে ভাবে যে তারা হলেন সর্বজ্ঞ, এবং এখানেই তারা থামেনা বরং অন্যকেও স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে নিয়ে যেতে চায়; আর তখন এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ-চালনা করতে গেলে দুজনেই খাদে পড়ে যায়।

অবিদ্যাযামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

"অন্ধকারে বাসকারী, স্বমতে বুদ্ধিমান, মিথ্যা জ্ঞানে স্ফীত ব্যক্তি ইতস্তত সঞ্চরণ করে—অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায়।"—(কঠোপনিষদ ১।২।৫) জগৎ এদের দ্বারাই পূর্ণ। প্রত্যেকেই হতে চায় শিক্ষাদাতা, প্রত্যেকটি ভিখারীই দান করতে চায় লক্ষ লক্ষ টাকা। এহেন ভিখারীরা যেমন হাস্যকর, তেমনি ঐ শিক্ষাদাতাগণও।

স্বামী বিবেকানন্দ

গুরু এবং তাঁর শিষ্য

যদি হিন্দু ধর্মের মতবাদগুলি যথেষ্ট প্রশস্ততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে স্পষ্টরূপে রূপায়িত হয়, তবে সন্দেহ নাই চিন্তা বা মননের সকল দিকের চাবিকাঠি পাওয়া যাবে। মানুষের মুক্তির জন্য অবিরাম ধারণার বিস্তারে নিজের ভূমিকা পালন করে যাওয়া হিন্দুধর্মের দূর কল্পনার উদ্দেশ্য এবং জগৎ ব্যাপী প্রতিটি পরিকল্পনায় জ্ঞানার্জনের অকথিত প্রচেষ্টা। হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের উৎস সম্পর্কে ধম্মপাদের এই কথাগুলির চেয়ে আরও ভাল ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই। "আমরা যা কিছু হয়েছি, সবই আমাদের পূর্ব চিন্তার পরিণাম। এর প্রতিষ্ঠা আমাদের চিন্তার ওপর, আমাদের চিন্তা থেকেই এ উদ্ভূত।" সারা পৃথিবীতে এই একমাত্র সত্যের ওপর ধর্ম প্রতিষ্ঠাব স্বপ্ন দেখতে একজন ভারতীয় চিন্তাশীলের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে ধর্মীয় মতবাদরূপে ভারতে গুরুভক্তির বিষয়টি সর্বাধিক কৌতূহলপূর্ণ ও উন্মোচনের পক্ষে কঠিন। কোন একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বে পৌঁছতে হলে, সেই তত্ত্বের গুরুর নিকট মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করতে হয়, এবং এইসঙ্গে যখন তাঁকে ব্যক্তিগত সেবা করা হয়, সত্য যে, ছাত্রকে বিশ্বাস, অর্জনের জন্য পরীক্ষিত হতে হয়। কিন্তু আমরা যদি মনে করি এ শুধু ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহলে আমরা ভুল করব, যেমন আমরা ভুল করব শুধু ধর্মের রঙ-মাখানো কতকগুলি ঘটনা শেখানোর জন্যে যদি কাউকে আমরা গুরু বলি।

সব সত্যের জন্যই আমাদের ভাবগ্রাহী মনোভাব থাকবে। যাঁর কাছ থেকে আমরা শিখব, তাঁর বা তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে। আমাদের সশ্রদ্ধ বাধ্যতার ওপর বয়স, মর্যাদা ও আত্মীয়তা ইত্যাদি সবারই দাবি থাকবে, কিন্তু চরিত্র ও শিক্ষার প্রতি আমাদের যে গভীর বশ্যতা থাকবে, তা থেকে কোন কিছুই জয় করতে পারবে না। সব শিক্ষাদাতার মধ্যে এমন একজন হবেন, যাঁর নিজের চরিত্রই হবে প্রধানতম শিক্ষা। তিনি একাই সেই পথ প্রদর্শক, যার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মিশে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি বিষয়ে আমরা নিজেরা যা করি, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও, আমাদের সব সময় শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের উৎসটির কথা মনে রাখতে হবে। যার সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হোক না কেন, সে যেন আমাদের সম্ভাব্য জ্ঞানদাতা হিসাবেই প্রতিভাত

হয়। আমরা এই উপলব্ধির সন্ধানে থাকব যে, প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছে। এইভাবে মনোযোগের অভ্যাস, অপরের জ্ঞান ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নতুন কোন সত্যের আকাঙ্খা, সবই যে উন্নত সমাজে মিশতে অভ্যস্ত, তার পরিচয়। নিজমতে একগুঁয়েমি এবং ভাব বা নীতিব ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্বের বিস্মৃতি অপেক্ষা ইতরতা ও সৎ সংসর্গের অভাবের সবচেয়ে বড় পরিচয় সম্ভবত আর কিছুই নাই।

এই ধরণের ভুলগুলির প্রতি তরুণরা প্রতি পদক্ষেপেই প্রলুব্ধ হয়, যে যুগে নতুন কোন ভাবধারা গৃহীত হয়ে থাকে। ঘটনা এই যে, তারা তাদের পিতাদের পথ থেকে বিচ্যুত এবং তাদের পিতারা যে একটি বিশেষ বিষয়ের ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী এ বিষয়ে তারা অন্ধ। এমনকি নতুন ভাবধারার মধ্যেও তাদের চেয়ে অগ্রজ ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিরা আছেন। যে ভাবেই হোক, কোন ভাবধারার যথেষ্ট মূল্য থাকে না যদি সামাজিক সুসঙ্গতি ও প্রাচীনতর সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি না থাকে। তবু, এই অসতর্কতা ও নম্রতার অভাবের জন্যই একজন তরুণ তার নিজের মুখের ওপর একটি সুন্দর সমাজের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে। তাকে একবার পরীক্ষা করা হয়, অতঃপর নিকৃষ্টতর সঙ্গীদের মধ্যে সে মিশে যায়। তার জ্যেষ্ঠরা তাকে সহনশীলতার বাইরে মনে করে। যদি কোন তরুণ নিজের নেতৃত্বে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, তবে সে একটি সামাজিক আবর্জনা। বিরাট প্রেরণাগুলি উপযুক্ত শিষ্য, শহীদ ও আত্ম-নিবেদিত সেবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, যার মধ্যে সমান অংশে আছে আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও নম্রতা। যারা নিজেরা নেতৃত্ব দিতে উৎসুক, তা যে কোন টাকা পয়সা লেন-দেনের টেবিলের অন্তরাল থেকে অথবা কোন বৃহৎ অট্টালিকা থেকে ভাড়ায় পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃত নেতাদের আমরা একেবারেই বুঝতে পারি, তাঁরা তৈরি হন, জন্মান না। বিশ্বস্ত অনুগামীদের মধ্য থেকেই তাঁরা আসেন। প্রচুর সেবা, গভীর ও নম্র চেতনার সাহায্যে, এসো, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব তাঁদের প্রস্তুত করি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "সেই সব আত্মা, যাঁরা গুরু হতে জন্মেছেন, তাঁরা ছাড়া প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ গুরুগিরির পাহাড়ের ওপর জাহাজের বিপর্যয় ডেকে আনে।" এসো আমাদের উচ্চাকাঙ্খাকে চাবুক চালিয়ে উৎসাহিত করি, কারণ ত্রুটি অন্য কিছুতে নয়, শুধু এই গুলিতেই অনুপস্থিত।

মানবতার নির্দিষ্ট সারিতে যত কিছু উপস্থিত, গুরু সেগুলির সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ ঘটিয়ে দেন। তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত জীবনে প্রবেশ করি, যেমন আমাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষের শরীর লাভ করি। তিনি তাঁর কাল পর্যন্ত সব কিছুরই প্রতিরূপ আমাদের জানার জন্যে উপস্থাপিত করেন। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে প্রথম, তাঁর শেখার অসাধারণ ক্ষমতা।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্রদের শেখার জন্য অনুশীলন করানো। যিনি একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে সর্বাধিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, তিনিই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান নেতা। শিক্ষার সর্বোচ্চ পরিচয় আনুগত্য স্বীকারের ক্ষমতা। আনুগত্য নির্বোধ বা নিষ্ক্রিয় নয়। অর্জুন একাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শোনেননি। তাঁর স্পর্শ অনুভূত হয়েছিল ও তাঁর কথাগুলি আনন্দিত ঘোড়াগুলির দ্বারাও শ্রুত হয়েছিল। আমরা একথাও নিশ্চয়ই ভুলবো না, যে শব্দতরঙ্গগুলিতে গীতার সৃষ্টি, তা রথের মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়েছিল। রথ, ঘোড়া এবং মানুষ সকলেই শুনেছিল, কিন্তু তাদের তিন প্রকারের আনুগত্যের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল না? না, দুজন মানুষ শুনতে পারে পৃথকভাবে। অসময়োচিত কাজের চেয়ে স্থূলতর আর কিছুই নাই। কিন্তু যে আনুগত্য বা বশ্যতা আমাদের অগ্রগতিকে সূচিত করে, তা তীব্র আবেগপূর্ণ, অলস নয় এবং এর মধ্যে আমাদের অতীতের সব প্রচেষ্টার ফল নিহিত।

গুরুর ক্ষমতাই আমাদের উপলব্ধির পিছনে শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের প্রচেষ্টার ধারা যাই হোক, এর মূল্য খুবই কম, যদি আমরা নির্জন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই ও আবার সর্বত্র নতুন করে শুরু করি যেন মানুষের আবিষ্কারগুলি স্বতন্ত্র সঙ্কেত। গুরুর সঙ্গে অভিন্নতার জন্যেই আমাদের এই স্থান, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। আমরা যতই জানব, মানবিক জ্ঞানের জন্য আমাদের অবদান ততই ক্ষুদ্র মনে হবে। আমরা যতই জানব, ইতিহাস ততই উচ্চনাদে আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, আমরা যতই মহান পুরুষদের কাজের পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে পারব, ততই আমাদের নেতৃবর্গের মত আমরাও কষ্টের সঙ্গে দেখব, তার হয়ে নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা কী কঠিন!

এবং যখন আমরা মিলনের পূর্ণতার মধ্যে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারব, তখন শুধুমাত্র তখনই আমরা গুরুকে ভুলতে পারব ও মুক্ত হতে পারব। কারণ জ্ঞানী, জ্ঞাত এবং জ্ঞান সব এক হয়ে যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা (মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্)

আমার গুরুদেব ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যখন অধর্মের গ্লানি ধর্মকে আচ্ছন্ন করে, তখন মানবজাতিকে সাহায্য করার জন্য আমি অবতরণ করি। ক্রমবিকাশ ও নতুন নতুন পরিস্থিতির জন্য আমাদের এই বিশ্বজগতে যখন কোনো সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখন এক শক্তি তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের বিচরণ সেহেতু এই দুটি ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যের আবির্ভাব হয়। বর্তমানে বস্তুগত সামঞ্জস্যের সমন্বয়ে ইউরোপই প্রধান ভিত্তি, অপরপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতে সামঞ্জস্য সাধনে এশিয়াই হল বিশ্ব-ইতিহাসের প্রধান ভিত্তি। বর্তমানে আধ্যাত্মিক জগতে আরো একটি সামঞ্জস্যের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

অধুনা বিশ্বে বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা তার গৌরব ও ক্ষমতার শীর্ষে উপনীত; অহোরাত্র বস্তুর ওপর নির্ভরতা মানবসমাজকে তার দিব্য প্রকৃতির অনুভূতি সম্পর্কে প্রায় ভুলিয়ে দিচ্ছে, ফলতঃ সে অর্থকরী যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে—এই অবস্থায় আর একবার সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। এসেছে সেই শক্তি; উচ্চারিত হয়েছে সমন্বয়ের সেই বাণী, যা কিনা বস্তুবাদের মেঘকে অপসারিত করবে। সেই শক্তির ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে যা অচিরেই মানবজাতিকে তার প্রকৃত স্বরূপের কথা বলবে। আর এশিয়া থেকেই আবার শুরু হবে সেই শক্তির জয়যাত্রা।

শ্রমবিভাগের নীতির ওপর ভিত্তি করেই আমাদের জগৎ সংগঠিত। একজন ব্যক্তি সব কিছুর অধিকারী—একথা বলা অর্থহীন। কোন একটা জাতিই যে সব বিষয়ের অধিকারী হবে—এই ধরনের চিন্তাও যুক্তিহীন। তবু আমরা কত ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষী করেই শিশু ভাবতে পারে, বিশ্বসংসারে খেলনাই একমাত্র লোভের জিনিস। সেইরকম, জড়শক্তিতে শক্তিশালী জাতি ভাবে, জড়বস্তুই লোভনীয়, জড়শক্তিই প্রগতি ও সভ্যতা; অন্য কোনো জাতি যারা এই শক্তিকে পরোয়া করে না অথবা এই শক্তিতে অবিশ্বাসী তাদের মনে করে মূল্যহীন, তারা বেঁচে থাকার অধিকারী নয়, তাদের গোটা অস্তিত্বটাই অর্থহীন! অপর পক্ষে প্রাচ্যের জাতি সমূহ মনে করে শুধুমাত্র বস্তুবাদী সভ্যতা একেবারে নিরর্থক।

প্রাচ্যজগত থেকে উচ্চারিত বাণী সমগ্র বিশ্বকে একদা বলেছিল—আধ্যাত্মিকতা নেই এমন কোন ব্যক্তির অধিকারে যদি বিশ্বের সব কিছু থাকে, তবে তা হবে অর্থহীন। এটাই হল প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গি, আগেরটি পাশ্চাত্য। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিরই নিজস্ব মহত্ব ও মহিমা আছে। উভয় আদর্শের মিলনে হবে বর্তমান সমন্বয়। পাশ্চাত্য জাতির কাছে চেতনার জগত যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতিব কাছে আধ্যাত্মিক জগত তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যা কিছু চায় বা আশা করে, যা থাকলে জীবনকে সত্য বলে মনে হয়, আধ্যাত্মিক জগতেই সে তা পেয়ে যায়। পাশ্চাত্যবাসীর চোখে সে স্বপ্নবিলাসী, সেইরূপ প্রাচ্যবাসীর চোখে পাশ্চাত্যও স্বপ্নবিলাসী—কারণ পাঁচ মিনিটের কল্পনার এমন পুতুল নিয়ে সে খেলছে। আর যে মুষ্টিমেয় বস্তুকে এক দিন না একদিন ত্যাগ করে যেতে হবে—তাকেই পাশ্চাত্যের বয়স্ক নারী পুরুষরা বড় করে দেখেন—এটা চিন্তা করে প্রাচ্যবাসীরা হাসেন। একে অন্যকে অবাস্তব স্বপ্ন-বিলাসী মনে করে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানব প্রগতির জন্য উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন; মাপ করবেন—আমার মনে হয় প্রাচ্যই অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র মানবসমাজকে কখনো সুখী করেনি, কখন করতে পারবেও না। যে আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, যন্ত্র আমাদেব সুখী করবে, সে বলে যে যন্ত্রেই সুখ আছে; কিন্তু সুখের সন্ধান মনের গভীরেই পাওয়া সম্ভব। যে মনের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে, কেবলমাত্র সে-ই সুখী হতে পারে, অন্য কেউ নয়।

আর যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করতে পারে, তাকে কেন মহৎ ও বুদ্ধিমান বলবো? প্রকৃতি কি তার তুলনায় লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করে না? তাহলে প্রকৃতির কাছে নত হয়ে তার পূজা করো না কেন?

যদি তোমার বিশ্বের সকল পদার্থের ওপর আধিপত্য বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের সমস্ত পরমাণুর ওপর প্রভুত্ব করতে পার, তাতেই বা কি হবে? যতদিন মানুষ তার নিজের ভিতর সুখী হবার শক্তি অর্জন না করে, এবং যতক্ষণ না সে নিজেকে জয় করতে পারে, ততদিন সে সুখী হতে পারবে না। এটা সত্যি যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য, কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীরা 'প্রকৃতি' অর্থে বস্তু বা বাহ্য প্রকৃতিই বোঝে। এটা ঠিক যে সাগর, নদী, পাহাড়-পর্বতের অনন্তশক্তি ও বৈচিত্র্যে বাহ্য প্রকৃতি ঐশ্বর্যময়। কিন্তু তার চেয়েও ঐশ্বর্যমণ্ডিত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি—সূর্য, গ্রহ, তারার চেয়ে

শ্রেষ্ঠ, সমগ্র বাহ্যপ্রকৃতির চেয়ে গভীর। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন উত্তরণকারী এই অন্তঃপ্রকৃতি গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র গঠন করেছে।

পাশ্চাত্যবাসী যেমন প্রথম ক্ষেত্রে (বাহ্যপ্রকৃতি) শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তেমনি প্রাচ্যবাসী অন্তঃপ্রকৃতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। অতএব সঙ্গত কারণেই, যখন আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়, তখন নিশ্চিতভাবে প্রাচ্য থেকেই তা হওয়া উচিত। এটা হওয়াই সঙ্গত। আবার যখন প্রাচ্যবাসীর কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন, তখন তাকে পাশ্চাত্যবাসীর পদতলে বসে শিখতে হবে, এটাই সঙ্গত। পাশ্চাত্যবাসীর যখন ঈশ্বর, আত্মা ও বিশ্বজগতের রহস্য সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়, তখন তাকেও প্রাচ্যের পদতলে নত হয়ে তা জানতে হবে।

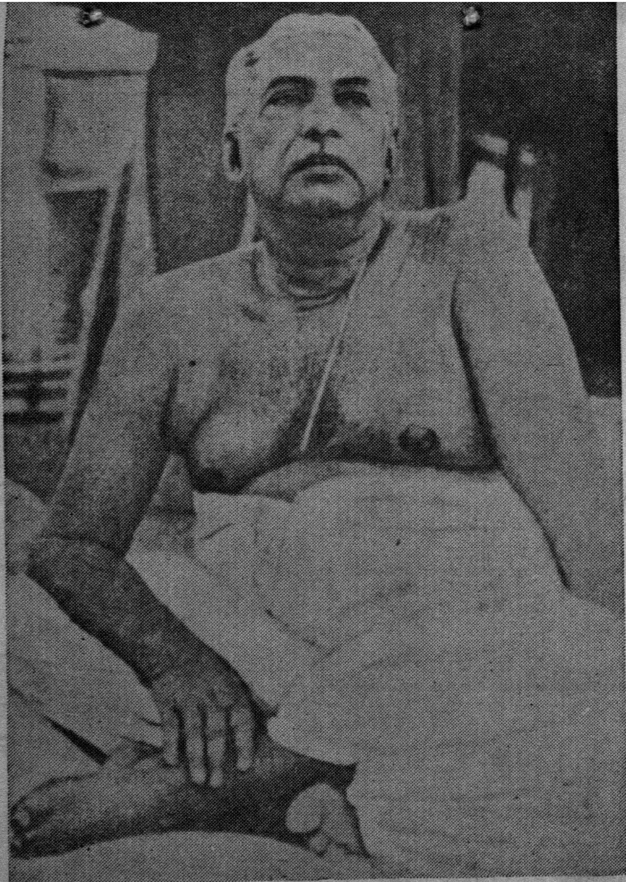
আমি এমন একজন মহাপুরুষের জীবনী বলছি, যিনি ভারতে এই ধরনের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনী বলার আগে আপনাদের কাছে ভারতের আন্তর রহস্য, ভারতবর্ষ বলতে কি বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করব। বস্তুজগতের চাকচিক্যে যাদের চোখ অন্ধ হয়েছে, যারা জীবনটাকে পান-ভোজনেই উৎসর্গ করেছে, অধিকার বলতে যারা বোঝে একমুঠো সোনা, ইন্দ্রিয়সুখই যাদের কাছে আনন্দের উৎস, অর্থকেই যারা আরাধ্য দেবতা মনে করে, কয়েক মুহূর্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভরা জীবন ও তারপর মৃত্যু যাদের অন্তিম লক্ষ্য, যাদের মন সামনে এগিয়ে যেতে অক্ষম, যারা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করে তার চেয়ে গভীরতর কোন কিছুর চিন্তা করতে ভয় পায়, যদি এই ধরনের ব্যক্তিরা ভারতে আসেন, তবে তাঁরা কি দেখেন?—দেখতে পান দারিদ্র্য, মালিন্য, কুসংস্কার, অন্ধকার ভারতের সর্বত্র বিরাজমান। এর কারণ কি? কারণ, তাঁরা সভ্যতা বলতে বোঝেন পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার। পাশ্চাত্য জাতি বস্তুগত উন্নতির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু আপনাদের মনে রাখা উচিত ভারতবর্ষ অন্য পথে এগোচ্ছে। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে ভারতবর্ষেই এমন মানবজাতির বাস যারা কখনো অন্যদেশ জয় করতে বস্তুগত আধিপত্য বিস্তারের জন্য নিজের দেশের সীমানা লঙ্ঘন করে নি—অন্যের জিনিসে লোভ প্রকাশ করে নি, যাদের একমাত্র অপরাধ হল তাদের মস্তিষ্ক ও দেশের জমি অতিশয় উর্বর—যারা নিজেদের কঠিন পরিশ্রমে সম্পদশালী হয়ে যেন অন্যান্য জাতিকে নিজেদের সর্বস্বান্ত করতে প্রলুব্ধ করেছে। ভারতবর্ষ সর্বস্বান্ত হয়েছে, অন্যান্য জাতি তাদের বর্বর বলেছে—তাতেও কোন দুঃখ নেই। প্রত্যুত্তরে সে

জগতকে দিতে চায় সেই পরমপুরুষের দর্শন, সর্বোৎকৃষ্ট বাণী, উদ্‌ঘাটন করতে চায় মানবপ্রকৃতির গোপন রহস্য, ছিন্ন করতে চায় মানবপ্রকৃতির সেই আবরণ যা তার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে বিভেদ রচনা করেছে। কারণ তাদেরই কেবল স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, তারা জানে এইসব জড়বস্তু ও বস্তুবাদের পরেও আছে মানব-প্রকৃতির দিব্যভাব, যাকে কোন পাপ কলঙ্কিত করতে পারে না, লোভ যাকে দূষিত করতে পারে না, আগুন যাকে পারে না দগ্ধ করতে, জল পারে না সিক্ত করতে, তাপ পারে না শুষ্ক করতে, মৃত্যুও তাকে বিনষ্ট করতে অক্ষম। পাশ্চাত্যবাসীর কাছে একটি স্বর্ণথলির অস্তিত্ব যেমন সত্য, প্রাচ্যবাসীর কাছেও ঠিক তেমনি মানবপ্রকৃতির দিব্যতা ততখানি সত্য।

দেশপ্রেমের নামে সাহসে বুক বেঁধে কামানের মুখে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ায় তোমাদের যেমন সাহস আছে, তোমরা যেমন দেশের জন্য একসঙ্গে দাঁড়িয়ে জীবন দিতে পারো, তাদেরও ঈশ্বরের নামে তেমনি সাহস আছে। এই প্রাচ্যেই মানুষ যখন জগৎকে মনের কল্পনা বা স্বপ্ন বলে ঘোষণা করে, তখন সে যা বিশ্বাস করে ও চিন্তা করে, তা যে সত্যি সেটা প্রমাণ করার জন্য সে পোষাক পরিচ্ছদ, সম্পত্তি—সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারে। তেমনি প্রাচ্যের মানুষ কোন নদীতীরে বসে জীবন যে শাশ্বত তা উপলব্ধি করে অনায়াসে দেহত্যাগ করতে পারে। যেমন তোমরা সামান্য তৃণখণ্ড সহজেই পরিত্যাগ করতে পারো, এখানেই ভারতীয় বীরত্ব, যে কিনা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা মৃত্যুহীন।

এখানেই নিহিত রয়েছে সেই শক্তি—যে শক্তি বলে শত শত বর্ষের বিদেশী আক্রমণ, অত্যাচার শোষণ সত্ত্বেও তারা অক্ষত রয়েছে; এই জাতি এখনও জীবিত এবং ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে চরম দুর্দশার দিনেও ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের অভ্যুত্থানের অভাব ঘটেনি। পাশ্চাত্যে যেমন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন, এশিয়াতেও তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রে অসাধারণ মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

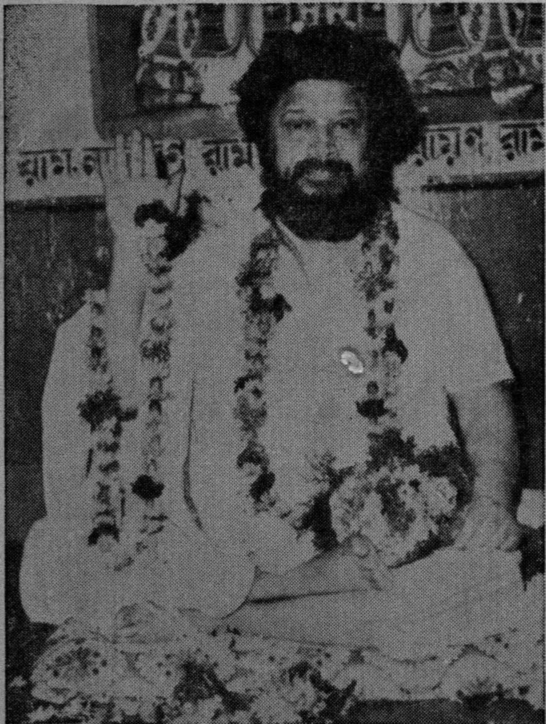
বর্তমান (উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য প্রভাব আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, যখন পাশ্চাত্য বিজেতারা অস্ত্র হাতে ঋষির সন্তানদের কাছে প্রমাণ করতে আসে যে, তারা হল বিশ্বের সবচাইতে নিকৃষ্ট জাতি, শুধুমাত্র স্বপ্নবিলাসী। তাদের ধর্ম শুধু পৌরাণিক গল্প, ঈশ্বর, আত্মা ও অন্যান্য যা কিছুর জন্য তারা সংগ্রাম করছে, তা শুধু অর্থহীন কথার সমষ্টি,



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র



শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ



শ্রীশ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী



বালক ব্রহ্মচারী

আর হাজার হাজার বছর ধরে এই জাতির আচরিত ত্যাগ-বৈরাগ্য সবই বৃথা ; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মহলে প্রশ্ন জাগল—এতদিন ধরে জাতীয় জীবন যে আদর্শে গঠিত হয়েছে, তার কি কোন সার্থকতা নেই ? নতুন তত্ত্বাদর্শে উদ্বুদ্ধ সারাদেশের তরুণ মহলে জিজ্ঞাসা—তাহলে কি আমাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হবে ? তবে কি প্রাচীন পুঁথি-পত্র সব ছিঁড়ে ফেলতে হবে, দর্শনশাস্ত্রগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে, ধর্মাচার্যদের তাড়িয়ে দিতে হবে, মন্দিরগুলি ভেঙে ফেলতে হবে ? তরবারি ও বন্দুকের মাধ্যমে নিজের ধর্মের শক্তি প্রমাণকারী পাশ্চাত্য বিজেতা জাতিগুলি কি বলে নি, তোমাদের পুরনো সব কিছুই কুসংস্কার—সবকিছুই পৌত্তলিকতা ? তাহলে এসো আমরা সব ভেঙে ফেলি। পাশ্চাত্য ধারায় পরিচালিত নতুন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রদের মনে শৈশব হতেই ঐসব ধারণা প্রভাব বিস্তার করল, সুতরাং তাদের মনে যে সন্দেহের আবির্ভাব হল তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবে কুসংস্কার ত্যাগ করে তারা সত্য সন্ধানে ব্রতী হলেন না ; তার পরিবর্তে 'পাশ্চাত্য কি বলে ?' —সেটাই হয়ে দাঁড়াল সত্যের মাপকাঠি। পুরোহিতদের বিতাড়িত করতে হবে, বেদ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কারণ পাশ্চাত্য এই কথা বলেছে ! এই ধরনের অস্থিরতার ভাব থেকেই ভারতে তথাকথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠেছে।

যদি তুমি দেশের প্রকৃত মঙ্গল চাও, তবে তোমার তিনটি জিনিস প্রয়োজন—প্রথম হল অনুভব করার শক্তি। সত্যি কি তোমার ভাইদের জন্য বেদনা জাগে ? তুমি কি কখনও অনুভব কর বিশ্বের অন্তহীন দুর্দশার কথা ? বিশ্বের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিয়ে তুমি কি কখনো ভেবেছ ? তুমি কি কখনও ভাবো যে সব মানুষই তোমার ভাই ? কখনো কি এই অনুভব তোমার অস্তিত্বকে পূর্ণ করে তুলেছে ? এই অনুভব কি তোমার রক্তের স্রোতে মিশে গেছে, তোমার শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ? এই অনুভব কি তোমার স্নায়ুর মধ্যে ঝঙ্কার তোলে ? তুমি কি সহানুভূতির এই মতাদর্শে দীক্ষিত ? যদি তা হয়, তবে সেটা হবে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর তোমায় নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পেয়েছ কি না ? তোমরা যে চীৎকার করে বলছ সবকিছু ভেঙে ফেলতে হবে—তোমরা নিজেরা কি কোন পথ খুঁজে পেয়েছ ? প্রাচীন ভাবধারার মধ্যে কুসংস্কার থাকতে পারে, কিন্তু ঐ কুসংস্কারের সঙ্গে অমূল্য সত্যও মিশে আছে, নানা খাদের সঙ্গে রয়েছে সোনার টুকরোও।

এমন কোন পথ আবিষ্কার করতে পেরেছ কি, যার দ্বারা খাদ বাদ দিয়ে সোনাটুকু পাওয়া যেতে পারে? যদি তা পেরে থাকো, তবে সেটা হবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ; আরও একটা জিনিসের প্রয়োজন—গভীর অধ্যবসায়। তুমি যে মঙ্গল করতে যাচ্ছ, বলো তো, তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তুমি প্রতিপত্তির মোহ, যশাকাঙ্ক্ষা, স্বর্ণলোভ দ্বারা চালিত হও না? তুমি কি সত্যই এবিষয়ে নিঃসংশয় যে তুমি আদর্শ অনুসারে কাজ করে যেতে পারো, সমস্ত জগৎ যদি তোমায় পিষে মেরে ফেলতে চায়—তৎসত্ত্বেও? তুমি যে ভুল পথে চালিত হচ্ছ না এ ব্যাপারে তুমি কি নিশ্চিত? তুমি কি চাও তা কি জানো? তুমি কি জীবন বিপন্ন করেও কর্তব্য সমাধানে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়োজিত করতে পার? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলতে পারো, যতদিন জীবন থাকবে, যতদিন জীবনস্পন্দন সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ না হবে, ততদিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী থাকবে? তাহলে বাস্তবিকই তুমি একজন সংস্কারক, শিক্ষক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং আমরা অবশ্যই তোমার পদপ্রান্তে নতজানু হব।

কিন্তু, তুমি যদি এসব না পারো তাহলে কোন মর্যাদাই তোমাব প্রাপ্য নয়। কিন্তু মানুষ বড়ই দুর্বল, তার দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ। অপেক্ষা করার মত ধৈর্য তার নেই, নেই দেখার শক্তি,—সঙ্গে সঙ্গেই সে ফল চায়। এর কারণ কি? কারণ সে নিজেই ফলভোগ করতে চায়—অন্যের জন্য কষ্টস্বীকারে সে বাস্তবিকই বিমুখ। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করে যেতে সে কখনই চায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্তব্যেই তোমার অধিকার, ফলে নয়।"

ফলের আকাঙ্ক্ষা করি কেন? আমাদের শুধু কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হবে। ফল যা হবার তা হবে। কিন্তু মানুষের ধৈর্য নেই—এই ধরনের অধৈর্যের মধ্যে থাকে ফলভোগের তীব্র বাসনা যা কিনা তার মানসিকতাকে যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণে প্ররোচিত করে। পৃথিবীর ভাবী সংস্কারকদের অধিকাংশকেই এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি—ভারতে সংস্কারের মতাদর্শ এলো। কিছুকালের জন্য মনে হল, যে বস্তুবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জোয়ার ভারতের উপকূলে তীব্রভাবে আঘাত করেছে তা আমাদের পুরষানুক্রমিক ঈশ্বর সাধনার বিরাট একাগ্রতাকে বিনষ্ট করেছে। মুহূর্তের জন্য মনে হল সমগ্র জাতির বুকে ধ্বংস নেমে এসেছে। কিন্তু এরকম সহস্র পরিবর্তনের জোয়ার সে সহ্য করেছে। তুলনায় এই জোয়ার অতি সামান্য। শত শত বছর ধরে এরকম তরঙ্গের পর তরঙ্গ আমাদের

দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—সামনে যা পেয়েছে তাকেই ভেঙেছে অথবা ধ্বংস করেছে। উন্মুক্ত তরবারি আর "আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে ভারতের আকাশ ছিল মুখরিত। যখন এই তরঙ্গ বিলীন হয়ে গেল, দেখা গেল জাতীয় চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় নি, আমাদের প্রকৃতি রয়ে গেছে অজেয়।

ভারতবর্ষ বিনষ্ট হতে পারে না। মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে ভারতবাসী নিজ মহিমায় উজ্জ্বল রয়েছে, এবং যতদিন ভারতীয় চরিত্রে ধর্মভাব থাকবে, যতদিন না ভারতীয় জনগণ তার ঈশ্বরকে ত্যাগ করবে, যতদিন না তার বস্তুবাদে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, যতদিন না সে অধ্যাত্মবাদ পরিত্যাগ করবে, ততদিন জাতীয় চরিত্রের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। চিরকাল তারা ভিখারী ও দরিদ্র থাকতে পারে, সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা তাকে চিরকাল ঘিরে থাকতে পারে, কিন্তু তারা যেন তাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তারা যে ঋষিদের বংশধর, একথা যেন ভুলে না যায়।

পাশ্চাত্য দেশে যেমন প্রত্যেকেই, এমনকি রাস্তার লোকও নিজেকে মধ্যযুগেব ডাকাত-ব্যারনদের বংশধর রূপে প্রতিপন্ন করতে চায়, ভারতবর্ষে তেমনি সিংহাসনে আসীন সম্রাট নিজেকে অরণ্যবাসী ঈশ্বরে আপন্ন অকিঞ্চন ভিখারী ঋষিদের বংশধর রূপে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যারা জীবন ধারণের জন্য গ্রহণ কবে শুধুমাত্র গাছের ফলমূল, পোষাক পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করে গাছের ছাল। আমরা এই ধরনের ঋষিদের বংশধর বলে পরিচিত হতে চাই; যতদিন জন্ম বিষয়ে এই ধরনের গৌরববোধ থাকবে, ততদিন ভারতের ধ্বংস অসম্ভব।

ভারতে যখন সবেমাত্র সংস্কার আন্দোলন শুরু হচ্ছিল, সেই সময় ১৮৩৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবাংলার এক অজপাড়াগাঁয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বংশে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হল—তার পিতামাতা ছিলেন খুব গোঁড়া। এইরকম যথার্থ গোঁড়া। এইরকম যথার্থ গোঁড়া ব্রাহ্মণের জীবন ছিল ত্যাগ ও সাধনায় পূর্ণ। জীবনধারণের উপযোগী অল্প কয়েকটি পথ তার কাছে খোলা ছিল, গোঁড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে যে কোন বিষয়কর্ম ছিল নিষিদ্ধ। আবার যার তার কাছ থেকে গ্রহণেরও সুযোগ ছিল না, কল্পনা করতে পারো তাঁর জীবন ছিল কত কষ্টকর!

ব্রাহ্মণদের কথা, তাঁদের পুরোহিত-বৃত্তির কথা তোমরা শুনেছ। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কয়জনইবা ভেবে দেখেছে—এই অদ্ভুত সুন্দর মানুষগুলি কিভাবে তাদের প্রতিবেশীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করল? তারা তো

দেশের সবচাইতে দরিদ্র শ্রেণী, তাদের ত্যাগের মধ্যেই নিহিত আছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। সম্পদের প্রতি তাদের কোন লিপ্সা নেই। তারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংযমী পুরোহিত, সেই কারণেই তারা এত শক্তিমান্‌।

ভারতে যে জাতি যত উঁচু, তাকে তত বেশী বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। সবচেয়ে নীচু জাতের লোকেরা তাদের খুসীমত খাওয়া-দাওয়া করতে পারে, কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে যে-যত ওপরে, তার বিধিনিষেধ, ততবেশি; আর উচ্চতম জাতি, বংশানুক্রমিক পুরোহিত ব্রাহ্মণদের জীবনে—আগেই বলেছি—আচারনিষ্ঠা অত্যধিক; পাশ্চাত্য দেশের আচার-ব্যবহারের তুলনায় ব্রাহ্মণদের জীবন কঠোর সংযমে পূর্ণ, কিন্তু তাদেব আছে দৃঢতাপূর্ণ স্থৈর্য। যখন তারা কোন আদর্শ গ্রহণ করে, তখন তার চূড়ান্ত না করে ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমিক ভাবে সে-আদর্শ পোষণ করে, তাকে কার্যকরী কবে। একবার তাদের কোন আদর্শ দিলে, তা থেকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। তবে তাদের কোন নতুন আদর্শ দেওয়াও কঠিন।

গোঁড়া হিন্দুরা সেই কারণেই অতিশয় সংকীর্ণ, তাবা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব চিন্তা ও অনুভবের জগতে বাস করে। তাদেব জীবনযাপন কেমন করতে হবে, তা আমাদের শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে; তারা সেই সব নিযমকানুন কঠোর দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে। তারা উপবাস কববে তবু স্বজাতি-বর্হিভূত অন্ত্যজাতের ব্যক্তির হাতে তৈরি খাবার খাবে না। তবুও তাদের ঐকান্তিকতা ও অসাধারণ নিষ্ঠা আছে। গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে প্রায়শঃ এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্মভাব দেখা যায়, কারণ গভীর সত্যনিষ্ঠাই তাদের গোঁড়ামিব উৎস। যে বিশ্বাস তারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে আঁকড়ে থাকে, সে বিশ্বাস যে সঠিক আমরা তা নাও মানতে পারি, কিন্তু তাদের কাছে সেই বিশ্বাসই সত্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষ সর্বদা দানশীল হবে—এমনকি চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত। অনশন করে হলেও অন্যের জীবন বাঁচাতে হবে, শাস্ত্রমতে এটাই ঠিক কাজ, এটাই মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী আশা করা যায় ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে।

যারা ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের এইরূপ চূড়ান্ত দান-শীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে পড়বে: মহাভারতে বর্ণিত আছে, এক অতিথির অন্ন সংস্থান করতে গিয়ে কিভাবে একটা গোটা পরিবার অনশনে প্রাণ দিয়েছিল। এটা কোন অতিরঞ্জিত ব্যাপার নয়, কারণ এ ধরনের ঘটনা এখনো ঘটে। চরম দারিদ্র্য সত্ত্বেও, দেখা যায় যদি গ্রামে

কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসে তবে ব্রাহ্মণপত্নী তাকে কখনো অভুক্ত চলে যেতে দেবে না। এটাই ভারতীয় মাতার কর্তব্য। যেহেতু তিনি মা, সেইজন্য তার কর্তব্য সকলকে খাইয়ে শেষে নিজে খাওয়া ; সকলের খাওয়া হয়েছে কি না দেখে, তারপর তাঁর নিজের পালা। সেই কারণেই মাকে ভারতে সাক্ষাৎদেবী রূপে কল্পনা করা হয়। আমাদের আলোচ্য জননী এইরূপ আদর্শ হিন্দু জননীর প্রতীক। আলোচ্য মহাপুরুষের পিতামাতা ছিলেন খুব দরিদ্র, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে মা সারাদিন উপবাস করে থাকতেন।

এইরূপ পিতা-মাতার ঘরে এই এক শিশু জন্মগ্রহণ করল—যার কথা আমি বলতে যাচ্ছি। শৈশব থেকেই শিশুটির মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। সে তার অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে পারত, এমন কি তার জন্মবৃত্তান্ত বলে দিতে পারত—পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ছিলেন সচেতন। তার পিতামাতার আর একটি পুত্র ছিল, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, সংস্কৃতের অধ্যাপক। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে তাকে পাঠশালায় পাঠান হল বড় ভাইয়ের কাছে। দাদার কাছে লেখাপড়া শিখতে পাঠানো হল।

ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পাঠশালায় যেতেই হবে ; পড়াশুনার কাজ ছাড়া ব্রাহ্মণের অন্য কাজে অধিকার নেই। এখনও দেশের বিভিন্ন স্থানে পুরানো পদ্ধতি প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয়দের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। সেই শিক্ষা-প্রণালীতে ছাত্রদের বেতন দিতে হত না। জ্ঞান অতি পবিত্র জিনিষ, তা বিক্রি করা যায় না—এই ছিল প্রাচীন ধারণা। কোন মূল্য না নিয়ে অকুণ্ঠ-ভাবে জ্ঞান বিতরণ করা হত। শিক্ষাগুরুরা কেবল বিনা বেতনে ছাত্রদের নিজেদের কাছে রাখতেন না, অনেকে তাদের খাওয়াপরাও দিতেন। এইসব শিক্ষাগুরুদের ব্যয়-নির্বাহের জন্য ধনী পরিবারেরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁদের দান করতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলে তারা বিবেচিত হতেন এবং পরিবর্তে গুরুদেবদের ছাত্রদের প্রতিপালন করতে হত।

অল্পসময়ের মধ্যেই বালকটি অনুভব করল শিক্ষার জন্য যে সময় ব্যয় করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কেবল অর্থ উপার্জন, তার প্রকৃত লক্ষ্য সোনা, জ্ঞান অর্জন নয়। এই ব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে তিনি ঠিক করলেন, এই শিক্ষা তাঁর পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। অর্থের জন্য জ্ঞান অর্জন করতে তিনি কখনই চান নি। তাঁর

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে চরম দারিদ্র্য দেখা দিল ; বালকটিকে নিজের জীবিকা সংস্থানের চেষ্টা করতে হল।

কলকাতার কাছে একটি মন্দির ছিল, তিনি সেখানে পুরোহিত নিযুক্ত হলেন—তোমরা হয়ত জানো যে, ভারতবর্ষে যে সব ব্রাহ্মণের আর কিছু সংস্থান হয় না, করতে পারে না, তাঁরাই পুরোহিত হতেন। মন্দিরে পৌবোহিত্য করা নিন্দনীয় বলে গণ্য হত।

যে অর্থে 'গীর্জা' শব্দ ব্যবহার করা হয় ভারতীয় মন্দিরগুলি সে-ধরনেব নয়। মন্দিরগুলি সাধারণ-উপাসনাব স্থান নয়, বস্তুতঃ সমবেত উপাসনা বলে ভারতে কিছু নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিরা প্রশংসনীয় পুণ্য কর্ম হিসাবে মন্দির নির্মাণ করে দিতেন।

ধন সম্পত্তি যাঁর বেশী আছে, তিনি এইরকম মন্দিব তৈরী করেন। মন্দিরে স্থাপন করেন কোন দেববিগ্রহ অথবা দেবতাত্মাব মূর্ত্তি, তাকে উৎসর্গ করেন ঈশ্বরের নামে পূজার জন্য। রোমান ক্যাথলিক গীর্জার যেমন আরাধনা করা হয়—এইসব মন্দিরের পূজার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। পবিত্র শাস্ত্র থেকে মন্ত্র বা শ্লোক ইত্যাদি পাঠ করা হয়, মূর্ত্তির সামনে আলোর আরতি কবা হয়, মহাপুরুষদের মত মূর্তিকেও সবরকম সম্মান দেখানো হয়। এই সমস্ত অনুষ্ঠান মন্দিরে হয়।

মন্দিরে যাওয়া না যাওয়ার ওপর মানুষেব ভালোমন্দ নির্ভব করে না—বরঞ্চ মন্দিরে না-যাওয়া ব্যক্তিরা অধিকতর ধার্মিক হয়, কারণ ভাবতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি নিজের ঘরেই উপাসনার অর্ঘ্য অর্পণ করতে পারে। আমাদের দেশে প্রাচীন-কাল থেকেই মন্দিরে পৌরোহিত্য করাকে অধঃপতিত পেশা বলে গণ্য করা হয়েছে।

এর পেছনেও একটি ধারণা আছে, শিক্ষা জগতে যখন অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান করা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত, তখন ধর্ম সম্বন্ধে যে এটা আরও বেশী পরিমাণে প্রযোজ্য, এটা বলাই বাহুল্য ; মন্দিরের পুরোহিত দক্ষিণা নিয়ে কাজ করেন, অর্থাৎ বলা যায়, তিনি পবিত্র বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবসা করছেন।

সুতরাং দারিদ্রের চাপে সেই বালকটি যখন জীবিকা রূপে একমাত্র মন্দির-পুরোহিতের কাজ নিতে বাধ্য হল, তখন তার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারো।

আমাদের আলোচ্য মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল আনন্দময়ী মাতার মূর্তি।

বালকটিকে প্রত্যেকদিন সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করত, নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন করত। তার মনে একটা ভাবনা সর্বদা ঘুরে ফিরে বেড়াত—এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে? এই মূর্তির মধ্যে কি কিছু নিহিত আছে? এই বিশ্বসংসারে কি আনন্দময়ী মা বলে সত্যি কেউ আছেন? এটা কি সত্যি যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনিই এই বিশ্বকে পরিচালিত করেন? অথবা এ সবই স্বপ্ন?

তিনি জেনেছিলেন; প্রাচীনকালে অনেক বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী এইভাবে আপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন, অবশেষে তাঁদের উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে।

তিনি জেনেছিলেন, ভারতের সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য—এই পরম-শক্তিময়ী মাতার উপলব্ধি। এই ভাবনা ছেলেটিকে পেয়ে বসল। তার সমগ্র জীবন সেই একটি ভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ল। জগত মাতাকে কিভাবে উপলব্ধি করা যায়—এই একটিমাত্র চিন্তা তাঁর মনে প্রবল হতে লাগল। অবশেষে তিনি—'কি করে মায়ের দর্শন পাব'—এটা ছাড়া আর কিছুই বলতে বা শুনতে পারতেন না।

সকল হিন্দু বালকের মনেই এই সংশয় উপস্থিত হয়। এই সংশয়ই আমাদের বিশেষত্বঃ আমরা যা করছি, তা কি সত্যি? কেবলমাত্র তত্ত্বে আমরা তুষ্ট হই না। অথচ ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে যত মতবাদ আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে, তা সবই আমাদের জানা। শাস্ত্র বা মতবাদ আমাদের তৃপ্ত করতে পারে না। ঈশ্বর আছে কি নেই?—যদি থাকেন তবে কি আমি তাঁর দর্শন পেতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করতে পারি? এই প্রশ্ন-গুলি ভারতবর্ষে হাজার হাজার মানুষের মনে। পাশ্চাত্য জাতি এসব ব্যাপারকে কল্পনা মনে করতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে এসবই যথেষ্ট বাস্তব। এই আদর্শের জন্য মানুষ জীবন উৎসর্গ করে—প্রতি বছর হাজার হাজার হিন্দু গৃহত্যাগ করে এবং কঠোর তপস্যা করার ফলে প্রাণ হারায়। পাশ্চাত্য জাতি এটাকে খুবই কাল্পনিক মনে করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গত কারণও আমি বুঝতে পারি। পাশ্চাত্য দেশে বহুদিন বসবাস করা সত্ত্বেও আমি এই প্রাচ্য ভাবধারাকে জীবনে সর্বাপেক্ষা সত্য ও বাস্তব বলে মনে করি।

জীবন কয়েক মুহূর্তের—সে তুমি মজুরই হও, আর সম্রাটই হও। জীবন ক্ষণিকের—তুমি স্বাস্থ্যবান হও, অথবা খারাপ স্বাস্থ্যের অধিকারীই হও। হিন্দুরা মনে করে, জীবনের সমস্যা সমাধানের একটাই পথ, তা হল ঈশ্বর ও

ধর্মের প্রাপ্তি। যদি ঈশ্বর ও ধর্ম সত্যি হয়, তবেই জীবনের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে না, হয়ে ওঠে উপভোগ্য। তা না হলে জীবন হয়ে ওঠে অর্থহীন বোঝা। সেটাই আমাদের ধারণা; কোন যুক্তি দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না; কেবল তার সম্ভাব্যতা প্রমাণ করা যায়। ঈশ্বর ও ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত, কিন্তু ঐ অবধি। প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে, আর অনুভূতির সাহায্যে ধর্মকে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে হবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে হবে, ঈশ্বর আছেন একথাও বুঝতে হবে। অনুভবশক্তি ছাড়া অন্য কোন পথেই আমাদের কাছে ধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে না।

আমাদের আলোচ্য বালকটির মনে এই ধারণা গেঁথে বসল, তার সারা জীবনের কেবল একটিই ভাবনা—কেমন করে ঈশ্বর উপলব্ধি হবে। দিনের পর দিন তিনি কাঁদতেন আর বলতেন—'মা, সত্যিই কি তোমার অস্তিত্ব আছে, না কি এসব কবির কল্পনা? আনন্দময়ী মাতার কথা কি শুধু কল্পনা, না কি এ সত্য?" শিক্ষা কথাটি আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, সে ধরনের কোন শিক্ষাই তাঁর ছিল না, একথা আমরা আগেই বলেছি। এটা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। কারণ তাঁর মন ছিল পবিত্র আর স্বাভাবিকতায় পূর্ণ, অন্যের চিন্তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি।

তাঁর মনে এই চিন্তা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, শেষে এমন হল যে, তিনি ঐ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। নিয়মিত পূজা করা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক কৃত্য নিখুঁত পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। কখনো কখনো ঠাকুরের ভোগ দিতে ভুলে যেতেন, ভুলে যেতেন আরতি করতে, আবার কখনো সব ভুলে গিয়ে অবিরাম আরতি করতেন। তিনি জানতেন, প্রাণ থেকে ঈশ্বরকে চাইলে, তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রবল আগ্রহ তাঁকে পেয়ে বসলো। অবশেষে মন্দিরে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তিনি পুজো ত্যাগ করে মন্দিরের পাশে উপবনে (পঞ্চবটী) গিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। তাঁর জীবনের এই অধ্যায় সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন, "কখন সূর্য ওঠে, কখন অস্ত যায়, কেমন করে আছি, তা আমি জানতে পারতাম না।" নিজের সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাই ভুলে গেলেন, খাওয়ার কথাও তাঁর মনে থাকত না। এই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় খুব যত্নসহকারে তাঁর সেবা করত, তাঁর মুখে যা দিত অনেকটা যান্ত্রিকভাবে তিনি সেই খাদ্য গ্রহণ করতেন। 'মা, মা,'—বলে তিনি চীৎকার করে কেঁদে

উঠতেন—আর বলতেন, 'মা, তুমি কি আছো, যদি থাকোই, তবে আমাকে কেন অজ্ঞানতায় ফেলে রেখেছ? কেন আমি উপলব্ধি করতে পারছি না? মানুষের কথা, দর্শনশাস্ত্র এসব অর্থহীন, আমি চাই সত্য, শুধুমাত্র সত্যই আমার আরাধ্য, আমি তাকে উপলব্ধি করতে চাই, অনুভব করতে চাই, স্পর্শ করতে চাই, সত্য!'

বালকটিব দিনবাত্রি এইভাবে কাটত—দিনশেষে মন্দিরে বেজে উঠত সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টাধ্বনি, শোনা যেত প্রার্থনার কণ্ঠস্বর—তিনি যখন এই সব শুনতেন, মন তাঁর আরো বিষণ্ণ হত, তিনি কাঁদতেন আর বলতেন, "মা, আরো একটা দিন চলে গেল, তবুও তোমাকে উপলব্ধি করতে পারলাম না। এই অল্পস্থায়ী জীবনের আরো একটা দিন চলে গেল, আমি সত্যের সন্ধান পেলাম না।" হৃদয়ের গভীর বেদনায় তিনি কোন কোন সময় মাটিতে মুখ ঘষতেন আর কাঁদতেন। এই ধরনের গভীর আকুলতা হৃদয়ে বাসা বাঁধে। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "বৎস, মনে কব একটা ঘরে এক থলে সোনা আছে, আর একটি ঘরে একজন ডাকাত আছে, তুমি কি মনে কর সেই ডাকাত ঘুমোতে পারবে? সে ঘুমোতে পারে না। কেমন করে ঐ ঘরে ঢুকে সোনার থলেটি দখল করব, এই চিন্তাতেই তার মন পরিপূর্ণ থাকবে। তুমি কি মনে করো, যার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এই সব আপাতঅনুভূত বস্তুর পিছনে সত্য আছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, আছে একটা মৃত্যুহীন অস্তিত্ব—অন্তহীন আনন্দের অস্তিত্ব, যে আনন্দের সঙ্গে তুলনা করলে ইন্দ্রিয়সুখ ছেলে-খেলা বলে মনে হয়, সে কি তাঁকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা না করে স্থির থাকতে পারে? সে কি এক মুহূর্তের জন্যও সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে পারে? না, সে কখনই তা পারে না। সে তো তাকে পাওয়ার জন্য পাগল হবেই।' এই দিব্য উন্মত্ততা বালকটিকে আবিষ্ট করলো। সেই সময় তার কোন গুরুদেব ছিল না, এমন কেউ ছিল না যে কিনা ঈশ্বরের সন্ধান দিতে পারে; বরঞ্চ সকলে ভাবত তিনি পাগল হয়ে গেছেন। সাধারণত এমন ধারণাই করা হয়। কারণ যদি কোন মানুষ সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে লোকে তাকে পাগল বলে; কিন্তু এই ধরনের লোকেরাই সংসারে শ্রেষ্ঠ। এই ধরনের উন্মত্ততা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়া-কাঁপানো শক্তি, আর ভবিষ্যতেও এ উন্মত্ততা থেকেই উৎসারিত শক্তি বিশ্বকে আন্দোলিত করবে। সত্য উপলব্ধির জন্য দীর্ঘকালব্যাপী বিরামহীন প্রচেষ্টা চলল। বালকটির তখন অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হতে লাগল, নিজ

অস্তিত্বের রহস্য তাঁর কাছে ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে লাগল। আবরণের পর আবরণ অপসারিত হতে লাগল। ঈশ্বর তথা মা নিজেই গুরু হয়ে বালকটিকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় অগ্রসব হওয়ার জন্য দীক্ষা দিলেন। এই সময় সেখানে এক অপূর্ব সুন্দরী অসাধারণ বিদুষী মহিলা এলেন। পরবর্তী কালে এই মহাপুরুষ বলতেন—শুধু মাত্র অসাধারণ বিদুষী বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মহিলার বিষয় আলোচনা করলেও তোমরা ভারতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায় বুঝতে পারবে। সাধারণতঃ যে অজ্ঞানতার জগতে হিন্দু মহিলারা বাস করে—পাশ্চাত্য দেশে যাকে বলে স্বাধীনতার অভাব—তার মধ্যেও এই ধরনের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন মহিলার অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—ভারতে নারীরাও বিয়ে না করে, সংসার ত্যাগ করে, ঈশ্বর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে পারে। এই মন্দিবে এসেই তিনি শুনলেন উপবনচারী সেই বালকটির কথা যে কিনা ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে কাঁদে আর লোকে তাকে পাগল বলে। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। প্রথম সাহায্য ছিল ঐ মহিলারই। মহিলা বালকটির অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন আর বললেন, "বৎস, যার মধ্যে এই ধরনের স্বর্গীয় উন্মত্ততা আসে, সে ধন্য। বিশ্বে সবাই পাগল—কেউ অর্থের জন্য, কেউ যশের জন্য, কেউ বা সুখের জন্য, কেউবা অন্য কিছুর জন্য। সেই একমাত্র ধন্য যে ঈশ্বরের জন্য পাগল! তাঁদের সংখ্যা খুবই সামান্য।" এই মহিলা কয়েক বছর তাঁর কাছেই থেকে তাঁকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের সাধন ক্রিয়া শেখালেন, নানা ধরনের যোগাচার শিক্ষা দিলেন, এবং এই দুর্দান্ত আধ্যাত্মিকতার নদীস্রোতকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করলেন।

পরে সেখানে এলেন একজন সন্ন্যাসী, তিনি ছিলেন অতিশয় পণ্ডিত ও একজন দার্শনিক। তিনি ছিলেন আশ্চর্য মানুষ এবং ভাববাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব নেই, এবং তা প্রমাণ করার জন্য তিনি কখনো ঘরে বাস করতেন না; রৌদ্র, ঝড়-জল, উপেক্ষা করে বাইরে থাকতেন। তিনি এই বালকটিকে বেদান্ত-দর্শন শেখাতে শুরু করলেন, অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, গুরুর চেয়ে শিষ্য অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কয়েক মাস সেখানে থেকে তাঁকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিলেন এবং তারপর চলে গেলেন। সাধিকা মহিলাও চলে গেছেন। ফুল যেই ফুটতে শুরু করলো, তখনি তিনি চলে গেলেন। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, তা

কেউই জানে না। তিনি আর ফিরে আসেন নি। মন্দিরে পূজারী থাকা-কালীন আমাদের মহাপুরুষের অসাধারণ আচরণ দেখে লোকে মনে করল তাঁর বুঝি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে ; তখন তাঁর আত্মীয়তা তাঁকে দেশে নিয়ে গেলেন এবং একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন—ভাবলেন এর ফলে তাঁর চিন্তা-ধারার পরিবর্তন হবে, মনের স্বাভাবিকতা ফিরে আসবে।

কিন্তু তিনি মন্দিরে ফিরে এলেন এবং আরো গভীরভাবে ঈশ্বরভাবুকতায় মত্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য তাঁর যে রকম বিয়ে হল তাকে বিয়ে না বলে বলা যেতে পারে বাগ্‌দান। কারণ সত্যিকারের বিয়ে হয় যখন স্ত্রী বয়েসে একটু বড় হয়, আর রীতি অনুযায়ী স্বামী শ্বশুরের ঘর থেকে স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। এই ক্ষেত্রে স্বামী কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী আছে। সুদূর পল্লীতে থেকে বালিকাটি শুনেছিল যে, তাঁর স্বামী ধর্মের সাধনায় বিভোর, অনেকে তাঁকে পাগল মনে করে। একথার সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি স্থির করলেন, স্বামীর কাছে যাবেন এবং অবশেষে পায়ে হেঁটে সেখানে উপস্থিত হলেন। যখন তিনি স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁব কথা, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের জীবনে তাঁব অধিকার মেনে নিলেন। যদিও ভারতবর্ষে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে ধর্মজীবন অবলম্বন করে, তার আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। তা সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন এবং এই তরুণ সাধক তাঁর পদতলে নত হয়ে বললেন, "আমি জেনেছি সকল নারীই আমার মা, তবুও এখন তুমি যা বলবে আমি তা করতে প্রস্তুত।" এই পবিত্র হৃদয়া মহীয়সী নারী স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারলেন এবং সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "জোর করে আমি তোমাকে সংসারী করতে চাইনা, আমি শুধুমাত্র তোমার সেবা করতে চাই, তোমার কাছে থাকতে চাই, তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই।" তিনি তাঁর স্বামীর একজন প্রধান অনুগতা শিষ্যা হলেন—সর্বদা তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভক্তি করতে লাগলেন। এইরূপে স্ত্রীর সম্মতি পেয়ে তাঁর শেষ বাধাও অপসারিত হল, এবং তিনি অবাধে নিজের মনোনীত পথে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। আমাদের মহাপুরুষটি এইভাবে বন্ধনমুক্ত হলেন এবং ঈশ্বর সাধনায় তাঁর অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট অগ্রগতি হল ; তাঁর মনে যে আকাঙ্ক্ষা প্রথমে জাগল তা হল—কিভাবে নিজে সংস্কারমুক্ত হবেন, কিভাবে দূর করবেন সামাজিক জাত্যভিমান, কি ভাবে নীচতম জাতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবেন। আমাদের দেশে প্রচলিত জাতিভেদ

প্রথায় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পদমর্যাদার পার্থক্য স্থির ও চিরনির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

জন্মলগ্নেই প্রত্যেক মানুষ জীবনে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে, আর যত দিন না কোন গুরুতর অপরাধ করে, ততদিন সেই মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় না। সামাজিক মানদণ্ডে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চণ্ডাল সর্বনিম্ন। যাতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবার অভিমান না থাকে, সেই কারণে এই ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলেন তার কাজ নিজে করে দিয়ে। মেথরের কাজ রাস্তা পরিষ্কার করা, ঝাড়ুদারের ময়লা সাফ করা—সে অচ্ছ্যুৎ। গভীর রাতে উঠে মেথরদের ঝাড়ু ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে মন্দিরের নর্দমা পায়খানা প্রভৃতি নিজের হাতে পরিষ্কার করতেন, নিজের চুল দিযে সেইসব স্থান মুছে দিতেন। শুধুমাত্র এই ধরনের হীনতা স্বীকার করতেন, তা নয়; মন্দিরে প্রত্যহ ভিখারীদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হত—তাদেব মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুসলমান, জাতিচ্যুত ও স্খলিত-চরিত্র। কাঙালী ভোজনের পর তাদের পাতা পরিষ্কার করতেন, তাদের এঁটোকাঁটা নিজের হাতে জড়ো করতেন, তার থেকে কিছু কিছু নিজে গ্রহণ করতেন, তারপর ঐ সব লোকের খাবার জায়গা পরিষ্কার করতেন। আপনারা যাঁরা পাশ্চাত্যবাসী তাঁদের কাছে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি তাৎপর্যহীন, কিন্তু আমাদের ভারতবাসীর কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে কারণ আমাদের কাছে এই ধরনের কাজ আশ্চর্য নিঃস্বার্থ বলে মনে হয়। উচ্ছিষ্টের উদ্বৃত্ত অংশ পরিষ্কার করার কাজ সাধারণত নীচু জাতের লোকেরাই করে। যদি তারা কোন শহরে ঢোকে, তখন নিজের জাতের পরিচয় দিয়ে লোককে সাবধান করে দেয়, যাতে অন্যেরা তাদের স্পর্শ করে কলুষিত না হয়। প্রাচীন পুঁথিতে লেখা আছে, যদি কোন ব্রাহ্মণ হঠাৎ এই ধরনের কোন নীচু জাতের লোকের মুখ দেখে ফেলে, তবে তাকে সারাদিন উপবাসে কাটাতে হবে এবং হাজারবার গায়ত্রী মন্ত্র জপতে হবে।

এইসব শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যে জায়গায় নীচু জাতের লোকেরা খায় সেই জায়গা পরিষ্কার করতেন, তাদের ভুক্তাবশেষ ঠাকুরের প্রসাদ মনে করে গ্রহণ করতেন। শুধু কি তাই, নিজেকে তাদের একজন করে তোলার জন্য রাতে উঠে গোপনে ময়লা পরিষ্কার করতেন। আমি যে সত্যিই মানবতার সেবক হয়েছি তা প্রমাণ করতে হলে আমাকে তোমার বাড়ির ঝাড়ুদার হতে দাও। তারপর হিন্দুধর্ম ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে কি সত্য আছে তা জানবার জন্য তাঁর মনে প্রবল বাসনা জন্মাল। এ পর্যন্ত তিনি

নিজের ধর্ম ছাড়া আর কিছু জানতেন না। অন্যান্য ধর্মের স্বরূপ কি তা জানবার জন্য তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল। যা তিনি করতেন তা মনপ্রাণ দিয়েই করতেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য ধর্মের গুরুত্ব সন্ধান করতে লাগলেন। ভারতে গুরু বলতে আমরা কি বুঝি তা সবসময় মনে রাখতে হবে—গুরু বলতে গ্রন্থকীট বোঝায় না, তিনিই গুরু যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন, কোন পরোক্ষ মাধ্যমে নয়। তিনি একজন মুসলমান সাধুর সন্ধান পেলেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর প্রদর্শিত পথে সাধন ক্রিয়া শুরু করলেন, মুসলমানদের পোষাক পরতে শুরু করলেন। তাঁদের শাস্ত্রানুযায়ী সবরকম অনুষ্ঠান পালন করতে লাগলেন। তারপর অন্য ধর্মের মাধ্যমে সাধন করেও একই সত্যের সন্ধান পেলেন। এই ভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সকল ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, শুধু প্রভেদ সাধনপ্রণালীতে। তারপর মনে এই ধারণা দৃঢ় হল যে মুক্তিলাভ করতে হলে যৌন ধারণা দূর করতে হবে—কারণ আত্মার কোন যৌনভেদ নেই; আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। দেহে আছে যৌনপ্রভেদ, আর যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করতে চান তার পক্ষে এই ধরনের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকলে চলবে না। পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেও নিজের সব কাজে তিনি মেয়েলী ভাব আনাব চেষ্টা করতে লাগলেন, নিজেকে তিনি নারী হিসেবে ভাবতে লাগলেন—মেয়েদের মত পোষাক পরলেন, তাদের মত করে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, পুরুষের সব রকম কাজ ছেড়ে দিলেন, নিজের পরিবারের নারী মহলে বাস করতে লাগলেন, এই ভাবে অনেক বছর ধরে সাধন করতে করতে তাঁর মন পরিবর্তিত হয়ে গেল, তাঁর মন থেকে যৌন-চেতনা সম্পূর্ণরূপে মুছে গেল; সঙ্গে সঙ্গে কামভাবের সম্ভাবনাও উধাও হয়ে গেল—তাঁর জীবনের সমগ্র পরিধিই পরিবর্তিত হল।

পাশ্চাত্য দেশে নারীপূজার কথা আমরা শুনেছি কিন্তু সাধারণত তার উদ্দেশ্য যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজা। এই মহাপুরুষ মনে করতেন নারী পূজার অর্থই হল মা আনন্দময়ীর পূজা—সকল নারীর মুখেই তিনি দেখতেন মা আনন্দময়ীর প্রতিচ্ছবি। আমি নিজে দেখেছি তিনি সমাজের চোখে অস্পৃশ্য নারীদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কাঁদতে কাঁদতে তাদের পদতলে নত হয়ে, অর্ধ-অচেতন অবস্থায় বলতেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় চলে ফিরে বেড়াও, আর একরূপে তুমিই এই বিশ্ব নিখিল, আমি তোমায় প্রণাম করি, মা, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।' সেই ব্যক্তির জীবন কত পবিত্র, ভেবে দেখ, মন থেকে সবরকম ইন্দ্রিয় বাসনা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। তিনি প্রত্যেক নারীকে

দেখতেন পবিত্র চোখে, তাঁর কাছে সকল নারীর মুখ রূপান্তরিত হত, তাতে প্রতিফলিত হত সেই আনন্দময়ী বিশ্বমাতার মুখ, যিনি হলেন সমগ্র মানব-জাতির রক্ষয়িত্রী। তাই আমরা চাই। তোমরা কি বলতে চাও, নারীর মধ্যে যে স্বর্গীয় পবিত্রতা আছে তাকে ঠকাতে পারা যায়? এটা কখন পারা যায় নি এবং ভবিষ্যতেও যাবে না। অজ্ঞাতসারে এটা আত্মপ্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। নিশ্চিতভাবেই এটা সবরকমের প্রবঞ্চনা ও কপটতা ধরে ফেলতে পারে, অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলো ও বিশুদ্ধির পবিত্রতা সহজেই উপলব্ধি করে থাকে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এইরকম পবিত্রতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই মানুষটির জীবনে এল এই ধরনের কঠিন নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা। আমাদের জীবন যে ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন হয়, তিনি তা অতিক্রম করলেন। জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় ব্যয় করে আধ্যাত্মিকতার যে রত্নভাণ্ডার তিনি অর্জন করেছিলেন—মানবজাতির কল্যাণে তা উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবার শুরু করে দিলেন তাঁর কাজ। তাঁর কর্ম-ধারা ছিল আশ্চর্য। আমাদের দেশের আচার্যরা সমাজে সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁদের সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞান করা হয়। আমরা পিতামাতাকে যেমন সম্মান করি, তার চেয়ে বেশি করি আচার্যকে। এই দেহটা দিয়েছেন পিতা-মাতা, কিন্তু মুক্তির পথ দেখিয়েছেন গুরুদেব। আমরা তাঁর সন্তান, আধ্যাত্মিক সূত্রে তাঁর মানসসন্তান। অসাধারণ গুরুদেবের সন্ধান পেলে সকল হিন্দুই তাঁকে সম্মান জানাতে আসে, তাঁর কাছে ভিড় করে। কিন্তু এই গুরুদেব ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি লোকে তাঁকে সম্মান করল কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর কোন কৌতূহলই ছিল না—তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ গুরুদেব, তা তিনি নিজেই জানতেন না। তিনি ভাবতেন—মা-ই সব করছেন, তিনি কিছুই নন।

তিনি সবসময় বলতেন, 'যদি আমার মুখ দিয়ে কোন ভালো কথা বেরোয়, সেটা আমার মায়ের কথা, আমার নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ধারণা পোষণ করেছেন। সংস্কারক ও সমালোচকদের কর্মধারা আমরা দেখেছি। আমরা জানি কিভাবে তাঁরা অন্যের দোষ দেখেন, সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলে গড়তে চান নিজের কল্পিত ইমারত। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পরিকল্পনা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ তা কার্যে পরিণত করতে প্রস্তুত নই, কারণ সকলেই তো উপদেশ দিতে প্রস্তুত।

তাঁর ভাব ছিল অন্য ধরনের। তিনি কাউকেই ডাকতে যেতেন না। তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান নীতি ছিল—বাইরে কিছু খুঁজতে যেয়োনা।

নিজের হৃদয়কুসুমকে ফুটিয়ে তোল। বাকী সব আপনা আপনি হবে। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা অর্জন কর, অপরের মধ্যে তা সঞ্চারিত হতে বেশি দেরি হবে না। এটা জীবনে একটা মহৎ শিক্ষা—আমার গুরুদেব শত শত বার আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন, তবুও প্রায়শঃ আমি সেটি ভুলে যাই। তাঁর চিন্তা-শক্তির তাৎপর্য খুব অল্প লোকেই বুঝতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসে তার দ্বার রুদ্ধ করে একটিমাত্র মহৎ চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং পরে দেহত্যাগ করে, তবে সেই চিন্তা গুহাপ্রাচীরের দেওয়াল ভেদ করে আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হবে, অবশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে প্রবেশ করবে। এই রকম আশ্চর্য হল চিন্তার শক্তি। অতএব নিজের চিন্তা অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। প্রথমেই দেখ, তোমার দেওয়ার মত কিছু আছে কিনা। কেবলমাত্র সেই দিতে পারে যার দেওয়ার মত কিছু আছে। শুধুমাত্র তিনিই শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁর প্রশিক্ষণের মতো কিছু আছে। কারণ শিক্ষাদান বলতে শুধু কথা বলা বোঝায় মা, শুধুমাত্র মতবাদ বোঝানো নয়, শিক্ষাদান বলতে বোঝায় ভাবের সংক্রমণ। যেমন আমি তোমাকে একটা ফুল দিতে পারি, তার চেয়ে আরও গভীর অর্থে আধ্যাত্মিকতা সংক্রমিত করা যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর, এটাই হল তোমার সর্বোচ্চ কর্তব্য। প্রথমে নিজের জন্যই জানো সত্য কি; পরে অনেককেই তুমি তা শেখাতে পারবে; তারা তোমার কাছে আসবে। এই ছিল আমার গুরুদেবের দৃষ্টি-ভঙ্গি—তিনি কারও সমালোচনা করতেন না। বছরের পর বছর এই মানুষটির সঙ্গে দিনরাত থেকেছি, কিন্তু কখনো তাঁর মুখ থেকে কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে নিন্দাসূচক মন্তব্য শুনি নি। সব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল সমান।

সব সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ঐক্যের বাণী। মানুষ হতে পারে বুদ্ধিজীবী, নতুবা ভক্তিপ্রবণ অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা কর্মচঞ্চল; বিভিন্ন ধর্মে এই প্রবণতাগুলির কোন-না-কোনটির প্রাধান্য দেখা যায়। তথাপি মাত্র একজন মানুষের মধ্যে এই চারটি ভাবধারার মিলন ঘটানো সম্ভব, এবং মানুষ ভবিষ্যতে এটা করবেই। এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি কাউকে দোষ দেননি সবার মধ্যেই ভাল দেখেছেন। এর সীমা কতদূর যেতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত—একদিন তাঁর উপস্থিতিতে এক হীনাচারী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করা হচ্ছিল, তিনি শুধু বললেন, "ভালো কথা, দেখ, প্রত্যেক বাড়িরই খিড়কির দরজা আছে।" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংস্কারমুক্ত, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের সার কথা, তার অন্তর্নিহিত আদর্শের অর্থ তিনি সহজেই ধরতে

পারতেন। তিনি নিজের মধ্যে এইসব বিভিন্ন ভাবধারা মিলিত করে, ঐক্যের সুর বাজাতেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথার মধ্যে থাকত এক ধবণেব শক্তি, দূর করে দিত হৃদয়ের অন্ধকার। কথা নয়, ভাষা নয়, তাঁর কথার মধ্যে বিচরণ করত বক্তার ব্যক্তিত্ব, তাই তাঁর কথার এত শক্তি। আমরা সবাই সময়ে সময়ে এটা অনুভব করতাম। আমবা অনেক বড বড সুন্দর বক্তৃতা শুনে থাকি, অনেক যুক্তিপূর্ণ প্রসঙ্গ শুনে থাকি, তারপর বাড়ি ফিরে সব ভুলে যাই। আবার অন্য সময়ে খুব সরল ভাষায় দু-চারটি কথা শুনি যা আমাদের সারা জীবনের সাথী হয়ে যায়, আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। যে ব্যক্তি নিজের কথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পাবেন, তাঁর কথায় ফল হয়, কিন্তু সেজন্য তাঁকে খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। দেওয়া-নেওয়াই হল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—গুরুদেব দেবেন, আর শিষ্যরা গ্রহণ করবে। কিন্তু একজনের চাই দেওয়ার ক্ষমতা, আর অন্যজনের চাই গ্রহণের শক্তি।

কতকাতা তখন ছিল ভারতের রাজধানী, আমাদের দেশের শিক্ষাব প্রধান কেন্দ্র, সেখানে প্রত্যেক বছর হাজাব হাজার নাস্তিক ও বস্তুবাদীর সৃষ্টি হচ্ছিল, তিনি সেই কলকাতার কাছে বাস করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালযেব সেরা ব্যক্তিরা, তাদের কেউ নাস্তিক, কেউ বা অজ্ঞেযবাদী—তাঁর কাছে এসে তাঁর কথা শুনত। আমি নিজেই ছোটবেলা থেকে সত্যকে সন্ধান করেছি। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সভায় গিয়েছি। যখন শুনেছি কোন লোক খুব সুন্দব ধর্মোপদেশ বক্তৃতা দিচ্ছেন—তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে তাকে প্রশ্ন করেছি, "আপনি এই যে সব কথা বললেন এগুলি কি আপনার উপলব্ধি না বিশ্বাস? ধর্ম সম্বন্ধে আপনি কি নিশ্চিত কিছু জেনেছেন?" উত্তরে তিনি বলতেন, "এইগুলি আমার মতবাদ ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই ধরনের প্রশ্ন করতাম, "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?" তাঁদের উত্তর শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, তাঁরা লোক ঠকাচ্ছেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের একটা কথা আমার মনে পড়ছে—যে অলংকৃত বাক্-নির্মিতির সাহায্যে পণ্ডিতেবা দীর্ঘ পদবিন্যাসে নানাভাবে শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন, তাতে কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি হয়; বুদ্ধিগত আনন্দ দেয, কিন্তু কখনোই মানুষকে অজ্ঞতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে না।

এইভাবে আমি ক্রমশই নাস্তিক হয়ে পড়ছিলাম, এমন সময়ে আমার আধ্যাত্মিক দিগন্তে হঠাৎ উদিত হলেন এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আমি এঁর কথা



স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রীমা সারদার সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

শুনেছিলাম, তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখে খুব সাধারণ লোক বলে মনে হল ; অসাধারণত্বের ভান কিছুই দেখলাম না। তিনি খুব সহজ সরল ভাষায় কথা বলছিলেন—অনেকটা গ্রাম্য ভাষায়। আমি ভাবছিলাম, "ইনি কি একজন ধর্মাচার্য হতে পারেন ?" তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, যে প্রশ্ন সারা জীবন ধরে করে এসেছি, "আচ্ছা মহাশয় আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন,—'হ্যাঁ'।

—আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে ভগবান আছেন ?

—হ্যাঁ, পারি।

—কেমন করে ?

—আমি তাকে দেখতে পাই, যেমন তোকে দেখছি, বরং আরও স্পষ্ট ভাবে, আরও গভীরভাবে দেখি। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই প্রথম আমি এমন একজনকে দেখলাম যিনি সাহস করে বলতে পারেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন।

ধর্ম সত্য, একে অনুভব করা যায়,—আমরা বিশ্বজগত যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এটা কোন হাসিঠাট্টার ব্যাপার নয়, মানুষের তৈরী কোন গল্প নয়। তারপর, দিনের পর দিন আমি ঐ মানুষটির কাছে যেতে লাগলাম। অনেক কিছুই ঘটেছিল, এখন সব কথা বলা যাবে না, তবে এইটুকু বলতে পারি—ধর্ম যে সত্যি সত্যি সংক্রমিত করা যেতে পারে, তা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করলাম। একবারের স্পর্শ, একবারের দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পাল্টে যেতে পারে। এই রকম ব্যাপার আমি বার বার ঘটতে দেখেছি।

বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের বিষয় আমরা পড়েছি এবং জেনেছি কেমন করে তাঁরা দাঁড়িয়ে বলতেন—'পূর্ণতা অর্জন কর', যার ফলে খুনীরাও মুক্তিলাভ করত। এখন দেখলাম এ সবই সত্য এবং যখন আমি নিজেই ব্যাপারটি দেখলাম, আমার সকল সন্দেহবাদ উধাও হয়ে গেলো। আমার গুরুদেব বলতেন, 'বিশ্বজগতের অন্যান্য জিনিসের তুলনায় অনেক বেশী প্রত্যক্ষ ও গভীরতর ভাবে, ধর্ম দেওয়া-নেওয়া করা যেতে পারে।' অতএব প্রথমে ধার্মিক হও, দেবার মত কিছু অর্জন কর, তারপর বিশ্বের সামনে দাঁড়িয়ে তা বিতরণ কর। ধর্ম বাগাড়ম্বর নয়, মতবাদ বা তত্ত্বও নয়, অথবা সঙ্কীর্ণতাবাদও নয়। শুধুমাত্র সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে ধর্ম অবস্থান করতে পারে না। ঈশ্বর ও আত্মার সম্পর্ক নিয়ে ধর্ম। কেমন করে তা সমাজে

রূপান্তরিত হতে পারে? ধর্ম কি কখনো কোন সমাজ বা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে? তা করলে ধর্ম ব্যবসায়ে পরিণত হত, আর যেখানে ধর্মে এই ধরনের ব্যবসায়িক ব্যাপার, সেখানে ধর্ম লুপ্ত। এশিয়াই হল সকল ধর্মের মাতৃভূমি, এখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে সকল ধর্মের বাণী। এমন একটা ধর্মের নাম করতে পার যা কোন সংস্থার মাধ্যমে প্রচারিত! না, ইউরোপই এই পদ্ধতিতে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেছিল, আর সেই কারণেই ইউরোপ এশিয়ার মতো সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিক ভাবে কখনই প্রভাবিত করতে পারেনি। ভোটের সংখ্যাধিক্য হলেই কি মানুষ বেশী ধার্মিক হবে, আর সংখ্যাল্পতা হলে মানুষ কম ধার্মিক হবে? একজনের আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কই হল ধর্ম। কথায় নয়, পুঁথিপাঠে নয়, ধর্মসংস্থায় যোগদানের মাধ্যমে নয়, এমন কি কোন সুশৃঙ্খল ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নয়, ধর্ম আছে উপলব্ধির জগতে। এইসব হল ধর্মের নামে জঙ্গীপনা, বাণিজ্যবৃত্তি, যথার্থ ধর্ম নয়। এর উৎস হল ইউরোপ, এশিয়া নয়। কারণ এশিয়া হল ধর্মের পীঠস্থান। ধর্মকে সমৃদ্ধিশালী করতে হলে, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করতে হবে, বই ও কথার জগতে ধর্মকে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। এই হল আমার প্রথম শিক্ষা—এই মহাপুরুষের কাছে।

গুরুদেবের কাছে দ্বিতীয় শিক্ষা পেয়েছিলাম, কারো মনে আঘাত দিও না, কারো বিশ্বাসকে অপমান করো না। যদি পার ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা কর; যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে হাত বাড়িয়ে ওপরে তুলে নাও। কিন্তু কখনো তাঁর বিশ্বাসকে নষ্ট করার চেষ্টা করো না। তিনিই হলেন প্রকৃত শিক্ষক, যিনি হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যেই একাত্ম হতে পারেন, শিষ্যের হৃদয়ের সঙ্গে আনতে পারেন সমতা, শিষ্যের প্রাণের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, তাঁর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন, তাঁর কান দিয়েই শুনতে পারেন এবং তার মন দিয়েই বিশ্বজগতকে বুঝতে পারেন। এই ধরনের গুরুদেবই শিক্ষা দান করতে পারে, অন্য কেউ নয়। অবিশ্বাসবাদীরা কেবল ভাঙতে, ধ্বংস করতে পারে, তাঁদের সংখ্যাও বিশ্বে অল্প নয়—কিন্তু মানবজাতির জন্য তারা বিশেষ কিছু করতে পারে না। বিশ্বের ধর্মগুলির মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই; তারা একই শাশ্বত ধর্মের বিভিন্ন পর্যায়। অনন্তকাল ধরে সব কিছুর মধ্যেই এক অসীম ধর্মের অস্তিত্ব উপস্থিত এবং তা চিরকাল অমলিন থাকবে। সকল সনাতন ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পথে অভিব্যক্ত হচ্ছে। সুতরাং সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে, তার থেকে যতটা সম্ভব গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র জাতি ও ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারেই

ধর্মের প্রকাশ ভিন্ন হয় না ; ব্যক্তির গ্রহণীশক্তি অনুযায়ীও তা ভিন্ন হতে পারে। কোন ব্যক্তির মধ্যে ধর্ম গভীর কর্মরূপে অভিব্যক্ত, কারো মধ্যে গভীর ভক্তি-রূপে, কারো মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদে, কারো মধ্যে দার্শনিক জ্ঞানরূপে অভিব্যক্ত। 'তোমার পথ ভুল'—এ কথা বলা ঠিক নয়। 'একরূপে নয়, বিভিন্নরূপে সত্য অভিব্যক্ত'—এই মূল রহস্যটি আমাদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাচাই করলে আমরা একই সত্যকে ভিন্নরূপে দেখতে পাই। তাহলে কারও প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ না করে সকলের প্রতি চিরকাল সহানুভূতিসম্পন্ন হব। যতদিন এই বিশ্বে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মগ্রহণ করছে ততদিন একই ধর্মীয় সত্য ভিন্ন ভিন্ন পথে গ্রহণীয় হবে, এটা বুঝতে পারলে আমরা ভিন্নতা সত্বেও একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে সক্ষম হব। যেমন প্রকৃতি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসম্পন্ন, পরিদৃশ্যমান জগত হল অসীম বৈচিত্র্যর মিলন স্থল, এই সব বৈচিত্র্যের পরেও আছে অনন্ত অসীম পরম সত্য। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

ক্ষুদ্র জগৎ হল বৃহৎ বিশ্ব জগতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, এইসব বৈচিত্র্য সত্বেও তাদের মধ্যে বিরাজমান অনন্ত ঐক্যের সুর, এটি আমাদের স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ধ্যান-ধারণার চেয়ে এই ধারণাটি আজকের পৃথিবীতে অত্যধিক জরুরী বলে আমি মনে করি। আমি এমন এক দেশের অধিবাসী যেথানে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থান পরিদৃশ্যমান, যেথানে দুর্ভাগ্যবশতই হোক আর সৌভাগ্যবশতই হোক, যে কোন লোকের ধর্ম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে, সেই একজন অগ্রণী প্রতিনিধি পাঠাতে আগ্রহী ; আমি শৈশবতা থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত। এমন কি, মর্মনরা পর্যন্ত ভারতে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিল। তাদের সবাইকে জানাই অভিনন্দন। কারণ ভারতই ধর্মপ্রচারের ভূমি। অন্য দেশের তুলনায় এখানেই দ্রুত এবং গভীরভাবে ধর্ম শিকড় গাড়তে পারে। তোমরা যদি হিন্দুদের রাজনীতি শেখাতে চাও, তারা বুঝবে না, যদি তুমি এসে ধর্মপ্রচার কর—তোমার ধর্মমত যাই হোক না কেন —অল্পকালের মধ্যে হাজার হাজার লোক তোমায় অনুসরণ করবে ; আর জীবৎকালেই সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে পূজিত হওয়ারও যথেষ্ট সম্ভাবনা। এর জন্য আমি আনন্দ অনুভব করি, কারণ ভারতে এটাই একমাত্র জিনিস যা আমরা চাই। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তাদের সংখ্যাও প্রচুর, তাদের মধ্যে কতগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে ভীষণ পরস্পর বিরোধী বলে মনে

হয়। তথাপি সকলেই তোমাকে বলবে যে তারা একই ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশ।

'বিভিন্ন নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়ে সোজা অথবা বক্রপথে প্রবাহিত হয়, অবশেষে সাগরে এসে মিলিত হয়, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাদের বিভিন্ন ভাবধারা নিয়ে অবশেষে পরমাত্মায় মিলিত হয়।' এটা কোন তত্ত্ব নয়, একে স্বীকার করতেই হবে; কিন্তু 'হ্যাঁ, এর মধ্যেও কিছু খুব ভালো জিনিস আছে।' —এই ধরনের অনুগ্রহ দেখানো নয়; অনেকে অবশ্য তাই করেন। আবার কেউ কেউ অদ্ভুত উদার মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন—'অন্য ধর্ম হল প্রাক্-ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষুদ্র অবশেষ, আমাদের ধর্মে সব বস্তুর পূর্ণতা।' একজন বলছে, যে তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ কারণ সেটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন; আবার আর একজন বলছে, তার ধর্ম সবচেয়ে আধুনিক অতএব এটাই শ্রেষ্ঠ। আমাদের স্বীকার করতে হবে সকল ধর্মেই মানবজাতিকে রক্ষা করার শক্তি সমান।

মন্দিরে বা গীর্জায় বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যা শুনেছো, তা কুসংস্কার মাত্র। কেবলমাত্র ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণের রক্ষার এবং মুক্তির জন্য তুমি, আমি বা অন্য কেউ দায়ী নই, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝতে পারি না মানুষ কিভাবে নিজেকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করে আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাবে যে ঈশ্বর কতিপয় মানুষের মধ্যে সকল সত্য অর্পণ করেছেন, আর অবশিষ্ট মানবসমাজের তাঁরাই হলেন অভিভাবক।

গুরুদেবের কাছ থেকে আমি বুঝেছি এই মনুষ্যদেহেই সিদ্ধি সম্ভব। তিনি কাউকে কখনো অভিশাপ দিতেন না, কখনো কারো সমালোচনা করতেন না। সমস্ত মন অপসারিত করে তাঁর দৃষ্টিশক্তি মানবতার সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু ভাবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধরনের অসীম পবিত্রতা, মহান আত্মত্যাগই মুক্তিলাভের গোপন রহস্য। বেদ বলেছে: 'ধন সম্পত্তি বা বংশধরের মাধ্যমে নয়, একমাত্র চূড়ান্ত ত্যাগের মাধ্যমেই অমরত্ব লাভ করা যায়।'

যীশু বলেছেন: 'তোমার যা আছে সব বিক্রি করে দরিদ্রদের দান কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।'

পৃথিবীর তাবৎ ঋষি ও মহাপুরুষগণ এই কথাই বলে গেছেন, সেই মত জীবনে কার্যকরী ও করেছেন। ত্যাগ ছাড়া আধ্যাত্মিকতা লাভ কি ভাবে

সম্ভব ? যেখানেই হোক না কেন, সকল ধর্মের মূলে আছে ত্যাগের বাণী ; আর সব সময় লক্ষ্য করে দেখবে, ত্যাগের ভাব যত কমে যায়, ঐন্দ্রিয়পরায়ণতা ততই ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে, আর সেই পরিমাণে ধর্মভাবও হ্রাস পায়।

এই মহাপুরুষ ছিলেন ত্যাগের মূর্ত-প্রতীক। আমাদের দেশে যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের সবরকম ধন সম্পত্তি মান-অভিমান পরিত্যাগ করতে হয় ; আমার গুরুদেব তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তিনি কখনও টাকা-কড়ি স্পর্শ করতেন না, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীরও এমন শিক্ষা যে ঘুমন্ত অবস্থায়ও কেউ যদি টাকা পয়সা ছুঁইয়ে দিত তাহলে তাঁর মাংসপেশী, এমন কি সারা শরীর সঙ্কুচিত হয়ে যেত।

এমন অনেকে ছিলেন যাঁদের কাছ থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করলে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করতেন, যাঁরা তাঁকে হাজার হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, তবুও তিনি ঐসব লোকের থেকে দূরে থাকতেন। কামনা ও কাঞ্চন—এই দুটি রিপু জয়ের এক জীবন্ত উদাহরণ তিনি ; এই দুটির অনেক উর্ধ্বে ছিলেন তিনি, আর বর্তমানে এইরূপ মানুষের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে মানুষ যাকে নিজেদের 'প্রয়োজনীয় জিনিস' বলে ভাবতে শুরু করেছে, যা ছাড়া একমাসও নাকি বাঁচবে না—জ্যামিতিক হারে তারা এই 'প্রয়োজন' বাড়িয়ে চলেছে—এই সময়ে এই ধরনের ত্যাগের প্রয়োজন। বর্তমানে এমন একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি বিশ্বের অবিশ্বাসবাদীদের কাছে প্রমাণ করতে পারেন যে, এখনও এমন মানুষ আছে, যিনি বিশ্বসংসারের সব ধনসম্পত্তির জন্যও বিন্দুমাত্র লালায়িত নন। এই ধরনের মানুষ এখনও আছেন।

তাঁর জীবনে কোন বিশ্রাম ছিল না। তাঁর জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে আধ্যাত্মিকতা অর্জনে, শেষাংশ ব্যয়িত হয়েছিল তার বিতরণে। দলে দলে লোক আসত তাঁর উপদেশ শুনতে, কোন কোন সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। দু-এক দিনের জন্য নয়, মাসের পর মাস এইরকম চলতে লাগল ; ফলতঃ কঠোর পরিশ্রমে তাঁর দেহ ভেঙে পড়ল। ক্রমে তাঁর গলায় একটা ঘা হল, অনেক বোঝানো সত্ত্বেও তিনি নিজের সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। আমরা যারা তাঁর কাছে সব সময় থাকতাম, তাঁর কষ্ট লাঘব করার জন্য লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম ; কিন্তু যখনই তিনি শুনতেন, লোকে তাঁর দর্শনপ্রার্থী, তিনি তাদের কাছে আসতে দেবার জন্য বলতেন, তারা এলে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেউ বলত, 'তারা কি আপনাকে ক্লান্ত করবে না ?" তিনি হেসে বলতেন, 'এই দেহ ঐ

রকম শত শত ক্লান্তিব বোঝা বহন করেছে। যদি এই দেহ পরের সেবায় ব্যয়িত হয়, তবে তো আমি ধন্য। একটা প্রাণের উপকারে আমি ঐ বকম হাজার হাজাব দেহ উৎসর্গ করতে পারি।' একবাব একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'মহাশয়, আপনি তো একজন মহান যোগী—আপনি আপনার দেহের ওপর মনের প্রভাব বিস্তার করে রোগটা সারিযে ফেলুন না।' প্রথমে তিনি কোন উত্তব দিলেন না, বাববার ঐ একই কথা শুনে তিনি নম্রভাবে বললেন, 'বন্ধু, আমি তোমাকে জ্ঞানী ভাবতাম, কিন্তু দেখছি—তুমি একজন সাধারণ মানুষের মতই কথা বলছ। ভগবানেব জন্যই এই দেহ উৎসর্গীকৃত। তুমি কি বলছে চাও আমি আবার তা ফিরিযে নেব ? এই দেহ বিশ্বেব সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত।'

তাই তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন, চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল যে, তাঁর দেহত্যাগ আসন্ন, তাই আগেব চেযে আবো বেশী বেশী লোক তাঁর কাছে আসতে শুরু কবল। ভারতে এই ধরনেব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে তাঁদেব উপদেশ শোনার জন্য লোকেরা কি ভাবে ভিড কবে, এবং জীবৎকালেই তাঁদের ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা কবে—তা তোমবা কল্পনাও কবতে পার না। হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র তাঁদের কাপড়ের আঁচলটুকু স্পর্শ কবার জন্য প্রতীক্ষা করে! এই ধবনের ধর্মানুরাগ থেকেই সৃষ্টি হয প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। মানুষ যা চায ও পছন্দ কবে, তাই পেযে যায—জাতিব সম্পর্কেও ঐ এক কথাই প্রযোজ্য। যদি তুমি ভারতে গিযে রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, যতই সুন্দর হোক, খুব অল্প শ্রোতাই পাবে; কিন্তু তুমি যদি ধর্মশিক্ষা দাও, তা যতই সুন্দর হোক, খুব অল্প শ্রোতাই পাবে, কিন্তু তুমি যদি ধর্মশিক্ষা দাও—কথায নয় প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রমাণের মাধ্যমে, তা হলে দেখবে শত শত লোক তোমার কাছে আসবে, শুধুমাত্র তোমাকে দেখার জন্য, তোমাব পদতলে নত হওযার জন্য। নিজেব দেহেব প্রতি বিন্দুমাত্র নজর না দিযে তিনি উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা তাঁকে বিরত রাখতে পাবতাম না। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে আসত, তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিযে [illegible] না। তিনি বলতেন 'যতক্ষণ আমার দেহ সক্ষম থাকবে ততক্ষণ [illegible] তিনি তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন [illegible]

[illegible] তিনি সেই দিন দেহত্যাগ কববেন [illegible] তিনি সমাধিস্থ হলেন। এই ভাবে

সেই মহাপুরুষ আমাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। পরদিন তাঁর দেহ আমরা দাহ করলাম।

তাঁর চিন্তাধারা ও বাণী প্রচার করার মত উপযুক্ত লোক অতি অল্পই ছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এমন কিছু সংসারত্যাগী যুবক ছিল, যারা তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। তাদের দমন করার চেষ্টা চালান হয়। কিন্তু তাদের সামনে ছিল এক মহৎ জীবনাদর্শ, যা তাদের উৎসাহিত করল। বছরের পর বছর এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে থাকার ফলে যে অদম্য উৎসাহশক্তি তাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল, তার জোরেই তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। এখন থেকে এই যুবকবৃন্দ কঠোর ভাবে সন্ন্যাসীর জীবন পালন করতে লাগলেন, তাঁরা নিজেদের জন্মস্থান এই শহরের পথে ভিক্ষা করতে শুরু করলেন অন্ন সংস্থানের জন্য, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চবংশজাত। প্রথম প্রথম তাঁরা প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা সেই বাধা অতিক্রম করলেন, দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র এই মহাপুরুষের বাণী প্রচার করতে লাগলেন—ক্রমে সমগ্র দেশে, তাঁর প্রচারিত ধর্ম ধারণা ছড়িয়ে পড়ল। বাংলাদেশের এক অজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করে কোনরকম শিক্ষাদীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মশক্তির জোরে সত্য উপলব্ধি করে অন্যের মধ্যে তা বিতরণ করে গেলেন—আর রেখে গেলেন কয়েকজন যুবককে সেই সত্যের অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখার জন্য।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের কাছে পরিচিত। শুধুমাত্র ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে এই বাণী বিস্তৃত হয়েছে, আমি যদি বিশ্বের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্পর্কে একটা কথাও বলে থাকি—তবে তা নিশ্চিত ভাবেই আমার গুরুদেবের কথা,—আর ভুল-ত্রুটি এবং ক্রোধের অংশ আমার নিজের।

তখন প্রয়োজন ছিল এই ধরনের ব্যক্তির, এখন প্রয়োজন ছিল এই ধরনের আত্মত্যাগের। আজকে নরনারীর মধ্যে যদি কেউ তাঁর সেই ফুলের মত সুন্দর পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হন, সেই পবিত্রতাকে যেন ঈশ্বরের আরাধনায় উৎসর্গ করা হয়! যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে, যারা সংসারধর্ম করতে অনিচ্ছুক, যাদের বয়স অল্প, তারা সংসার ত্যাগ করো। তাদের ত্যাগ করতে দাও। কারণ ত্যাগই আধ্যাত্মিকতা লাভের একমাত্র গোপন রহস্য। প্রত্যেক নারীকে নিজের মা বলে ভাবতে শেখো, ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করো। তাতে কি আসে যায়? যেখানেই থাকো না কেন, ঈশ্বর তোমাদের

রক্ষা করবেন। ঈশ্বর নিজ সন্তানের ভার গ্রহণ করে থাকেন। সাহস সঞ্চয় কর, ত্যাগ করার জন্য সাহসী হও।

এইরূপ ত্যাগের এখন প্রয়োজন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, পাশ্চাত্য দেশগুলোকে মৃত্যু আর বস্তুবাদের জোয়ার কিভাবে প্লাবিত করছে? আর কত দিন চোখে ঠুলি বেঁধে থাকবে? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, কি ভাবে কাম ও অপবিত্রতার শক্তি সমাজকে কলুষিত করছে? বিশ্বাস কর, আমার মনে হয় শুধুমাত্র কথার মার প্যাঁচে অথবা সংস্কার-আন্দোলনের মারফৎ এই অশুভ শক্তিকে ঠেকানো যাবে না; কিন্তু ত্যাগের দ্বারা অবক্ষয় আর বিনাশের মাঝে দৃঢ় ধর্মভাব নিয়ে পাহাড়ের মত অবিচল হয়ে দাঁড়ালে এই সব অশুভ শক্তি রুখতে পারবে। বৃথা কথা নয়, তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে পবিত্রতার শক্তি, সততার শক্তি, ত্যাগের শক্তি উৎসারিত হতে দাও। যারা রাত দিন অর্থের জন্য সংগ্রাম করছে তাদেরকে ঐ শক্তি গিয়ে আঘাত করুক; অর্থের জন্য ব্যাকুল লোকেরা তাদের মাঝে তোমার মত ত্যাগী পুরুষকে দেখে আশ্চর্য হবে।

কাম ত্যাগ কর! কাঞ্চন ত্যাগ কর! আত্মত্যাগী হও! কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেই বা এই ত্যাগ করবে? দুর্বল অথবা বৃদ্ধ সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত— তারা নয়, পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে তেজোদীপ্ত সেই সব শক্তিশালী সুন্দর যুবকেরাই এই শক্তির অধিকারী। তাদের ঈশ্বর সাধনায় জীবন উৎগর্গ করতে হবে; আর তাদের আত্মত্যাগে বিশ্ব রক্ষা পাবে। জীবন উৎসর্গ কর—সমগ্র মানব জাতির সেবক হও—ধর্মোপদেশের জীবন্ত উদাহরণ হও। একেই বলে ত্যাগ, শুধু বাক্যের দ্বারা এটা হয় না। উঠে দাঁড়াও এবং আঘাত করো। তোমার চারিদিক সংসারী সম্পদ পিপাসু মনে পূর্ণ, তোমার দৃষ্টিপাত মাত্রে তারা ভয় পাবে। কথায় কাজ হয় না, সমস্ত প্রচারই বিফলে যায়। প্রতি মুহূর্তে অর্থপিপাসা-তাড়িত রাশি রাশি বই প্রকাশিত হচ্ছে তাতে কোন কাজ হয় না, কারণ ঐ সব গ্রন্থের কথাগুলি শক্তিহীন।

উঠে দাঁড়াও, ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। যদি সব রকম সম্পত্তির লিপ্সা ও কাম ভাব ত্যাগ করতে পারো, তোমার কথা বলার প্রয়োজন হবে না।

তোমার হৃদয়পদ্ম ফুটে উঠবে এবং তার সৌরভ অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে। যে মানুষ তোমার কাছে আসবে, সেই যেন তোমাব আধ্যাত্মিকতায় দীপ্ত হয়ে উঠবে।

এই হল বর্তমান জগতের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। মতবাদ, সম্প্রদায়,

গীর্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রেখো না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে পরমাত্মার অস্তিত্ব আছে, যাকে বলে আধ্যাত্মিকতা, তার তুলনায় ঐ সব নিতান্ত তুচ্ছ। আর যত এই ভাব মানুষের মধ্যে পরিণতি পায়, ততই সে সৎ কাজের জন্য শক্তিশালী হয়। যার মধ্যে এই ভাব প্রবলতম, তিনি প্রতিবেশীর সবচেয়ে ভালো করতে পারেন। প্রথমে এটা অর্জন কর। অন্যদের সমালোচনা করো না। সব ধর্মমতই ভালো। কিন্তু জীবন দিয়ে প্রমাণ কর যে ধর্ম মানে কেবল শাস্ত্র কথা বা বিশ্বাস নয়, এর অর্থ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। শুধু মাত্র যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই এর মর্মকথা বুঝতে সক্ষম, কিন্তু এই ধরণের আধ্যাত্মিকতা বিতরণ করা যায়, এমন কি যারা এ সম্বন্ধে অজ্ঞ তাদেরও। যারা আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করেছেন তারাই মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য হতে পারেন। তাঁরাই দিব্য আলোর শক্তি। তাহলে তোমরাও এইরূপ হও। যে দেশে এই ধরণের ব্যক্তি যত বেশী জন্মগ্রহণ করবে, সেই দেশ তত বেশী উন্নীত হবে। আর যে দেশে এই ধরণের লোকের একান্তই অভাব, সেই দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোনো কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। অতএব সমগ্র বিশ্বের কাছে আমার গুরুদেবের বাণী হল : 'প্রথমে নিজে অধ্যাত্ম ভাবুক হও! সত্য উপলব্ধি করো।' তিনি সকল দেশের শক্তিশালী যুবকদের সম্বোধন করে বলেছেন 'ত্যাগের সময় উপস্থিত।' মানব জাতির স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগ কর। তোমরাই তো মানুষকে ভালোবাসার কথা বল, তা প্রমাণ করার জন্য কাজে লেগে যাও। এখন কাজের সময়। এখনকার আহ্বান—কাজ করো। দ্বন্দ্ব পরিহার করো! বিশ্বকে রক্ষা করো!

স্বামী বিবেকানন্দ

আমার গুরুদেব ঃ স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত

সুদূর ১৮৭৭ সালে এক অপরাহ্ণে পুণ্য মায়ের পবিত্র মন্দির দর্শনের জন্য একদল কলেজের ছাত্র দক্ষিণেশ্বরেব বাগানে গিয়েছিল। সেখানে একদল ব্রাহ্মণ বন্ধুবান্ধব ও পিছনে পিছনে ঘোরা কিছু মানুষ এবং অন্যান্য অনেক মানুষের মধ্যে একজন প্রবীণ সাধুকে দেখতে পেল। মন্দিবের ছোট্ট একটা ঘরে সাধু বসেছিলেন। সেখানে এই ছেলের দল ঢুকল। সাধু তাদের মধ্যে একজনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সেই ছেলেটির তখন এমন কিছু ছিল যা দিয়ে দলের অন্যদের থেকে পৃথক করা যায়। সেই তরুণ কলেজেব ছাত্রটিকে তিনি গান করতে বললেন। সেই তরুণটির গাওয়া রামমোহন রায়ের* গান ছোট্ট ঘরটির মধ্যে যখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তখন সেই প্রবীণ সাধু তার ওপব চেনা লোকের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল এবং আদান-প্রদানের চিহ্ন তাদের মধ্যে চলল। গান শেষ হলে প্রবীণ সাধু হাঁটু গেড়ে এগিয়ে এসে তরুণটিকে আলিঙ্গন করে বলে উঠলেন, "আহ্! তুই আগে আসিসনি কেন? আমি তোকে তিন বছর ধরে খুঁজছি।" তারপর শুরু হল সাধু আর তরুণ শিষ্যের মধ্যে ছ বছর ব্যাপী সংগ্রাম। সংগ্রাম শেষ হল, শিষ্য ভাইরা গুরুকে ধরে ফেলায় শেষ হল। তরুণ কলেজ ছাত্রটির মধ্যে শিক্ষক এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ঢেলে দিলেন। তারপর বিশ্বে বেরিয়ে পড়ল জাতীয় আন্দোলনেব আধুনিক সেন্ট পল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমী ধারায় শিক্ষিত তরুণটির চিন্তায ভারতীয় ক্ষমতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পশ্চিমী প্রভাব ছিল আধুনিক তরুণের চরিত্র-লক্ষণ—সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তার সঙ্গে ছিল সত্যের প্রতি আবেগপূর্ণ ক্ষুধা। পুরনো দিনের বিশ্বাস, পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে তাব খুবই সামান্য বিশ্বাস ছিল। এসবের প্রতি তাঁর বয়সের উপযুক্ত বিদ্রূপও পরিহাস পরিপূর্ণভাবে তিনি উল্লেখ করতেন। পরবর্তীকালে এই তরুণটি স্বামী বিবেকানন্দরূপে পরিচিত হন। বাল্যকালে তিনি এক সাধু থেকে আর এক সাধুর কাছে যেতেন এই প্রশ্ন

---

* বক্তৃতাটি পাটনায় রবিবার, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯০৪ সালে প্রদত্ত হয়। উল্লিখিত গানটি অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্তৃক রচিত হয়।

নিয়ে "তুমি ঈশ্বরকে দেখেছ?" কথিত আছে একবার তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় যেতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ বালকটি সাঁতার দিল, নৌকো বেয়ে উঠল এবং মহর্ষির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সেই স্বাভাবিক প্রশ্নটি। কিন্তু মহর্ষি ইতিবাচক উত্তর দিতে পারলেন না। সেই বালকটি এক শিক্ষকের কাছ থেকে আর এক শিক্ষকের কাছে সেই এক প্রশ্ন নিয়ে ঘুরে ফিরল। যে উত্তর পেল তাতে সে ভগ্নহৃদয় নিয়ে ঘরে ফিরে এল। শিশুকালে রামায়ণের হনুমানকে খুঁজতে বলা হয়েছিল তাঁকে। তিনি গিয়ে বই খুলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন, বৃথাই তাকে খুঁজলেন। বাল্যকাল থেকেই সত্যের জন্য তাঁর আবেগ ছিল। এজন্য বিদেশে তিনি কম পূজা পাননি। সাধুর আত্মা বালকের আত্মার সঙ্গে কথা বলল। গুরু বালকেব ওপর জ্বলজ্বল বিষয়গুলি দিয়ে গভীর ছাপ ফেললেন। তাঁর সেই প্রিয় প্রশ্ন "ভগবানকে দেখেছ" সাধুকে করা হল। সেই অপরিমেয় ভালবাসাসহ উত্তর দিলেন তিনি দেখেছেন এবং সেই বালকও দেখবে। সবাই দেখল যে বালকটি চূড়ান্ত সমাধিতে চলে গেল। সে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি মানবিক ক্রন্দন ছাড় পেয়ে গেল। যেন এ বিচ্ছেদ অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সাধু বললেন, "যে করুণা তোকে প্রত্যাখ্যান করল সে তোর হবে। কাঁদ, কাঁদ এবং কেঁদে তোর হৃদয় বের করে ফেল।"

সাক্ষাৎকারটি ছিল এরকম। সন্দেহ ও অবিশ্বাসযুক্ত এই কলেজের তরুণ আর অজ্ঞ ফকির, কালী উপাসকের মধ্যে। সেই কালীমূর্তি কাঠের নয়, পাথরের নয়, ভীতিজনক রঙে রঞ্জিত নয়, কিন্তু সেই মূর্তি ভয়াবহ আদিম। সেই মূর্তি খুবই নির্দয় যার বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ ধ্বংস হয়ে যাবে—সেই কালীমূর্তি, যে মূর্তির সঙ্গে গোড়ার গোড়ামির সাহচর্য মিশে রয়েছে। সেই ভয়াবহ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রইল বালকটি যতক্ষণ বিভীষিকা বালকের উপর পূর্ণ হয়ে উঠল এবং সেই ধারণাটি বালক সহ্য করতে পারল না। কিন্তু তারপর মানুষের ভিতরের সত্যটি বালকটিকে আরও কাছে টানল এবং তার গুরুর প্রতি বালকটির এত ভালবাসা জেগে উঠল যে সে ঘরবাড়ি ও ভক্তি-ভাজন বন্ধুদের ত্যাগ করল। এক অদ্ভুত ভাবনার তাড়নায় চালিত হয়ে তাকে সেবা করতে এল। সেবা করতে এল গুরুকে প্রাচীন হিন্দু ছাত্রের সব ধারণা নিয়ে, কারণ সাধুর জন্য ছিল শ্রদ্ধা ও পূজার এক শঙ্কিত মনোভঙ্গি। বালকটির সাথী ছিল ধৈর্য ও কষ্ট কিন্তু গুরুর প্রতি একান্ত ভালবাসা ও ভক্তি বালকটিকে মহৎ করল, তার যোগাড় হল একদল ভাই, একদল আত্ম-নিয়োজিত বন্ধু;

যোগান দিল সেই সাহস যা ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহাব করায় তাকে সংকুচিত করল না। ভক্তি ও শৃঙ্খলায় তাকে পূর্ণ করল। পরবর্তী জীবনে এগুলি খুবই সহায়ক হয়েছিল। সেই গুরুর প্রভাব এমনই ছিল যে যখন সময় এল, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের একটা স্তর বিশ্ব দেখতে পেল—সেটা খুব কম পর্যায় নয়—তাদের ভ্রাতার আহ্বানে সাড়া দিযে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব জেগে উঠল ব্রতটি বিশ্বের কাছে ঘোষণা করতে। ব্রতটি একটি জীবন দিয়ে প্রচারিত হয়েছে যাকে বিশ্ব সম্মান করে।

আমাদের কাছে এটা দুর্জ্ঞেয় যে বিশ্বের ঈশ্বর যিনি নদীগুলি সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে যেতে পাঠান, তিনিই আবার একদল সাথী ও সহকর্মী পাঠান যখন এক মহৎ আত্মার কাজকে এগিযে নিযে যাওয়ার প্রশ্ন আসে। শিষ্য গুরুব পাযের কাছে বসে আছে বছরের পর বছর, গুরুর শক্তি শুযে নিচ্ছে, আপনা-আপনি দুর্জ্ঞেয় ও অদ্ভুত, এবং তার গুরুর আলাপী প্রকৃতির মর্ম অবধাবণ করছে—তিনি যে ভয়াবহ রহস্যের অধিকারী তা প্রদান করছেন—এই দৃশ্য কত সুন্দর, কত মহৎ, কত ওপরে তোলে। তার গুরুর অভিজ্ঞতা বালককে জয় করে এবং সেই অবিশ্বাসী তরুণ ভীতিজনক মার শক্তিকে বিশ্বাস করে—সেই যুবক যার মনের উপর পশ্চিমী শিক্ষা, আশা, উদ্বেগ ও ভয় উৎপন্ন করেছে। গুরুর শক্তিকে তরুণ শুযে নিয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতীয় অতীতের আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে বেরিয়ে এল।

অলৌকিক ঘটনা দেখত গুরু কিন্তু শিষ্য এগুলি বিশ্বাস করত না। ভাবত যে তার গুরু বুড়ো ও মাথা খারাপ। অলৌকিক ঘটনাগুলি তার দুর্বল মস্তিষ্কের সৃষ্টি। অবশেষে তরুণটি উপলব্ধি করল যে অলৌকিক দর্শনগুলি এক বৃদ্ধ সাধুর পাগলামিপূর্ণ হীন তোষামোদ নয—সত্য—ভয়ঙ্কর মা কর্তৃক তার গুরুর কাছে পাঠান সত্য। তরুণটি এত দক্ষ হযে উঠল যে এক অপরাহ্নে এক বৃদ্ধা মহিলা কি সব অলৌকিক ঘটনা দেখেছে সেই কাহিনী নিয়ে এল। প্রাচীন সাধু মহিলাকে বালকটিব কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার কাছে মহিলা সব আবার বললেন এবং তখন তরুণ তাকে বলল যে তার দর্শনগুলি সত্য এবং সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। গুরুর শক্তি দুর্জ্ঞেয়ভাবে বিশাল। তিনি একক অভিনেতার নাটক করতেন; তার স্পর্শ মানুষকে সাধু বানাত। বিক্ষুব্ধ ও পাপী হৃদয়ের কাছে তাঁর কথাগুলি গঙ্গাজলের মত মিষ্ট ছিল। তিনি ছিলেন কুসংস্কার ও সত্যের বিস্ময়কর অন্তঃসৃষ্টির অদ্ভুত মিশ্রণ। এবং কে কে ছিল এই গুরু? তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস—এক মহিলা

নির্মিত কালী মন্দিরের এক পুরোহিত—মতামতের খুব গোঁড়া পুরোহিত, দেবীর প্রসাদ খায় এবং পূজা সম্পাদন করে। কিন্তু দেবী যখন আশীর্বাদ পাঠায়, তখন সে পরিবার ও বন্ধুকে ত্যাগ করে এবং সত্যকে ও অলৌকিক দর্শনকে আঁকড়ে ধরে, সমাধিতে ডুবে যায়। তার মন ঈশ্বর ও ভয়ঙ্করী মাতার প্রতি নিবিষ্ট হয় এবং সেই জায়গায় উপনীত হয় যা সকল ধরনের উপাসনার বাইরে—কোন মূর্তি যেখানে পৌঁছয়নি। বিগত সমাধিতে তিনি অনধিগম্য ও চূড়ান্ত শান্তিতে পৌঁছেছিলেন এবং সমস্ত উপলব্ধির বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

গুরুর ব্রত নিয়ে শিষ্য বেরিয়ে পড়লেন। আটবছর দেশে-বিদেশে ঘুরে প্রচার পরিহার করে বিশ্রাম ও ধ্যান চেয়ে অবশেষে হলুদ পোষাক পরা ভিক্ষুক আমেরিকার সেই স্মরণীয় সমাবেশ ধর্মসভায় উপস্থিত হলেন। সুতরাং এই প্রথম ব্রত নিনাদিত হয়ে উঠল এমন একটা সমাবেশে যারা হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে খুবই সামান্য কিছু জানত। এটা ভারতের, তার জনগণের, আদর্শের ব্রত ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল এমন একজনের দিনপঞ্জীতে আমরা দেখি যে লেখককে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে যা তা হল "ধর্ম প্রচারের গুপ্ত রহস্য ছিল অপরিচিত মানুষটির নিজের জনগণের জন্য আবেগ"। তাঁর বক্তৃতাটি ছিল হিন্দু বিশ্বাস সম্পর্কে এবং যাই যিনি বলুন না কেন বা যাই তিনি শেখান না কেন তার সবই হিন্দু, সারগতভাবে হিন্দু। বিশ্বের কাছে তাঁর গুরুর ব্রত ঘোষণায় আপন অন্তরে তাঁর তিনটি বিষয় ছিল যা কাজের জন্য যথাযথ ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ধারায় তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা ও বস্তু অধ্যয়ন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল গুরুর অলৌকিক দর্শন এবং সমগ্রভাবে ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান। ধর্মে যা সত্য, প্রাচের জন্যও সত্য, প্রতীচ্যের জন্যও সত্য, তাই শেখানো ধর্ম সম্পর্কে দুঃখজনক কুতর্ক কাটিয়ে দেওয়ার শিক্ষা দিতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

১৯০০ সালে প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বারের মত তাঁর গুরুর ব্রতের কথা পশ্চিমের কাছে বলেন। তাঁর ধর্মের যে ব্যাখ্যা তিনি সেখানে দেন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় জগতের উচ্চতম স্থানাধিকারী সংস্কৃতির মানুষেও তা গ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের নম্র জীবনকে তার কাজ গৌরবান্বিত করে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এশিয়ার নেতৃত্ব পুনঃ স্থাপন করেন। বিবর্তনের তত্ত্ব এবং অন্য বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি ইউরোপ খুব সহজেই ধরতে পারে কিন্তু এশীয় মেধার ভিত্তি হচ্ছে সকল ধর্মীয় কার্যকলাপ।

আপনাদের কাছে, তার নিজের দেশের লোকের কাছে, তার ব্রত হচ্ছে এটি বানানোতে আপনার যে শক্তি আছে তাই। আপনাদের কাজ, বিশ্বাস ও উপলব্ধি এবং সবার উপরে আপনাদের সাহসের উপর তাঁর ব্রত নির্ভরশীল। মহামাতার আশীর্বাদ আপনাব ওপর বর্ষিত হোক; লোহার বাঁধনের চেয়ে শক্তিশালী বাঁধন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি ও ক্ষমতায় মাতাল হয়ে ওঠ।

আমাদের স্বামীজী ও তাঁর বাণী

স্বামী বিবেকানন্দের যে চার খণ্ড গ্রন্থাবলী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হচ্ছে তার ভেতর দিয়ে আমরা শুধু সাধারণভাবে জগৎবাসীর জন্যে উপদেশাবলীই পাইনি, হিন্দু ধর্মের সন্ততিদের জন্য হিন্দু বিশ্বাসের একটি সনদও প্রাপ্ত হয়েছি। আধুনিক যুগের ব্যাপক ভাঙনের মাঝখানে হিন্দু ধর্ম চেয়েছিল পাথরের মত কঠিন এবং দৃঢ় একটি আশ্রয়, যেখানে সে নিশ্চিন্তে নোঙর করতে পারে। চেয়েছিল একটি প্রামাণ্য উক্তি যার মধ্য দিয়ে সে নিজ স্বরূপকে চিনতে পারে এবং তার এই প্রয়োজন মিটিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী এবং রচনা।

অন্যান্য জায়গায় যেমন বলা হয়েছে, ইতিহাসে এই প্রথম একজন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মনীষীর দ্বারা সামগ্রিক হিন্দু ধর্ম ব্যক্ত হল। আগামী যুগে যখন কোন হিন্দু হিন্দু ধর্মের প্রমাণ চাইবে, যখন কোন হিন্দু মা তাঁর সন্তানদের শিক্ষা দেবেন পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম বিষয়ে তখন তারা প্রমাণ ও আলোর জন্য এই বইয়ের পাতা উল্টে দেখবেন। ইংরেজি ভাষা এদেশ থেকে উঠে যাওয়ার অনেক দিন পরেও ঐ ভাষাকে মাধ্যম করে জগতের কাছে যে উপহার দেওয়া হল তা পৃথিবীতে স্থায়ী হবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমান ভাবে তার ফল প্রাপ্তি ঘটবে। হিন্দু ধর্মের প্রয়োজন ছিল তার ভাবধারাগুলিকে সংগঠিত ও সুদৃঢ় করা। পৃথিবী চেয়েছিল একটি ধর্ম বিশ্বাস যা সত্য সম্পর্কে নির্ভীক। এই দুটোই আমরা এখানে পাচ্ছি। সঙ্কটের সময় জাতীয় চেতনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে তাকে তাঁর কণ্ঠে বাঙ্ময় করেছিলেন যিনি, সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয়ের চেয়ে সনাতন ধর্মের চিরকালীন বীর্যের মত, অতীতের মতই ভারত যে বর্তমানেও মহিমাযুক্ত, সে বিষয়ে আরও বড় প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। এটা যেন আগে থেকেই অনুমান করা ছিল যে নিজের সীমানার বাইরে ভারত শুধু তার অন্ন পরিবহন করেই নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এই যে প্রথম এমন ঘটনা ঘটল তা নয়। এর আগেও

একবার প্রতিবেশী দেশে জাতি সংগঠনী ধর্মের বাণী পাঠিয়ে ভারতবর্ষ নিজস্ব চিন্তাধারার মহত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধ হয়েছিল—সেই আত্মগত ঐক্যের দ্বারাই আধুনিক হিন্দু ধর্মের জন্ম হয়েছিল। আমরা কখনোই বিস্মৃত হতে পারি না যে, এই ভারতভূমিতেই প্রথম গুরু তাঁর শিষ্যকে আদেশ করেছিলেন, "যাও পৃথিবীর সমস্ত জীবের কাছে এই ধর্মোপদেশ প্রচার কর।" এও সেই একই ভাবনা, একই ভালোবাসার প্রেরণা নতুন রূপ নিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে যখন তিনি প্রতীচ্যের একটি বিশাল সম্মেলনে বলছেন : "একটি ধর্ম যদি সত্য হয় তবে অন্যগুলিও অবশ্যই সত্য হবে। এইজন্য হিন্দু ধর্ম আমাদের যতটা তোমাদেরও ততটা।" আবার এই একই বক্তব্যের ভাব-সম্প্রসারণ করতে গিয়ে বললেন, "আমরা হিন্দুরা শুধু পরধর্মসহিষ্ণু নই, আমরা সকল ধর্মের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিই। আমরা মুসলমানদের মসজিদে যাই, জরথুষ্ট্রদের অগ্নি পূজা করি এবং খ্রীষ্টানদের ক্রুশের সামনে জানু পেতে বসি। আমরা জানি যে ধর্মগুলি সে নিম্নতম জড়বাদ থেকে উচ্চতম পরমবাদ পর্যন্ত একটি অসীমকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত্ব করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।"

অতএব আমরা এই 'ফুলগুলিকে একত্রিত করে ভালবাসার সুতোয় বেঁধে উপাসনার জন্য একটি অপূর্ব মালা তৈরি করি'। এই বক্তার হৃদয়ে কেউই বিদেশী বা অপর ছিল না। তাঁর কাছে শুধু মানবজাতি ও সত্যের অস্তিত্ব ছিল।

ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায় যে যখন তিনি বলতে শুরু করেন তখন তাঁর বিষয় ছিল 'হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবধারা', কিন্তু যখন তিনি শেষ করলেন, হিন্দুধর্ম যেন নতুন করে সৃষ্ট হয়েছে। সেই মুহূর্তটি সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের একটা বড় অংশ ছিল পুরোপুরি প্রতীচ্য-মনের প্রতিনিধি কিন্তু এদের কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য ও প্রগতি ছিল। ইউরোপের সমস্ত জাতির মানুষই আমেরিকায় এসেছে এবং মুখ্যত চিকাগোতে যেখানে ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক কালে প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টতম যা, তার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের এই পুররানীর সীমান্তে পাওয়া যাবে—মিচিগানের হ্রদের তীরে ঐ রানী পা ছড়িয়ে উত্তরের আলোকে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে বসে বসে চিন্তা করছেন। আধুনিক চেতনার এমন জিনিস খুব কমই আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে ইওরোপের ঐতিহ্য থেকে খুব কমই পাওয়া গেছে যা চিকাগো নগরীতে আশ্রয় পায়নি। এবং এখানকার সৃষ্টিশীল জীবন ও ব্যগ্র কৌতুহল আমাদের কারো কাছে বর্তমানে খুব বড় বিশৃঙ্খল

বলে মনে হলেও তারা নিঃসন্দেহে মহিমাপূর্ণ ও ধীরে পরিণত মানব ঐক্যাদর্শ প্রকাশ করতে এগিয়ে চলেছে। এই ছিল সেখানকার মানসক্ষেত্র, মনোসাগর—তরুণ, উদ্বেল—আত্মবিশ্বাসে, শক্তিতে উচ্ছল—আর ছিল অনুসন্ধিৎসা ও সজাগতা। যখন বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠলেন তিনি এইসব অবস্থাগুলির মুখোমুখি। বিপরীত দিকে, তাঁর পেছনে ছিল এক প্রশান্ত মহাসাগর, যুগ-যুগান্তের অধ্যাত্মসাধনায় প্রশান্ত। তাঁর পেছনে ছিল এমন একটা জগৎ যার দিনপঞ্জী শুরু হয়েছে বেদ, উপনিষদের দিন থেকে—এমন একটি জগৎ যার কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রায় শিশু ; এমন একটি জগৎ যেখানে ধর্ম ব্যবস্থা বহু সম্প্রদায় অধ্যুষিত ; একটি শান্ত দেশ যা গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যালোকে আচ্ছন্ন, যে দেশের পথের ধুলো যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিরা মাড়িয়ে চলেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁর পেছনে রয়েছে এক ভারতবর্ষ, হাজার হাজার বছরের জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে সে অনেক কিছু প্রমাণ করেছে, পরীক্ষা করেছে, এবং অনেক কিছুই উপলব্ধ হয়েছে, শুধু তার নিজের ঐকমত্য ছাড়া, যে ঐকমত্য সে দেশের সব মানুষই কিছু কিছু মৌলিক ও প্রয়োজনীয় সত্য হিসেবে বহু দিন ধরে আঁকড়ে রয়েছে।

অতএব এগুলি ছিল দুটি মনের প্রবাহ, প্রাচ্য ও আধুনিক এই দুটি যেন চিন্তার বিশাল দুই নদী ; ধর্মমহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গৈরিকবসনধারী ঐ পরিব্রাজক যেন সেই সময়ের জন্য হয়েছিলেন এদের মোহনা। নৈর্ব্যক্তিক এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘটিত আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফসল হিসেবে হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলি রূপ পেয়েছিল।

কারণ নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতার ফলে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ সেদিন বাঙ্ময় হয়ে ওঠেনি। এমন কি এই সুযোগে নিজের গুরুর কথা বলার সুবিধেও তিনি কাজে লাগান নি। এই দুটি জিনিসের পরিবর্তে তাঁর ভেতর দিয়ে বাঙ্ময় হয়েছিল ভারতীয় ধর্মচেতনা, তাঁর সমগ্র দেশবাসীর বাণী যা সমগ্র অতীতের দ্বারা নির্দিষ্ট। এবং যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনে অথবা মধ্যাহ্নে বক্তৃতা করছিলেন তখন প্রশান্ত মহাসাগরের আর এক প্রান্তে গোলার্ধের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে ছায়ায় নিদ্রিত একটি জাতি তাদের দিকে অগ্রসরমান প্রত্যুষবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করছিল, যে বাণী তাদের নিজেদের মহত্ত্ব ও শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবে।

একই মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দের পাশে ছিলেন আরও অনেকে যাঁরা তাঁরই মত, বিশেষ বিশেষ ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে এসে-



চিকাগো ধর্মসম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর গৌরব ছিল এই যে তিনি এমন এক ধর্মের প্রচারক হিসেবে এসেছিলেন যাঁর কাছে, স্বামীজীর ভাষায়, এদের প্রত্যেকটি ছিল "বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নানা মানুষ-মানুষীর একই লক্ষ্যে পেঁছিবার অভিগমন।" তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন এমন একজনের কথা বলার জন্য যিনি তাদেব সকলের কথা বলেছেন —তাদের একটি বা অপরটি সত্য, এবিষয়ে বা ও বিষয়ে, এ কারণে বা ও কারণে তা নয় বরং "একটি সুতোয় অনেক মুক্তোর মত তোমরা আমাতেই গাঁথা রয়েছ। যেখানেই দেখবে কোনো অতিশয় পবিত্রতা বা অতিশয় শক্তি মানুষকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করছে, জানবে সেখানেই আমি আছি।" হিন্দুর কাছে, বিবেকানন্দ বলেন, "মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে গমন করে না বরং সত্য থেকে সত্যে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করে।" এইটা এক মুক্তির শিক্ষা, সেই তত্ত্ব—"ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে মানুষকে ব্রহ্ম হতে হবে" এবং ধর্ম তখনই আমাদের মধ্যে পূর্ণতা পায় যখন সে আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যায় "যিনি মৃত্যুর জগতে একমাত্র জীবন, নিত্য পরিবর্তনশীল বিশ্বে যিনি একমাত্র অনড়, যিনি একমাত্র আত্মা এবং অন্যান্য জীবাত্মারা যাঁর কাছে মায়াময় বিকাশ মাত্র"—এই দুটি শিক্ষা দুটি পরম ও মহান সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, মানুষের ইতিহাসের চিরকালীন এবং জটিল অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত এই সত্য আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কাছে ঘোষণা করল ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষের পক্ষে এই ছোট্ট ভাষণটি ছিল তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার একটি সনদের মত। সামগ্রিক অর্থে বক্তা হিন্দুধর্মকে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু 'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার অর্থ অধ্যাত্মতাৎপর্যে রূপান্তরিত করেন। তাঁর কাছে, যা কিছু সত্য তাই বেদ, তিনি বললেন, "বেদ অর্থে কোনো বইকে বোঝায় না। বেদের অর্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীর একটি সঞ্চিত ভাণ্ডার।" এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা ব্যক্ত করেন,—"বেদান্ত দর্শনের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, যার তুলনায় বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলিও প্রতিধ্বনিমাত্র মনে হয়, সেই বেদান্ত দর্শন থেকে শুরু করে, পুরাণ সংশ্লিষ্ট নিম্নস্তরের মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ সব কিছুই হিন্দু ধর্মে স্থান পেয়েছে। তাঁর মতে এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোনো মতবাদ,—ভারতবাসীর এমন কোন আন্তরিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা থাকতে পারে না যা

যথার্থভাবে হিন্দু আলিঙ্গনের বাইরে হতে পারে—কোনো ব্যক্তির কাছে ঐ মতবাদ বা সম্প্রদায় যতই অবক্ষয়ী মনে হোক না কেন। তাঁর মতে ইষ্টদেবতা-বিষয়ক শিক্ষাই হল ভারতীয় ধর্মভাবের মূল বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকটি মানুষেরই নিজের পথ পছন্দ করার এবং নিজপথে ভগবানকে অনুসন্ধান করার অধিকার আছে। এইভাবে সংজ্ঞা নিরূপণ করলে মস্ত হিন্দু সাম্রাজ্যের পতাকা কোনো সৈন্যবাহিনী বহন করে না। কারণ যেহেতু তার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ঈশ্বরের অনুসন্ধান, তার আধ্যাত্মিক অনুশাসনও তাই—স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি আত্মার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু এই সবাইকে গ্রহণ করা, প্রত্যেকের এই স্বাধীনতা হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বলে বিবেচিত হত না যদি না তার পরম আবাহন মধুরতম এই প্রতিজ্ঞায় ধ্বনিত হত: "শুন সবে অমৃতের পুত্র, যারা স্বর্গবাসী তারাও শুন সবে—আমি সেই প্রাচীনপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যিনি সকল অন্ধকার, সকল অজ্ঞানতার অতীত। তাঁকে তোমরাও জানো, তবেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।" এই হল সেই পরম বাণী যার মধ্যে আর সব কিছু আছে এবং চিরকালই রয়েছে। এই সেই চরম উপলব্ধি যাব মধ্যে আর সব অনুজ্ঞা বিলীন হয়। স্বামীজী তাঁর 'আমাদের সামনে কর্তব্য' এই বিষয়ক বক্তৃতায় সকলকে তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান একটি মন্দির নির্মাণকল্পে, যেখানে দেশের প্রতিটি উপাসক উপাসনা করতে পারে, যে মন্দিরের বেদীতে শুধু ওঁ এই শব্দ খচিত থাকবে, তখন আমরা কেউ কেউ সেই উক্তির মধ্যে আরও বড় একটি মন্দিরের রূপকল্প লক্ষ্য করি, সে মন্দির নিজরূপে প্রতিষ্ঠিতা আমাদের দেশমাতা ভারতবর্ষ স্বয়ং এবং তাতে শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত মানবজাতির ধর্মপন্থাগুলি একীভূত হচ্ছে—সেই পবিত্র বেদীর পাদমূলে যেখানে একটি প্রতীক আছে, যে প্রতীক আসলে কোনো প্রতীক নয়, তা শব্দের অতীত একটি নাম। পৃথিবীর সবচেয়ে আচারনিষ্ঠ ধর্মগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভারত ঐক্যতানে ঘোষণা করে যে সাধনার প্রগতি দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে, বহু থেকে একে, নিম্ন থেকে উচ্চে, সাকার থেকে নিরাকারে এবং কখনোই এর বিপরীত নয়। ভারতের বিশিষ্টতা এখানেই যে সে প্রতিটি আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসকেই, যে কোন স্থানের বা প্রকারের হোক না কেন, উচ্চমুখী সোপান বিবেচনা করে, তাকে সহানুভূতি ও আশ্বাস দেয়। হিন্দুধর্মের এই দূতের মধ্যে যদি কোনো নিজস্বতা থাকত তবে স্বামীজী তাঁর যথার্থ সম্মান পেতেন না গীতার শ্রীকৃষ্ণের মত, বুদ্ধের মত, শঙ্করাচার্যের মত এবং ভারতীয় চিন্তার

প্রতিটি শিক্ষাগুরুর মত তাঁর বাক্যগুলি ছিল বেদ ও উপনিষদের উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ। যে রত্নভাণ্ডার ভারত তার নিজের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে তারই ব্যাখ্যাতা ও প্রবক্তা হিসেবে স্বামীজী ছিলেন। যদি তিনি কখনো জন্মগ্রহণ নাও করতেন তাহলেও যে সত্য তিনি প্রচার করলেন তা সত্যই রয়ে যেত। কিংবা সেগুলি আরও বেশি প্রামাণ্য হয়ে যেত। তবে প্রভেদ হত এই যে সেগুলি সাধারণের কাছে অবোধ্য হত, আধুনিক সরলীকরণ ও বক্তব্যের তীব্রতা থাকত না, পারস্পরিক সংহতি ও ঐক্যের হানি ঘটত। তিনি যদি না আবির্ভূত হতেন তাহলে আজ যে শাস্ত্রবাক্য হাজার হাজার মানুষের কাছে জীবনের পরমান্ন হিসেবে বাহিত হ'ল, সেগুলি পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য তর্কবিরোধের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। তিনি প্রামাণ্য কর্তৃত্ব নিয়ে শিক্ষা দিতেন, পণ্ডিতের মত নয়। কারণ তিনি যা প্রচার করতেন তার গভীরে অবগাহন করে উপলব্ধি করতেন এবং রামানুজের মতই তিনি শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের কাছে উপলব্ধির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং তবুও তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যে নতুন কিছু নেই এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্যি নয়। একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে স্বামী বিবেকানন্দই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অদ্বৈতদর্শনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেও হিন্দুধর্মে এই নতুন তত্ত্ব যুক্ত করলেন যে দ্বৈত, বশিষ্ঠ দ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি বিভিন্ন অবস্থা বা অনুক্রমিক স্তর যার শেষোক্তটি হল বিকাশের চরম লক্ষ্য। এটা আরও একটি মহৎ ও সরল তত্ত্বের অঙ্গবিশেষ, তা হল, বহু এবং এক একটাই সত্তা, শুধু বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন সময়ে অনুভূত অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "ভগবান সাকার, নিরাকার দুই এবং তিনি এমনই যাতে সাকার এবং নিরাকার উভয়ই অন্তর্গত।"

আমাদের গুরুদেবের জীবনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত যে তিনি একটি সঙ্গমস্থলে পরিণত হয়েছেন যেখানে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যই মিলিত নয়, অতীত এবং ভবিষ্যৎও। যদি বহু এবং এক একই সত্তা হয় তাহলে শুধু সব উপাসনা-পদ্ধতিই নয়, সমানভাবে সব কর্মপদ্ধতি, সব অন্বয় পদ্ধতি, সৃষ্টি পদ্ধতি উপলব্ধির পথ। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক এ বিভেদ থাকতে পারে না। কায়িক পরিশ্রমেরই আর এক নাম প্রার্থনা, জয়েরই নাম ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। যোগ এবং ক্ষেম ত্যাগ আর বর্জনের মতই কঠিন দায়।

এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান প্রচারক করেছে, তবে এই কর্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগ থেকে আলাদা নয় বরং তাদের প্রকাশক। ভগবানের

সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর কাছে কারখানা, পড়াশুনো, ক্ষেত-খামার, সাধুর কুটির ও মন্দিরের দরজার মতই সত্য ও উপযুক্ত। তাঁর কাছে মানবসেবা এবং ঈশ্বরের উপাসনায়, পৌরুষ ও বিশ্বাসে, সদাচার ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁর সব বাণীই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর এই প্রধান বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। একবার তিনি বলেছিলেন "চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে বিকাশ করার তিনটি পথ। কিন্তু এর উপলব্ধির জন্য আমাদের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে হবে।"

যে গঠনমূলক প্রভাবে তাঁর অলৌকিক দৃষ্টি নিরূপিত হয়েছিল তার তিনটি সূত্র আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে—প্রথমত, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর সাহিত্য শিক্ষা। এই দুটি ভাষার পরস্পরবিরোধী ভাবজগৎ ভারতবর্ষের ধর্মীয় গ্রন্থগুলির অন্তর্গত অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর মনে একটি দৃঢ় ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে এই যদি সত্য হয় তবে ভারতীয় ঋষিরা হঠাৎ তা লাভ করেন নি, যেমন অন্যান্যরা করেছেন। বরং এটা ছিল বিজ্ঞানের বিষয়, সেই যৌক্তিক বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত যা সত্যের অন্বেষণে কোনো প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে পশ্চাৎপদ হয়নি।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যখন রামকৃষ্ণ পরমহংস শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন নরেন নামে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রগুলির সেই প্রমাণ পেয়েছিলেন যা তাঁর হৃদয় এবং যুক্তি অন্বেষণ করছিল। এখানে তিনি সেই সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন বইতে যা অস্পষ্টভাবে বর্ণিত। এখানে এমন একজন ছিলেন যাঁর জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি সমাধি। প্রতি ঘণ্টায় মনের গতি বহুর থেকে একের দিকে ধাবিত। প্রতি মুহূর্তে শোনা যেত সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞার উপদেশাবলী, তাঁর চারপাশের সকলেই দিব্যদর্শন লাভ করত। জর অনুভূতির মতই জ্ঞান লাভের এষণা এই শিষ্যকে সমাচ্ছন্ন করেছিল। যিনি এইরকম বইয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই ছিলেন কারণ তিনি কোনো বই পড়েন নি। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের চাবিকাঠিই খুঁজে পেয়েছিলেন।

তবু এখনও তাঁর কর্মপ্রস্তুতি সমাপ্ত নয়। তাঁকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে হয়েছে, সাধু পণ্ডিত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে, সকলের কাছে শিখতে হয়েছে, সকলকে শিক্ষা দিতে হয়েছে, সকলের সঙ্গে বাস করতে হয়েছে—এবং ভারতমাতা যেমন অতীতে ছিলেন ও যেমন বর্তমানে হয়েছেন তা দেখতে হয়েছে—এইভাবে ব্যাপক সমগ্রতাকে

আয়ত্ত করে তিনি উপলব্ধ হয়েছিলেন যে এইসবের সংক্ষিপ্ত এবং ঘন সংস্করণ ছিল তাঁর গুরুদেবের জীবন ও ব্যক্তিত্ব।

তাহলে এই তিনটি সুর—শাস্ত্র, গুরু এবং মাতৃভূমি—একত্রে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনাবলীর মহান্ সংগীত। এই রত্নভাণ্ডার তিনি দান করেছেন। এগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুদান দিয়ে তিনি তৈরি করেছেন পৃথিবীর সকলের জন্য এক সর্বরোগহর ওষধি। এগুলি যেন তিনটি দীপশিখা, একই আধারে অবস্থিত, ভারতবর্ষ তাঁর হাত দিয়ে জ্বালিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর নিজের সন্ততি ও সমগ্র মানবজাতিকে পথ-নির্দেশ দেওয়ার জন্য—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ থেকে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ পর্যন্ত মাত্র কয়েক বছরের কর্মের মাধ্যমে। এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যাঁরা এই দীপ জ্বালানোর জন্য ও এই রচনাবলী যা তিনি পেছনে রেখে গেলেন তার জন্য। আশীর্বাদ জানাই সেই দেশকে যেখানে তাঁর জন্ম, তাঁদের যারা তাকে প্রেরণ করেছিলেন। এবং বিশ্বাস রাখি এখনও তার বাণীর বিশালত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। *

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কাজের জাতীয় তাৎপর্য

বিশ্বে যে দেহধারী বিবেকানন্দ বলে পরিচিত ছিলেন, আজ তাঁর ভস্মাধার ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের নদীতীরে নিভৃত বিগত পাঁচবছর ধরে প্রজ্বলিত আলো আজ নির্বাপিত। নানা জাতির জীবনে ধ্বনিত মহাকণ্ঠ মৃত্যুতে নিশ্চুপ।

জীবন প্রায়ই এই শক্তিমান আত্মার কাছে ঝড় ও যন্ত্রণারূপে এসেছে কিন্তু অবসানে শান্ত। নিঃশব্দে, সুষম সঙ্গীতের শেষে, কালির অন্ধকার রাত্রে মৃত্যুর আশীর্বাদ এল। ক্লান্ত ও নির্যাতিত দেহ ধীরে শায়িত হল। বিজয়ী আত্মার চিরসমাধিতে পুনঃস্থাপিত হল।

তিনি চলে গেলেন। তাঁর প্রথম সাফল্যের শিরোমাল্য তখনও সতেজ ছিল। তিনি চলে গেলেন। তখনও তাঁর কানে সজ্জন ও মহান আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছিল। নিঃশব্দে, তাঁর সুন্দর রোগকক্ষে মাত্র কয়েকটি ছেদ সহ অন্তবর্তী বছরগুলি গাছপালা ও জীবজন্তুর মধ্যে, চারপাশে সমবেত শিষ্যদের

* রচনাটি স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী রচনাসংগ্রহের ভুমিকরূপে লিখিত।

অনাড়ম্বর শিক্ষা দিতে দিতে, তাঁর নামের আলোকোজ্জ্বল যশঃখ্যাতিকে নীরবে অবহেলা করে তিনি চলে গেলেন। তাঁর মূল্যবান কাজের স্বকৃত নিষ্করুণ সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে মানুষ-গড়া। এবং শ্রমশীলতাসহ অক্লান্তভাবে, দিনের পর দিন ঘুরে ফিরে গুরু, পিতা এবং বিদ্যালয়-শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে তিনি মানুষ গড়ার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। যে অপরাহ্ণে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিনই কি বেদের ওপর সংস্কৃত পাঠ দেওয়ায় তিন ঘণ্টা ব্যয় করেন নি?

এ ধরনের মানুষের কাছে বাহ্যিক সাফল্য ও নেতৃত্ব তুচ্ছ। পশ্চিমে থাকা বছরগুলিতে, তাঁর ধনী ও শক্তিশালী বন্ধু হয়েছিল। তারা সানন্দে তাঁকে নিজেদের মধ্যে রাখতে পারত। কিন্তু তাঁর কাছে, তার সকল বৈভব নিয়ে পাশ্চাত্য কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর কাছে ভিক্ষুকের পোশাক, কলকাতার গলি, এবং তার নিজের দেশের মানুষের অক্ষমতাগুলি বিদেশের গৌরবের চেয়ে আরো প্রিয় ছিল। যে সদাই প্রাচ্যের দিকে ধাবিত এমন একজনের প্রভাব শিথিল হল ধৃত হাতের ওপর।

কি জন্য পাশ্চাত্য তার কথা শুনত, এত লোক প্রশংসা করত এবং বিশ্বের মহান ধর্মীয় শিক্ষকদের অন্যতম বলে তাঁর নাম স্মরণ করত? তাঁর কোন ব্যক্তিগত দাবি ছিল না। তিনি কোন ব্যক্তিগত কাহিনী বলতেন না। তিনি যাদের অনেকদিন জানতেন ও বিশ্বাস করতেন তাঁরা কখনও শোনেননি যে গুরুভাইদের মধ্যে তিনি কোন বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন। ঈশ্বরই হোক বা গুরুই হোক, অচেনা লোকের কাছে কোন এক রূপ বা বিশ্বাসকে জনপ্রিয় করবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। বরং বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক জগতের ওপর তুষারাবৃত হিমালয়ের আপন উৎস থেকে আসা সতেজ শীতল জলধারা তার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম প্রবলবেগে ঢেলেছে। ভারতীয় গৃহ ও সাধু-সন্ন্যাসীর বিশাল ধর্মীয় সংস্কৃতির সাক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে কখনই নিবৃত্ত করতে পারেন নি। বেদান্ত ব্যতীত তিনি কিছুই শেখান নি। এবং মানুষ কেঁপেছে, কারণ তারা এই প্রথম সত্যে নির্ভয় এমন ধর্মীয় শিক্ষকের কণ্ঠ শুনল।

আমরা জানি না শিবের সেই কাহিনী যখন তিনি পথের পাশ দিয়ে চলছিলেন। "কেউ বলে তিনি পাগল। কেউ বলে তিনি শয়তান। কেউ বলে—তুমি জান না? তিনি স্বয়ং ঈশ্বর।" তৎসত্ত্বেও ভারত এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত যে প্রত্যেক মহান ব্যক্তিত্বও বিরোধী ধারণাসমূহের সাক্ষাৎ ও মিলন ক্ষেত্র। তাঁর শিষ্যদের কাছে বিবেকানন্দ চিরকালই সন্ন্যাসীদের আদর্শ-

রূপে থাকবেন। তাঁর মধ্য দিয়ে যে উদ্দীপনগুলি আমরা পেয়েছি তার মধ্যে প্রধান হল জ্বলন্ত ত্যাগ। "আমার প্রভুর মত সত্যিকারের সন্ন্যাসীর মৃত্যু আমাকে দাও," তিনি একদা বলে উঠেছিলেন, "অর্থ, নারী ও যশে নির্বিকার! এবং এসবের মধ্যে সবচেয়ে ছলনাময়ী হচ্ছে যশপ্রীতি!" তথাপি সেই আত্মসদৃশ অদৃষ্ট যে তার মধ্যে মূর্ত তীব্র বৈরাগ্যের জ্বলন্ত তৃষ্ণা দিয়ে পরিপূর্ণ করেছিল সেই তিনি আদর্শ গৃহীত ছিলেন,—রক্ষণাবেক্ষণের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ, দ্রব্যাদির ব্যবহার, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে আগ্রহী, জীবনের পুনর্গঠন ও পুনঃশৃঙ্খলা স্থাপনায় আগ্রহী। এ বিষয়ে অবশ্য তিনি বেনেদিস্ট ও বার্নার্ড, রবার্ট দি সিটকস্ক ও লাওলার জ্ঞাতি। এ কথা বলা যেতে পারে যে আস্‌সিসির ফ্রান্সিসের মধ্যে যেমন ক্যাথলিক গীর্জার ইতিহাসে মুহূর্তের জন্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর হরিদ্রাভ পোশাক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি মহান সাধু বিবেকানন্দের মধ্যে পশ্চিমী মঠবাসীদের মঠাধ্যক্ষ নতুন করে প্রাচ্যে জন্ম নিয়েছে।

একইভাবে, তিনি একাধারে ছিলেন অধিচেতন ধর্মের স্বর্গীয় প্রকাশ এবং অন্যাধারে সর্বকালের জাত শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমীদের একজন। জাতীয় অনৈক্যের সময়ে বেঁচেছিলেন এবং নতুনকে তিনি ভয় করতেন না। তিনি বেঁচেছিলেন যখন সবাই উত্তরাধিকারকে পরিত্যাগ করছে, এবং তিনি প্রাচীনের গোঁড়া পূজারী ছিলেন। ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি চেতনার নতুন তরঙ্গ সদাই উদ্বোধিত হওয়া জাতির এ ভবিতব্য তার মধ্যে স্বয়ং পরিপূর্ণতা লাভ করল। এটাও হতে পারে যে এই রকম মানুষের মধ্যে ভবিষ্যতে সমগ্র বেদ আমরা পাব। যাই হোক আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিবেকানন্দের ধর্মীয় তাৎপর্য পরিমাপের সময় হয়নি। ধর্ম জীবন্ত বীজ। তার বপন সমাপ্ত। ফসল তোলার সময় এখনও হয়নি।

কিন্তু মৃত্যুই প্রকৃতপক্ষে দেশকে দিল দেশপ্রেমিককে। যখন তাঁর শিষ্যদের মাঝখান থেকে গুরু চলে গেলেন, শ্মশানে তাঁর সমালোচকদের সমস্ত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সেই স্বাধীনতার কথা বলা কম্বুকণ্ঠ অবাধে ধ্বনিত হল এবং সমগ্র জাতি এক হয়ে সাড়া দিল। এখানে ছিল একটা মন যে বহু দেশের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের অনন্ত সুযোগ পেয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে তিনি দেখেছিলেন উঁচু ও নীচু সবাই একইভাবে সমাদর করেছিল। দৃষ্টের পরিমাপে তার চমৎকার মেধা কখনও ব্যর্থ হয়নি, "আমেরিকা শূদ্রদের সমস্যার সমাধান করবে, কিন্তু কি ভয়ানক গোলমালের মাধ্যমে।" পশ্চিমের

সম্পদের লোভ ও অত্যাচারের কামনা দেখে এবং তার সঙ্গে বহু শতাব্দী পূর্বে চীনের সূত্রায়িত প্রাচীন এশীয় সমাধানগুলির স্থির মর্যাদা ও নৈতিক স্থায়িত্বের সঙ্গে তুলনা করে দ্বিতীয় ভ্রমণের সময় অবশ্য তিনি মন পরিবর্তনের জন্য প্রলুব্ধ হযেছিলেন। তাঁর অসাধারণ সূক্ষ্ম বিচারশক্তি বিস্ময়কর মানবতার সংযোজক হযে দাঁড়াল। আফ্রিকার জাতিসমূহের সম্পর্কে অবজ্ঞার সঙ্গে যে আমেরিকান ভদ্রলোক কথা বলছিলেন তাকে প্রত্যুত্তর হিসাবে তিনি যা বলেছিলেন নিগ্রোদের পক্ষে এত বড আশার বাণী আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। এবং যখন তাঁকে মাঝে মাঝে দক্ষিণ দেশীয় রাজ্যগুলিতে "কৃষ্ণ লোকদের" কাছে নিয়ে যাওয়া হত, এবং কোন কোন দরজার কাছ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হত (ভুলটা ধরা পড়া মাত্র সেই জায়গায সবচেয়ে দায়িত্বশীল পরিবারের ব্যযবহুল অতিথিপরায়ণতা দিয়ে প্রতিকার করা হত) সত্যকথনে তিনি কখনও পিছপা হননি। তাঁর নীরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু বলেছিলেন, "এটা কি আমার ভাইকে প্রত্যাখান করা হল না ?"

তাঁর কাছে প্রতিটি জাতির নিজস্ব মহত্ব আছে এবং সেই আলোতে সে আলোকিত হয়। তুর্ক ছাডা কোন ইয়োরোপ নেই, মাটির মানুষের বিকাশ ভিন্ন কোন মিশর নেই। আত্মমর্যদাপূর্ণভাবে বাধ্যতার গোপন রহস্য ইংলণ্ড বুঝেছে। জাপানের সঙ্গে একই নিঃশ্বাসে দেশপ্রেমের কথা বলা দেশপ্রেমকে অপবিত্র করা।

তাহলে বিবেকানন্দ তাঁর নিজের দেশের মানুষ সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী রেখে গেছেন ? কি জাতীয় তাৎপর্য নিয়ে তিনি গেরুয়া পোশাক পড়েছিলেন এবং চলে যাওয়ার সময় রেখে গেছেন ? তাহলে কি পতাকা-দণ্ডশীর্ষে সেই হবিদ্রাবর্ণ ছিন্নকন্থা তুলে ধরা এবং সেই পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি আমাদের কাজ ?

নিঃসন্দেহে। কারণ এই সেই মানুষ যিনি কখনও ব্যর্থতার কথা কল্পনা করেননি। এই সেই মানুষ যিনি শক্তি ছাড়া আর কিছুর কথা বলেননি। ভাবালুতা থেকে একেবারে মুক্ত, সকল কর্তৃত্বের একেবারে বিরোধী (এখনও কি কিছু ধর্মীয় মিথ্যা কলঙ্ক আমাদের কানে বাজছে না ? তার কিছু কিছু কি গর্বের সঞ্চয় বলে আমরা গ্রহণ করব না ?) শিক্ষক হিসাবে ছাড়া আর কোন বিদেশীকে দেখা দিতে তিনি অস্বীকৃত ছিলেন। তাঁকে খুব ভালভাবে জানতেন এমন একজন ইংরেজ বলেছিলেন, "স্বামীর মহান প্রতিভা তাঁর মর্যাদায়। এটা একেবারে রাজকীয়।" তিনি একথা বুঝেছিলেন যে প্রাচ্যকে

প্রতীচ্যের কাছে আসতেই হবে, তবে সেটা স্তাবক হিসাবে নয়, ভৃত্য হিসাবে নয়, শিক্ষক ও গুরু, এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব উচ্চ স্থানে উত্তীর্ণ হওয়ার পতাকাকে কথনও অবনত করেন নি। বিদ্রূপমিশ্রিত কৌতুকভরে তিনি বলতেন, "ইয়োরোপ ধর্মে আমাদেব নেতৃত্ব দিক!" একবার তিনি বলেন, "আমি প্রতিহিংসার কথা কথনও বলিনি।" "আমি সর্বদাই শক্তির কথা বলেছি। এই একবিন্দু বায়ুতাড়িত সমুদ্রবারিব ওপর আমরা কি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে পারি? কিন্তু মশার পক্ষে এটা একটা বিশাল ব্যাপার!"

তাঁর মতে, ভারতীয় কোন কিছুর জন্যই লজ্জিত হওয়ার কারণ নেই। বিদেশী, বর্বর বা স্থূল নকল-সংস্কৃতির কাছে কোন কিছু কি প্রতিভাত হয়? অস্বীকার না করে কোন কিছু ছোট না করে নির্দিষ্ট বিষয়টি প্রমাণের জন্য তাঁব বিপুল শক্তি মনোনিবেশ করল। তাঁর নিজস্ব যুক্তির ওপর দুর্ভাগা সমালোচককে আগু-পাছু করতে হল একবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। এক জাহাজে চলাকালে একজন ইংরেজ পুরাণ সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি অবজ্ঞাপূর্ণ প্রশ্ন করেছিল। তিনি কেমন করে সেই ভদ্রলোককে গুঁতো করেছিলেন সেকথা উপস্থিত কেউই বিস্মৃত হননি। তিনি খ্রীষ্টীয় উপদেশাবলীর সঙ্গে হিন্দু পুরাণের অনুকূল তুলনা করে এবং বেদ ও উপনিষদকে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেক উপরে স্থাপিত করে উত্তর দিয়েছিলেন। জাতীয় মর্যাদা রক্ষার নামে নির্মমভাবে যে কোন বন্ধুকেই তিনি-বলি দিতে পারতেন। এ রকম মনোভাব সব সময় সম্ভবত যুক্তিযুক্ত হয় না। প্রায়ই অস্বস্তিকর হয়। কিন্তু মহাপুরুষের কাছে এটা চমৎকার, সবাই এমনকি শত্রুরাও প্রশংসা করে। বিবেকানন্দের কাছে, আবার বলি ভারতীয় সবকিছুই চরমভাবে ও সমভাবে পবিত্র ছিল—"ঈশ্বর অভিমুখী সকল আত্মাকেই এই ভূমিতে আসতে হবে।" তাঁর ধর্মীয় চেতনা সস্নেহে একথা বলত। চিকাগোর সেই বিশাল বিশ্ববাজারে উপস্থিত যে কোন ভারতীয় তা ধনী বা দরিদ্র, উচ্চ বা নীচ, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি যাই হোক না কেন, যে কোন মুহূর্তে নিমন্ত্রণকর্তার বাড়িতে গিয়ে তিনি হাজির হবেন। অতিথিপরায়ণতা ও সেবা করতে হবে। তাঁর সবাই জানতেন যে এদের ন্যূনতম সহৃদয়তার ঘাটতি ঘটলেই তার উপস্থিতি শেষ হয়ে যাবে।

তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি দেখতেন যে আর একজন ধার্মিক তার বিষয়টি উপস্থাপনার অসুবিধায় পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি

বসে পড়ে তার জন্য বক্তৃতা লিখে দিতেন। সেই বন্ধুব বিশ্বাসের অনুগামীদের অনেক ভালভাবে তার কাহিনী ভালভাবে উপস্থিত কবে দিতেন।

তাঁর ইউরোপীয় শিষ্যদের হাত দিয়ে খাওয়া শেখানোর জন্য এবং হিন্দু জীবনের সাধারণ কাজগুলি সম্পাদনের জন্য অশেষ যত্ন নিতেন। "মনে রেখো, ভারতকে যদি মোটেই ভালবাস, তাহলে সে যেমন আছে তাকে সেইভাবেই ভালবাসতে হবে, তুমি তাকে যা বানাতে চাও সেই ভাবে নয়।" তিনি প্রায়ই বলতেন। এটাই ছিল তাঁর মহান পর্বতসদৃশ দৃঢ়তা। সম্ভবত এই একটি ঘটনাই তাকে যারা ভালবাসত সেই বিদেশীদের সাধাবণ ভারতীয় জনগণের সাধারণ জীবনের সেই সুপ্রাচীন কাব্যের সৌন্দর্য ও শক্তি দেখবার চোখ খুলে দেয়। তাঁর নিজের দিক থেকে, নতুন কোন উপস্থাপিত পথকে কোন সুবিধা দিয়ে অনুমোদনাত্মক প্রশংসা পাওয়ার কামনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। প্রত্যেক দেশের সর্বোত্তমটি তাঁকে দেওযার প্রস্তাব হযেছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু রীতিকে আঁকড়ে থেকেছেন, তাঁর সবলতার এত গর্ব ছিল যে পরিবর্তনেব কোন প্রযোজন মনে করেন নি। "রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করব।"—বলে ওঠেন মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে। সেই বহুকথিত কাহিনীটি বলা হল যে ধুতি চাদর পরে কাঠের চটি পায়ে চটর পটব শব্দ করতে করতে পণ্ডিত ভাইসরয়ের পরামর্শ সভায় এলেন, ভৎর্সিত হওয়ায় তিনি বললেন, "কিন্তু আপনারা আমাকে যদি না চান, তবে আমাকে আসতে বলেন কেন?"

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যরূপেই বিষয়গুলিতে ঔৎসুক্য। প্রশ্নটির গভীরতর তাৎপর্যটি আপনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা কি? কোন্ দিকে তার প্রবণতা? তার সারা জীবনটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মেব সাধারণ ভিত্তির অনুসন্ধান। দু পয়সার পোষ্টকার্ড, সস্তা ভ্রমণ এবং নানা বিষয়ে একটি সাধারণ ভাষা জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে এই ধারণা তাঁর গভীর বিচারবুদ্ধিতে খুবই ছেলে-মানুষী ও ভাসা-ভাসা। যদি ভারত ইতিমধ্যেই একটা গভীর সাংগঠনিক ঐক্য পেয়ে থাকে তখনই এগুলি প্রাচীন ভারতকে সেবা করতে পাবে এবং সহজেই প্রকাশ্যরূপে পরিণত হতে পারে। এ ধরণেই ঐক্য আছে কি নেই? প্রায় আট বছরের মত সময় ধরে দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন, প্রতিটি গ্রামে নাম পরিবর্তন করেছেন, দেখা হওয়া প্রত্যেকের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন, গভীর ও সাধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখুঁত ও বিস্তৃত দৃষ্টি লাভ করেছেন। এই মহান সন্ধানলব্ধ নিশ্চয়তা তাঁকে ঘিরে থাকত। ধর্মীয় সভায় পশ্চিমের

সামনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রমাণ করলেন যে হিন্দুধর্ম একটি নিশ্চিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার সম্মিলন ঘটিয়েছে। এবং সেটা এত সম্পূর্ণ-তাসহ প্রমাণ করলেন, যে কোন ধর্মবিশ্বাসের মেধাগত আক্রমণের প্রতিরোধে পূর্ণভাবে সক্ষম।

কখনও তাঁর মনে হয়নি যে তাঁর আপন লোকেরা যে কোন জাতিই হোক না তার থেকে কোন অংশে কম নয়, সমান। ধর্ম তাদের জাতীয় প্রকাশ এ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন যে এক্ষেত্রে তারা যে শক্তি দেখাতে পারবে, খুব শীঘ্রই অন্য যে কোন প্রকার ধারণার যোগ্য শক্তিরূপ দ্বারা অনুসৃত হবে।

বর্ণ-ব্যবস্থাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার ফলে, তাঁর কথাবার্তা আশাতীত-ভাবে এর খুঁটিনাটি ও আপাত বিরোধে পূর্ণ ছিল। তাঁর আত্মনিমগ্নতার মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের চাবিকাঠি দেখতে পান। মুসলমানরা জাতির আর একটা বর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্টানরা আর একটা, পারসীরা আর একটা ইত্যাদি! একথা সত্য যে এগুলির সবই (শেষেরটির আংশিক ব্যতিক্রম সহ) বর্ণভেদে বিশ্বাসী না হলেও বর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু তারপর ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও একথা সত্য, এবং হিন্দুধর্মের অপবাপর গোষ্ঠী সম্পর্কেও। সবার পিছনেই এক দেশের বিশাল অভিন্ন ঘটনা দণ্ডায়মান, সুপ্রাচীন সভ্যতার এক সুন্দর প্রাচীন নিয়ম ; এবং সেই বিরাট প্রয়োজনগুলি যা শেষ পর্যন্ত সাধারণ প্রেম ও সাধারণ ঘৃণায় অবশ্যম্ভাবীরূপে নিয়ে যাবেই।

কিন্তু তিনি ভারতীয় জনগণের প্রতিটি গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর আশা ও আদর্শকেই জানেন নি, তাদের স্মৃতিগুলিও জেনেছেন। কলকাতায় হিন্দু এলাকায় একটি শিশু গঙ্গার পাশ দিয়ে বাস করতে গিয়ে যদি ফিরে আসে, তার উৎসাহ থেকে কেউ ভাববে সে জন্মে চলেছে এখন পাঞ্জাবে, আবার হিমালয়ে, তৃতীয় মুহূর্তে রাজপুতনায় বা অন্যত্র। তার ওষ্ঠে কখনও গুরু নানকের গান, কখনও মীরাবাঈ-এর বা তানসেনের। পৃথ্বীরাজ ও দিল্লীর কাহিনী গুতোগুতি করত চিতোর ও প্রতাপ সিং, শিব ও উমা, রাধা ও কৃষ্ণ, সীতারাম ও বুদ্ধের গল্পের বিরুদ্ধে। যখন তিনি অভিনয় করতেন, প্রতিটি নাটকই বিস্ময়কর বাস্তবতা নিয়ে বেঁচে উঠত। তাঁর সমগ্র হৃদয় ও আত্মা ছিল দেশের জ্বলন্ত মহাকাব্য, তার সেই নামের দুকুলপ্লাবী রহস্যময় আবেগ স্পর্শ করে থাকত।

বেলুড়ের নিভৃত আবাসে উপবিষ্ট বিবেকানন্দ সকল জায়গা থেকেই

দর্শনার্থী ও চিঠিপত্র পেতেন। বিশাল উপরিতল নীরব হতে পারে, কিন্তু ভারতের হৃদয়ের গভীবে স্বামী কখনও বিস্মৃত হতে পারে না। এক-আধজন ইচ্ছা করলে কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাঁর কর্ণে কথিত কোন আশা, তাঁর জানা কোন দুঃখ নেই, যা তিনি প্রশমিত বা জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন নি। এইরূপে, ধর্মীয় নেতার ক্ষেত্রে যেমন সর্বদাই হয়, যে ভারতকে তিনি দেখেছিলেন সেটি ছিল অন্য কোন চোখে দৃষ্ট ভারত থেকে পৃথক। তার কাবণ মৌলিক, আঙ্গিক ও পরম যা কিছু তার সূত্রগুলি তিনি ধরে রেখে-ছিলেন। জীবনের গোপন ঝরনা তাঁর জানা ছিল; কোটি কোটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে কোন কথাগুলি তা তিনি জানতেন। এবং এই সমস্ত জ্ঞান থেকে তিনি এক সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত আশায় উপনীত হয়েছিলেন।

অন্যরা যে সাংঘাতিক ভুল ইচ্ছা তাই করুক। তাঁর কাছে দেশ তরুণ, ভারতীয় ভাষাগুলি অগঠিত, নমনীয়, জাতীয় শক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতে। বেদনা ও কষ্টের মধ্যে আজ চেতনার যে নতুন পর্যায় শুরু হল সেটি হল দীর্ঘ বিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ। নিজের মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ। কখনও বিদেশে নয়। সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশের প্রয়োজনকেও জুড়ে থাকে, বিশ্বকে সর্বজনীন আশার বাণী শোনায়। কিন্তু তিনি কখনও সাহায্য চান নি, সহায়তা প্রার্থনা করেন নি। কখন কারও ওপর হেলেন নি। যাই করা হোক না কেন, এটা কর্তার কাজের সুযোগ, গ্রহীতার গ্রহণের কিছু নেই। বাইরে থেকে কোন ভয় বা আশা কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর সন্ন্যাসের অর্থ ছিল—ভারতের সার আত্মাকে পুনঃজাগ্রত করা, তাজা আত্মবিশ্বাস ও জীবন-শক্তিতে শক্তিশালী জাতীয় জীবনের মহাস্রোতকে সাগরের পথ খুঁজে নিতে ছেড়ে দেওয়া। তাঁর কাছে নিশ্চিতভাবেই সন্ন্যাস ছিল মহত্তর সেবা। তাঁর কাছে ভারত হিন্দুমতাবলম্বী, আর্য ও এশীয়। তাঁর যৌবন আধুনিক বিলাসিতা নিযে নিজস্ব পরীক্ষা চালাতে পারে? তার কি সে অধিকার নেই? তারা কি ফিরবে না? কিন্তু তার অন্তরের গভীর সত্তা নৈতিক, আত্ম-সংযমী ও আধ্যাত্মিক। গঙ্গাতীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে যে জনগণ তাকে বেশিদিন যান্ত্রিক শক্তির চমৎকারিত্বে বিভ্রান্ত করা যায় না।

বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করেছিলেন, এবং দু শতাব্দীব মধ্যে ভারত এক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। শিরা-উপশিরা দিয়ে তার মহান জীবনীশক্তিকে সে আব একবার অনুভব করুক এবং পৃথিবীব কোন শক্তিই নব-জাগ্রত শক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে পারবে না। অনুকরণ হয়, শুধু এটা তার নিজের জীবনে হতে হবে,

সে তার জীবন ফিরে পাবে। তার যথাযথ অতীত ও পরিবেশ থেকে সে উদ্দীপনা পাবে, বিদেশীদের কাছ থেকে নয়। নিজেকে যে দুর্বল ভাবে সেই দুর্বল ; যে নিজেকে শক্তিশালী ভাবে সে ইতিমধ্যেই অপরাজেয় হয়। জাতির ক্ষেত্রেও যা, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই। বিবেকানন্দের একটিই মাত্র কথা ছিল, অবিরত উচ্চারিত বার্তা।

দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ

সম্ভবত স্বামীর দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঘটনা যে এ দেশের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। ভারতের সকল ধর্মীয় নেতাদের মতই জাতি কি দিয়ে গঠিত সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি অনেক বেশি জটিল ও সামগ্রিক ছিল। সাধারণ মানুষের মন যা বুঝতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি। বৈদেশিক পদ্ধতি বা ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে তিনি কিছুই আশা করেন নি। ইয়োরোপীয়-দের তিনি মাঝে মাঝে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাদের এই জোরালো বিশ্বাস দিয়ে শাসন করতেন যে তাদের "কালো মানুষের অধীনে কাজ করতে হবে।"

স্বীয় গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই, শোনা যায় স্বদেশের জনগণকে ইউরোপীয় প্রভাব যা কিছু দিতে পারে তা তিনি আত্মীকরণ করেছিলেন। এই সময় থেকে তাঁর জীবন ক্রমেই বেশি বেশি করে জাতীয় আদর্শগুলিকে পুনরায় ধরবার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। অর্থনৈতিক সামাজিকতার ছাত্র তিনি ছিলেন না, তাঁর এশীয় সাধারণ বোধ এবং অন্তর্দৃষ্টির চমৎকার শক্তিগুলিই তাঁকে এ শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে পশ্চিমের বিশাল কৃষিভূমিকে এককহস্তে চাষ করবার জন্য প্রযুক্ত শ্রম বাঁচানোর যন্ত্রবিদ্যাকে এদেশের যে ছোট্ট খণ্ড মাঠে মেয়ে-পুরুষে কাজ করে সেখানে প্রয়োগ করলে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে। তাঁর স্বদেশের লোকের মধ্যে বিকশিত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ-যুক্তিযুক্ততা দেখতে অবশ্য তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন ; কিন্তু এটা বরং অবস্থার সঙ্গে পুনরায় থাপ খাইয়ে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে নতুন ও আরও সরাসরি চিন্তার অভ্যাসের উদ্দেশ্যযুক্ত ছিল। পশ্চিমের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মতই সম্ভবত তিনি বুঝতেন (কারণ তারাই বিদ্বান যারা জাতীয় ও অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলীর প্রকৃত তাৎপর্য বোঝে ! রাষ্ট্রনীতিবিদরা নিশ্চয়ই নয় !) যে বর্তমানে এশিয়ার সমস্যা হচ্ছে যে কোন মূল্যে তার প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার সামগ্রিক প্রশ্ন, এবং মোটেই দ্রুত-

উদ্ভাবনের প্রশ্ন নয়। তিনি রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না ; তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী।

তাঁর কাছে দেশটাই সুন্দর ছিল,—"সবুজ পৃথিবী, মা!" সকল মানের ভিতর দিয়ে চালিত শ্রম-সংগঠনে প্রস্ফুটিত আদর্শগুলি, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির, চিন্তার ও কর্মের ফলগুলি হল সম্পদের খনি। তাঁর বিরাট মন ও আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধাশীলতা স্থুল মানুষের পথ নির্দেশ ও আলোকিত করার জন্য আত্মীভূত চিন্তার নতুন সম্পদগুলি চিরকাল সংগ্রহ করতে পারে। শুধু ধর্ম নয়, শুধু দর্শন নয় বা শুধু ভাবতীয় সমাধি নয় যা এই মহান শিক্ষকের মধ্য দিয়ে কথিত হয়েছে। তিনি চিরন্তন সাক্ষী, জাতীয় প্রতিভার স্বীয় প্রবল স্রোতোধারার বন্যা নিয়ন্ত্রণের কপাটের মত ছিলেন তিনি। প্রতিরক্ষার—আক্রমণের নয়—কাজে তাঁর বিশাল মুষ্টিবদ্ধ শক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্ণব্যবস্থার বিরোধীরা কি কি বলতে পারে তার সবকিছু নিঃশেষে তিনি বুঝতেন। জীবিত যে কোন ব্যক্তির চেয়ে চমৎকারভাবে এর সপক্ষে তিনি বলতে পারতেন। কিন্তু একটা বিষয় তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ছিল যে এ ধরনের বিতর্ক উঠলে প্রয়োজন হচ্ছে সেই শক্তির যে তার নিজের প্রশ্নাবলী নিয়েও আলোচনা করবে এবং ইচ্ছামত স্বীয় নতুন বা পুরনো বর্ণব্যবস্থাকে ভাঙতে বা গড়তে পারবে।

তাঁর কাছে এ ওকালতি করা মূল্যহীন ছিল যে তাদের কল্যাণের প্রমাণ হচ্ছে তাদের জনগণের নৈতিকতা। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠবেন যে মৃতদেহের মত তারা কেউ নৈতিকতাপূর্ণ নয়! জীবন! আসুক সে শৃঙ্খলা বা বিশৃঙ্খলা, শক্তি, যদিও তার সঙ্গে আসতে পারে ঝড়ঝাপটা ও দুঃখ—ছোটখাটো সংস্কার নয় এগুলিই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের লক্ষ্য। নিজস্ব চালচিত্রণের পক্ষে উপযুক্ত জীবনই জাতির নিজের হতেই হবে। ভারতকে নিজেকে এশিয়াতেই খুঁজে পেতে হবে, "জার্মানীতে প্রস্তুত" নকল ও বাজে ইয়োরোপে নয়। ভবিষ্যৎ অতীতের মত হবে না, তবুও অতীতের প্রতি গভীর ও জীবন্ত শ্রদ্ধাশীলতার ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এজন্যই স্বামী জাতীয় চেতনার সারবস্তু আবিষ্কারের দিকে এত একরোখা-ভাবে, এত নাছোড়বান্দার মত লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। সেজন্যই কোন ক্ষুদ্রতম কাহিনী, ব্যক্তি বা রীতির কোন তুচ্ছ খুঁটিনাটিও তাঁর মেধার জালের বাইরে কখনও যেতে পারেনি। হিন্দুধর্মের অভিন্ন ভিত্তির জন্য তাঁর মহান অনুসন্ধানের অর্থ ছিল এটাই। শক্তিশালী অতীতের ওপর আরও বড় ভবিষ্যৎ

গড়ে উঠুক। প্রতিটি মানুষ ভীষ্ম অথবা যুধিষ্ঠির হোক এবং মহাভারত আবার বেঁচে উঠুক। তাঁর মহান ধ্বনি ছিল—"আমরা সম্মোহিত হয়ে রয়েছি! আমরা ভাবি আমরা দুর্বল এবং তাই আমাদের দুর্বল করে! আসুন আমরা ভাবি আমরা বলশালী এবং আমরা অপরাজেয় হই।" সেই ধ্বনির জাতীয় আধ্যাত্মিক অর্থ ছিল। তাঁর জনগণের ব্যর্থতা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি, ঠিক তেমনি অত্যুৎসাহী নির্বোধদের ভাসা-ভাসা সমালোচনাকে তিনি সহ্য করেছেন। তাঁর কাছে ভারত সর্বাংশে নবীন। তাঁর কাছে প্রাচীন সভ্যতার অর্থ যুগ যুগ ধরে অন্তঃশক্তির জন্মলাভ। তাঁর কাছে তাঁর জনগণের অদৃষ্ট তাদের নিজেদের মাটিতে এবং মাটির অদৃষ্ট নিজস্ব জনগণের কাছে কম নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ

আজ সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কথা বলতে যখন আসি, তখন আপনারা মনে রাখবেন যে আমি শিষ্যরূপে, তাঁর কন্যারূপে বলতে আসি। তাই একজন ঐতিহাসিক বা সাংবাদিকের কাছ থেকে আমার মহাগুরুর সমালোচনা-মূলক বিবরণ আশা করতে পারেন সেটি আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমার নিজস্ব আন্তরিক ও বিশ্বস্ত অভিজ্ঞতার কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি। তাঁর ছোটবেলার কাহিনী, অসংলগ্ন স্বপ্ন, শিবের প্রতি ভক্তি, তাঁর অদ্ভুত স্বর্গীয় খেয়ালীপনার জন্য তাঁর মায়ের তালাবদ্ধ করে রাখা এবং তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাহিনী বলা হয়েছে। সংস্কৃত শিক্ষা অনুগতভাবে ও উপকারের মনোভাব নিয়ে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাবলী পরিত্যাগের পথে চালিত করল এবং বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। তাঁর সত্যনিষ্ঠা অনাক্রম্য। তাঁর চমৎকার মেধার গুণাবলীর ফলে পনের বছর বয়সেই বেশ যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ শিক্ষা ও হৃদয় ও মনের বিকাশে সজ্জিত হয়ে উঠলেন এবং সেই বয়সেই সত্য অনুসন্ধানের জন্য বনে-জঙ্গলে হনুমানের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন। বার বার হনুমানকে না পেয়ে তিনি অশান্ত হয়ে উঠেছেন। তারপর সেই দিন এল, তখন তিনি নদীতীরবর্তী মহামন্দিরের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি একজনের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাঁর প্রশ্ন "তুমি কি ঈশ্বরকে দেখেছ?" এর উত্তর দিলেন এই বলে, "হ্যাঁ, পুত্র! আমি ঈশ্বর দেখেছি এবং কেমন করে তাকে দেখতে হয় সে শিক্ষাও তোমাকে আমি দেব।" তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। আমি জানি না বোম্বেতে তোমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে কত গভীরভাবে পরিচিত। আমি সেই বলতে পারলে, তিনি

ছিলেন আমার স্বীয় গুরুর স্বামী বিবেকানন্দের সর্বস্ব। প্রায় ষাট বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর আগে অর্থাৎ বর্তমান যুগের গোড়ার দিকে, কালীমন্দিরে পুরোহিত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে এসেছিলেন। উপনিষদ ও বেদেই তাঁর মুক্তির আদর্শ পাওয়া যাবে। ভগবদ্‌গীতার লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তির তত্ত্ব প্রথিত রয়েছে। তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেখানে ঘুমিয়েছেন, আল্লাহ্‌র নাম ধরে ডেকেছেন, মুসলমান খাদ্য খেয়েছেন এবং তাঁর মত ছিল যে আর্যজাতির যে কোন শিশুর মত একজন মুসলমানও স্বর্গীয় করুণা পাওয়ার যোগ্য। সমভাবে তিনি খ্রীষ্টের পদতলেও নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ভারতীয় খ্রীষ্টানে রূপান্তরিত হয়েছেন। খ্রীষ্টীয় জীবনের যা কিছু বাহ্যিক খুঁটিনাটি তার সঙ্গে নিজেকে যতখানি সম্ভব একাত্ম করেছেন। এবং দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছেন যে মা কালীর যত সত্য ও আলোকে পৌছনোর পক্ষে খ্রীষ্ট নিজেও একটা পথ। এই হচ্ছে সেই মানুষ যাঁর কাছে আমার গুরু আঠার বছর বয়সে এলেন। তখন মূর্তিপূজা, জেনানা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা এবং হিন্দু সভ্যতার ঘৃণ্য চরিত্র সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় আলোচনায় ভরপুর ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য সত্য উপলব্ধিতে তাকে সাহায্য করল এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেধার যুদ্ধে তাঁকে সক্ষম করে তুলল। দেশে দেশে ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমে এলেন এবং দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই গুরু ও বিজয়ীরূপে তাঁর ধর্মীয় চেতনাকে আক্রমণ করলেন। আমাদের কেউ কেউ বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে এই দুটি আত্মা আসলে এক মহান আত্মা। ভারতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ ও নবায়নের জন্য দুটি আত্মায় প্রকাশিত।

আপনাদের প্রাচ্য জীবনের ঐক্যের ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রাচ্যের জীবন আমাকে পূর্ণতম চেতনা দেয়। আর একটা দেশে জন্মেছিলাম বলে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। প্রাচ্য-জীবনের ঐক্য সম্পর্কে আমার যতটা নিজস্ব প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে, ঐক্যের প্রবল শক্তিতে কোনভাবেই ভারতের ঘাটতি নেই। এই জগতের যে জাতির লোকই হোক না কেন তার চেয়ে কোনভাবেই নীচু নয়। জগতের মহানদের মধ্যে মহত্তম। অন্যান্য জাতির দ্বিগুণ শক্তি তার আছে। অন্য জাতির কল্যাণের জন্যই খুবই উচ্চতম পর্যায়ে সে অনুশীলন করে। অপর জাতিগুলির অকল্যাণের জন্য নয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, তার পিছনে বার বা পনের জন মানুষ যদি না থাকত, তার শক্তিশালী ও বিপুল প্রতিভা নিয়েও স্বামী বিবেকানন্দ কতখানি



লোকনাথ বাবা



শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সম্পাদন করতে পারতেন? তাঁর পিছনের মানুষদের একটানা সহযোগিতা ভিন্ন কতখানি কাজ করা সম্ভব হত? এটি বিস্ময়কর বস্তু, অনন্ত ভারতীয় চেতনা। সমগ্র বিশ্বের সেবায়, সমগ্র জগতের পুনরুদ্ধারের জন্য এই দুই সন্ন্যাসী তাঁদের জীবন নিবেদিত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়—তার মধ্যে থাকবে গবেষণার যন্ত্রপাতি জড়ো করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন। সংস্কৃত অধ্যয়নের ফলেই শাস্ত্রসমূহের চাবিকাঠি তিনি পেলেন। যিনি স্বয়ং মুক্তির গভীরতা ধ্বনিত করেছেন, সেই মানুষের হাতে চাবিকাঠি এল। এটা অবশ্য ঠিকই যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখাশোনার পরই স্বামী দেশভ্রমণে বেরোন এবং কখনও বাস করেছেন ধাঙড়দের সঙ্গে, কখনও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে; এবং এই আছেন শৈবদের সঙ্গে, আবার এই আছেন বৈষ্ণবদের সঙ্গে। তখনই তিনি তাঁর নিজস্ব মহা-উপলব্ধি সম্পূর্ণ করলেন। এই কারণেই, আমি মনে করি যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্যক্তিগত অচেতন জীবন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে রেখে দেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ একেবারে চিরকালের মত সেই সরাসরি ও বজ্রসদৃশ স্পর্শের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন। শক্তি ধর্ম এবং শুধুমাত্র মুক্তি নয়। আপনাদের মনে থাকবে যে মাদ্রাজে ১৮৯৭ সালে ফিরে এসে স্বামী নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে 'বেদান্ত' শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থ দিতে হবে। সূত্রবদ্ধ দর্শন হিসেবে যখন আমরা গ্রহণ করি তখন 'বেদান্ত' শব্দটির আমরা হোঁচট খাই এবং আমাদের শব্দটির ধারণা খুবই অগভীর হয়। তার সে অর্থ থাকতেই পারে না। আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন যে মহান শঙ্করাচার্য সেই অর্থে শব্দটিকে বুঝতেন? এক অর্থে 'বেদান্ত' ধর্মের হাজারো ভিন্নরূপসহ জাতীয় জীবনের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়, কারণ এতে এক ধর্মের প্রতি আর এক ধর্মের মনোভঙ্গী প্রকাশ পায়। এবং সেই মনোভঙ্গীটি কি? সেটা কোন ধর্মই একে অপরের প্রতি ধ্বংসমূলক নয়। ধর্মীয় প্রতিভায় পূর্ণ হচ্ছে বেদান্তদর্শন। ধর্মশিক্ষার জন্য কিণ্ডারগার্টেন ক্লাশের মত। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এখন ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের মহান ধারণাগুলি উপলব্ধ হচ্ছে। তাঁর স্বীয় ব্যক্তিগত চরিত্রের শক্তিতে ও তাঁর স্বীয় ব্যক্তিত্বে হিন্দুধর্মের গভীর অর্থের ছাপ ফেলেছিলেন আমাদের ওপর। সত্যধর্মের আমাদের ধারণার সমগ্র অসুবিধাগুলির সমাধান হিসাবে এটা আমাদের মনে আঘাত করেছিল—সত্যধর্ম ছিল জীবনের নিজস্ব অধিচেতনা। হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে এই সেই তত্ত্ব যাকে তিনি নিজের বলে

তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু আমরা মহাসূত্রে উপনীত হয়েছি। প্রমাণসহ স্বয়ং জীবনের এই মহা ধারণাতে উপনীত হয়েছি। প্রমাণটা একক ব্যক্তিত্বের নয়, একক গুরুর প্রমাণ নয়, কিন্তু প্রমাণ রয়েছে সেইসব মানুষদের জীবন ও সাহিত্যে যারা তিন হাজার বছর আগে বাস করত।

পশ্চিমে স্বামী অনেক বড় কাজ করেছেন। বর্ণ, জাতি, বিশ্বাস, ইতিহাস, বা ঐতিহ্য নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঘুরে ঘুরেও তিনি এ কাজ করেছিলেন। তার কষ্টের মধ্যে, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে এবং তাদের সুখের মধ্যে, এখানে সেখানে গিয়ে, হিমালয়ের তুষারে বা পশ্চিমের কোন কোন জায়গায় বরফ জমায়, ক্ষুধার্ত হয়ে বা কোন কিছু গ্রাহ্য না করে সেই কাজ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জীবনচেতনাই জাতীয় ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র। আমরা মনে করি যে এদেশে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা নেই, এদেশের পক্ষে আরও বড় পরিণতিযুক্ত সামাজিক সমস্যা নেই, এদেশের পক্ষে আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সমস্যা নেই যা সেই বিরাট সমস্যা নামত, "কেমন করে ভারত ভারত থাকবে ?" এর চেয়ে বড়'। ওটা একটা বিরাট সমস্যা। জবাবটা হচ্ছে, "জাতীয় চেতনা দিয়ে। " আমি বলি না "জাতীয় অস্তিত্ব", কারণ জাতীয় চেতনা অটুট থাকে। সে মরে না। আমি আপনাদের এই নীতি গ্রহণ করতে বলি, এবং বলি নিজেব নিজের প্রতি সত্য হও, কারণ সত্য হচ্ছে শক্তিশালী সম্পদ বা তুমি ধরে রাখ এবং তোমার নিজস্ব উপকারের জন্য ধরে রাখ না, কিন্তু বিশ্বের দুঃখী মানবতার উপকারের জন্য ধরে রাখ।

পশ্চিমের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত

কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় ধারণার ইতিহাসের জট ছাড়ানোর চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বার্ষিক ধর্মীয় শোকানুষ্ঠানের উৎপত্তিও সম্ভবত নির্ণয় করা যেতে পারে অ্যাডনিস নদীর তীরে, নিহত ঈশ্বরের রক্তে লাল জলের ওপরে ফোনেসীয়দের বার্ষিক ক্রন্দনের মধ্যে। তথাপি সামান্য কয়েকটি ঘটনা কম-বেশি সুস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় ভাষার মত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ধর্মের ধারণাগুলি জন্মলাভ করে। অস্পষ্টভাবে মনে হয় যেন এগুলি কম-বেশি ধর্ম ও জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে যমুনা আদর্শসমূহের মহাবন্দনের গৃহ বলে প্রতিভাত হয়। উত্তরের আর একটি গঙ্গা। ইতিহাসের রাজনৈতিক ও জাতিগত আন্দোলনগুলি এ ধরনের ব্যবস্থার মিলন ঘটায় সময়। তারা মেলে, ঐক্যবদ্ধ হয় সম্ভবত ভেঙে

আবার নানাদিকে অন্তধারা ধরে ছড়িয়ে পড়ে, মেরুদেশীয় বরফের মত। এইভাবেই বিশ্বের বিশিষ্ট ধর্মগুলি জন্মলাভ করেছে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় ধর্মের জন্মকাহিনী খুবই আগ্রহোদ্দীপক। রোম সাম্রাজ্য বলে পরিচিত, পূর্ব ও পশ্চিমের জাতিসমূহের বিশেষ সংহতি সাধনের ফল হিসাবেই পশ্চিমের এই ধর্মের উৎপত্তি। স্থানীয় পুরাকাহিনীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতার মানুষের বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়ে এসব জাতিসমূহের ও পুরাকাহিনীর মিলন সর্বদা ঘটে থাকে। এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম, অন্ততঃ প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয় ধর্ম, সম্প্রতি এই অভিঘাত ভোগ করেছে। খুঁটিনাটিসহ মথুরার প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আমরা সর্বপ্রথম যখন জানি, তখন ভারতের বেথেলহেমের কাহিনীর আক্ষরিক সম্পূর্ণতায় এই প্রাচীন বিশ্বাসকে ধরে রাখা অসম্ভব। অধিকন্তু, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ইউ-রোপের মেধার সামনে দ্বৈতবাদের সমস্যা হাজির করেছে। এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ইয়োরোপ কল্যাণ ও অকল্যাণের শেষ-উদ্ভূত জাতি সংক্রান্ত ধারণার ছায়ায় বাস করছে। এজন্য নয় সে বেছে নিয়েছে, কারণ হচ্ছে এ তা থেকে নিজেকে এখনও ফাঁকি দিয়ে মুক্ত করে নিতে পারে নি। সামগ্রিকভাবে বিশ্বের আধু-নিক আবিষ্কারের ওপর ধর্মীয় অবস্থাবলীর এ ধরনের পরিণতি হয়। যেই ইংরেজীভাষী দেশসমূহের বৃত্তের মধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে বিশুদ্ধ আর্য-চিন্তার পরিমণ্ডলে আর্য মেধাকে নিয়ে আসা হল অমনি পশ্চিমের চিন্তার জগতে এ অবস্থা ঘটল। এই অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্যের ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে পশ্চিমে তার ঐতিহাসিক উক্তিগুলি করেন। স্বীয় গুরু কপিলের শিক্ষার শক্তি ও তেজ পরীক্ষার জন্য তরুণ বুদ্ধের নাগা ভূমিতে তীর্থযাত্রার মত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিক্ষার শক্তি ও তেজ পরীক্ষার জন্য মহাজীবনের গভীরে বেরিয়ে পড়লেন। সমগ্র ভারতের পর্যটনের ফলে সেই জীবন কিন্তু আরও বড় ও গভীর হয়েছে। "হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণাগুলি"র বিষয়ে বলবার জন্যই পশ্চিমের সংস্কৃতির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তার মাধ্যমে কুড়ি কোটির বেশী লোক সরব হয়ে উঠল। একটা সমগ্র জাতি, একটা সমগ্র বিবর্তন তাদের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াল। চার বছর ধরে পশ্চিমে তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে দুটি ধারণা বিশেষ সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল। সংহত ধর্মের ভবিষ্যৎ বিবর্তনে আধিপত্যকারী উপাদান হিসাবে তিনিই প্রামাণিকভাবে সর্বপ্রথম কথাগুলি বলেন। একটা হচ্ছে সেই প্রিয় কথা, যার মধ্যে তিনি অবিরত রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনের সারসংক্ষেপ করেন। গৃহীত অর্থে কোন ধর্ম সত্য একথা যে বিশ্ব স্বীকার করে না সেই বিশ্বকে তিনি প্রত্যয়ের

সঙ্গে বললেন যে আরও উচ্চ ও আরও সত্য অর্থে সব ধর্মই সত্য। "মানুষ সত্য থেকে সত্যে যায়, মিথ্যা থেকে সত্যে নয়।" আর একটা হচ্ছে ঐক্যের তত্ত্ব, সেই তত্ত্ব পরিণতি লাভ করে অদ্বৈতদর্শনে. "কল্যাণ ও অকল্যাণের পিছনে যে আনন্দ ও বেদনার পিছনে যে আকার ও নিরাকারের পিছনে যে এক তুমিই সেই। তুমিই সেই। ও আমার আত্মা।"

এখানে বিশ্ব-কণ্ঠ যে কথা বলেছে আমরা তা থেকে কিছুতেই পেছিয়ে যাব না। এ বিষয়ে আমাদের যা শিখতে হবে তা হল আমাদের কালের চেয়ে বড় করে চিন্তা করতে, যার অধীনে আমরা আজ সমবেত হয়েছি তার উপস্থিতিকে যথেষ্ট বড় করে চিন্তা করতে হবে। বিশ্বকে সাময়িকভাবে মানব-চেতনা কর্তৃক আবিষ্কারে যুগে, আমাদের নিজের চোখে এমন একজনকে দেখেছি, এমন একজনের কথা নিজের কানে শুনেছি, এমন একজন যার কণ্ঠ শতাব্দীগুলি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এমন এক জন যাকে পাওয়া যাবে আরও স্পষ্টতা ও আলো আনায়, সংখ্যায় পরাজিত আত্মা আনার, এমন একজন যার পাদস্পর্শ করার জন্য যারা জন্মেনি, অন্যদেশের যারা দেখেনি অবর্ণনীয়ভাবে কামনা করবে এবং বৃথাই কামনা করবে।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ব্রহ্মচারী পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসতের চৌরাশি চাকলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলা দেবী। রামনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের চার পুত্র ছিল। লোকনাথ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। লোকনাথের পিতার ইচ্ছে ছিল পুত্রদের মধ্যে যে কোন একজন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবে। কিন্তু স্নেহে অন্ধ জননী নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন না প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সন্তান অবধি। কিন্তু চতুর্থ পুত্র (১১৩৮ মতান্তরে ১১৩১ সনে) ভূমিষ্ঠ হবার পরই ঘোষাল মহাশয় শান্ত, স্থির, গম্ভীর মূর্ত্তি নিয়ে স্বয়ং বাসুদেবের ন্যায় প্রসূতি দ্বারে দাঁড়ালেন। কমলাদেবীও দেবকীর মতো গীতার মহামন্ত্র "ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" সফল করবার জন্য গোপালকে দিলেন বাসুদেবের হাতে। এই চতুর্থ সন্তানই "লোকনাথ"।

লোকনাথের পিতার ইচ্ছানুসারে ভগবান গাঙ্গুলী নামে সর্বশাস্ত্র পারদর্শী এক মহাজ্ঞানী পণ্ডিত লোকনাথের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁকে নিয়ে বনবাসে বহির্গত হন। ঐ সময় বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামে লোকনাথের সমবয়স্ক ব্যক্তি তাঁদের সহগামী হন। ভগবান তাঁদের নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী করবার জন্য নক্তব্রত, একান্তরা, দ্বাদশাহ, মাসাহ প্রভৃতি কঠিন ব্রহ্মচর্য ব্রত অভ্যাস করাতে লাগলেন। লোকনাথের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের পর ভগবান দ্বাদশ বর্ষ লোকনাথকে তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়ে নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনলেন। সেখানে ছয় মাস অতিবাহিত করার পর লোকনাথ গুরুদেবের সাথে তুষারাবৃত হিমালয়ে কঠোর তপস্যার জন্য গমন করেন। সেখানে বহু বছর কঠোর যোগ সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ৯০ বৎসর এবং গুরুদেবের বয়স ১৫০ বৎসর। গুরু ভগবানের লীলা সম্বরণের পর লোকনাথ আরব দেশে গমন করেন। সেখানে মুসলমানরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতো। তাঁরা যে আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে দিত লোকনাথ তাই গ্রহণ করতেন। তারপর তিনি সুমেরু পর্ব্বত দর্শন মানসে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। বহু দিন উলঙ্গ অবস্থায় সেখানে তপস্যা করার ফলে তাঁর শরীর শ্বেতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

লোকনাথের আজানুলম্বিত বাহু, ভাস্করসদৃশ প্রদীপ্ত নয়নযুগল, শ্বেতবর্ণ সুদীর্ঘ দেহ, শ্বেত রক্তে আচ্ছাদিত জটাজাল, দেহের অলৌকিক জ্যোতিঃ রাশি দেখে সকলেই তাকে অপার্থিব প্রাণী বলে মনে করতেন। এই সময় দৈব প্রভায় লোকনাথের দেহ দেবময় হয়ে গিয়েছিল। বারদীতে যারা প্রথম লোকনাথ বাবাকে দর্শন করেছেন তারা এই অপরূপ দেহকান্তি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তারপর লোকনাথ পূর্ববঙ্গের চন্দ্রশেখর পর্বতে আসেন এবং সেখান থেকে ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি গ্রামে আসেন।

ঐ সময় নারায়ণগঞ্জের অধীন বারদী গ্রাম নিবাসী ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তি একদিন এক বৃক্ষের নীচে ধ্যানরত অবস্থায় এক উলঙ্গ মহাপুরুষকে দেখেন। তার ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপুরুষের কৃপাপ্রার্থী হন এবং লোকনাথ তাকে আশ্বাস দেন। ডেঙ্গু কর্মকার ঐ মামলায় অব্যাহতি লাভ করার পর লোকনাথ বাবার চরণতলে পতিত হন এবং তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করেন। ডেঙ্গু কর্মকারই তাঁকে বারদীতে নিয়ে আসেন। বাবা লোকনাথ এই বারদীতেই ২৬/২৭ বৎসর অবস্থান করেন। বারদীতে আসার পরই তাঁর মহিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকনাথ বাবা "বারদীর গোঁসাই" নামে আখ্যাত হন। বারদী অবস্থানকালে লোকনাথ বাবা বলতেন, "আমি শতাধিক বৎসর পাহাড় পর্বত পরিভ্রমণ করে একটা ধন কামাই করেছি। এই শরীরের উপর কত বরফ জল হয়ে গিয়েছে। তোরা বসে খাবি।" লোকনাথ বহু বৎসর কঠোর সাধনার ফলে ভগবানের দর্শন লাভ করেছিলেন। তাঁর এই সাধনা যে জগতের মঙ্গল নামক মহাব্রত উদ্‌যাপনের উপকরণ সংগ্রহের জন্যই—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভক্তদের প্রতি তাঁর সন্তানবাৎসল্য, করুণা ও প্রেম জগতে অতুলনীয়। লোকনাথের বাহ্যমূর্ত্তির কঠোরতা ভেদ করে যে ভক্ত তাঁর অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, তিনিই তাঁর অন্তরে প্রবাহিত করুণা ও প্রেমের পবিত্র ধারায় অমৃতের স্বাদ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।

লোকনাথ বাবার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরনাথ গোস্বামী, শ্রীমদ্ পূর্ণানন্দ স্বামী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীঅভয়াচরণ ব্রহ্মচারী। বাবা লোকনাথ কমলা নামে এক বৃদ্ধ গোপতনয়াকে মাতৃ সম্বোধন করেন। ইনিই গোয়ালিনী মা। কথিত আছে এই গোয়ালিনী মাই লোকনাথ বাবার পূর্বজন্মের মা [illegible]

দেবী। তাঁর অপার করুণা ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, হিন্দু মুসলমান জাত নির্বিশেষে সব ধর্মের লোককেই পবিত্র করেছে। লোকনাথ শুধু জগতের ধর্মগুরু নন, তিনি ব্যষ্টিতের গুরু, সমাজের গুরু। শুধু মানুষই নন, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী নির্বিশেষে সর্বজাতীয় জীবকে তাঁর করুণাধারা সমভাবে কৃতার্থ করেছে।' তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন ধনের অভাব ছিল না।

লোকনাথ কর্ম, জ্ঞান ও যোগের অতীত ছিলেন। তিনি লোকশিক্ষার জন্ত কর্মানুষ্ঠান করতেন। লোকনাথ ভক্তদের বলতেন—"আমার ইহা উপদেশের স্থল নহে, আদেশের স্থল।" বারদীর এক জমিদার কফ রোগে মৃত্যু শয্যায় পতিত হলে তিনি তার রোগ নিজ দেহে ধারণ করেন এবং সেই মৃত্যুজনক কফ রোগ ব্রহ্মচারী বাবার শরীরে অবস্থান করলে দিন দিন তাঁর শরীর শিথিলতাপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থা দেখে ব্রহ্মচারী বাবা পিণ্ডপাতের দিন ধার্য করেন। ১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যেষ্ঠ তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্বে লোকনাথ বাবা ভক্তদের বলেন—"আমার দেহত্যাগ যদি উত্তরায়নে দিবাভাগে হয় এবং সূর্য উজ্জল কিরণদান করিতে থাকেন তবে বুঝিবে আমি সূর্যের রশ্মি ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছি।" এই বাক্য দ্বারা লোকনাথ ব্রহ্মলোকে গমনের ইঙ্গিত করেন।

বাবা লোকনাথের অলৌকিক শক্তির নানা কাহিনী আছে। একবার লোকনাথ ব্রহ্মচারী চন্দ্রশেখর পর্বতে অবস্থানকালে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ভ্রমণ উপলক্ষে ঐ পর্বতেরই অন্ত এক স্থানে উপস্থিত হন। হঠাৎ একদিন তিনি দেখেন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিহ্বল হয়ে মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। গোস্বামী মহাশয়ও পালাবার পথ না পেয়ে সেখানে বসেই ঈশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন। এমন সময় এক মহাশক্তিধর পুরুষ সেখানে উপস্থিত হয়ে শিশুর ন্যায় তাঁকে বক্ষে ধারণ ক'রে অনায়াসে অগ্নিব্যূহ ভেদ করে নিরাপদ স্থানে রেখে অদৃশ্য হলেন। কিছু দিন পর গোস্বামী মহাশয় বারদীতে গিয়ে লোকনাথকে দর্শন করেন। তখন লোকনাথ তাঁকে চন্দ্রশেখর পর্বতের দাবানলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তখন গোস্বামী মহাশয় বুঝতে পারেন যে এই মহাপুরুষই তাঁকে অগ্নিব্যূহ থেকে রক্ষা করেছেন।

ঢাকার মথুরামোহন চক্রবর্তী এক কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। লোকনাথের কৃপায় তিনি সেই রোগ থেকে মুক্ত হন। লোকনাথের কৃপায় তিনি আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং ঢাকার স্বামীবাগে তিনি

লোকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমপুর মধ্যম পাড়া নিবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ব্রহ্মচারী বাবার ঘরের বারান্দায় একবার হত্যা দিয়েছিলেন। আট রাত্রি কাটবার পর নবম দিবসে ব্রহ্মচারীবাবা ভক্তদের ডেকে বললেন তাকে দুধ মিশ্রি দিতে। দুধ মিশ্রি খাওয়ার পর তিনি এক অলৌকিক শক্তি লাভ করেছিলেন। বাবার ভক্ত হয়ে তিনি অনেক দুরারোগ্য খঞ্জ, আতুর ব্যক্তিকে বাবার ধুনি নিক্ষেপ ক'রে ভালো করেছেন। সংসারে শুধু মাত্র মানুষ নয়, জীবজন্তু, পশুপক্ষী সবার প্রতি ব্রহ্মচারী বাবার অসীম করুণা ছিল। কালাচাঁদ নামে ষাঁড়, আদরী নামে বিড়াল তাঁর কাছে প্রতিপালিত হোত। সর্পরা প্রতিদিন এসে তাঁর কাছে দুধ ভক্ষণ ক'রে যেত। বাঘিনী নির্বিঘ্নে তার বাচ্চাদের বাবার আশ্রয়ে রেখে শিকারে যেত।

সমাজ সম্প্রদায় জাতি অবস্থা নির্বিশেষে সবার প্রতি লোকনাথের করুণা ক্রীড়া করেছে। করুণার অবতার লোকনাথ কখনো পাপীকে ঘৃণা করতেন না। একবার এক ব্যক্তি লোকনাথের কৃপা প্রার্থী হন। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করতো। লোকনাথ তাকে বলেন যে আগে স্ত্রীকে ভালবাসতে, তাহলেই সে ঈশ্বরের করুণা পাবে। যে ব্যক্তি পরিবারের সবাইকে ভালোবাসতে পারে না সেও ঈশ্বরকে কখনো ভালোবাসতে পারে না। সেই ব্যক্তি কখনো মহাপুরুষের কৃপা লাভ করতে পারে না। একবার ঢাকা থেকে কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক লোকনাথবাবাকে দর্শনের জন্য বারদী আসেন। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ফেরবার পথে প্রখর রৌদ্র-কিরণে তারা ভীত হয়ে পড়েন। লোকনাথবাবা তাঁদের আশ্বাস দেন যে রৌদ্র কিরণ তাদের শরীরে লাগবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তারা যতক্ষণ পথ চলতে লাগলো ততক্ষণ একখণ্ড মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদন ক'রে তাদের সাথে সাথে চলতে লাগলো।

যখনই জীবের মঙ্গল কামনা তাঁর অন্তরে জাগতো তিনি বিভূতি সমূহের কিঙ্করের ন্যায় সকলের সমস্ত কামনা পূর্ণ করে দিতেন। এক ব্যক্তি খুনের মামলার আসামী হয়ে ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। জেলে অবস্থান কালে সে শুধু লোকনাথের নাম স্মরণ করতে থাকে। তখনো বাবা লোকনাথকে সে চাক্ষুস করেনি। শুধুমাত্র লোকমুখে বাবার কথা শুনে তার ভক্তি জন্মায়। একদিন সে দেখতে পায় এক জটাজুটধারী দীর্ঘকায় মহাপুরুষ কারাগারের বন্ধ দরজায় লোহার শিকলের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে তাকে বলছেন যে তিনি তার মকদ্দমার রায় লিখে দিয়ে এসেছেন। সে অবিলম্বে মুক্তি

পাবে। এই ঘটনার কয়েক দিন পরই ঐ ব্যক্তির মুক্তির চিঠি আসলো। মুক্তি পাওয়ার পর ঐ ব্যক্তি বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথের তৈলচিত্র দর্শন ক'রে বলে যে ঐ মহাপুরুষই কারাগারে তাকে দর্শন দিয়েছেন। বিপদে পড়ে যে তাঁর স্মরণ নেয়, সেই তাঁর কৃপা লাভ করে।

লোকনাথ বাবার অসীম কৃপায় বারদীর নাগবংশীয়রা ধন্য হয়েছিলেন। নাগবংশীয় জমিদারদের মধ্যে কিছু জমিদার অতিশয় অত্যাচারী ছিলেন। মহাপুরুষের অসীম শক্তির কাছে তাদের শক্তি যে কত অকিঞ্চিৎকর ক্রমে ক্রমে তারা বুঝতে পারেন। অবশেষে নিজেদের আত্মাভিমান ত্যাগ ক'রে মহাপুরুষের চরণতলে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। বাবা লোকনাথের আগমনে বারদী তীর্থধামে পরিণত হলো। একবার গোয়ালিনী মার এক আত্মীয় কালীঘাটের কালীর নামে মানস করে ফল পেয়েছিল। লোকের অভাবে সে ঐ টাকা কলকাতায় কালীঘাটে মায়ের নামে পাঠাতে পারছিল না। লোকনাথ বাবা সব শুনে গোয়ালিনী মাকে ডেকে বললেন—"ঐ টাকা ও দ্রব্যাদি আমার নিকট দিলেই চলিবে, কলিকাতা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আমিই কালীঘাটের কালী।" গোয়ালিনী মা যখন মানসের দ্রব্যাদি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন তখনি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে, লোকনাথ বাবা তাঁর আসনে করাল বদনা ভীষণ কালীমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন।

বাবা লোকনাথের শরীরে মাংস ছিল না বললেই হয়। কিন্তু তাঁর চর্মাবৃত অস্থিরাশি অপরূপ প্রভাদীপ্ত ও নবনীত স্নিগ্ধ ছিল। সর্বাপেক্ষা তাঁর অলৌকিকত্ব প্রকাশিত ছিল তাঁর অপার্থিব দৃষ্টিতে। হীরকখণ্ডের দীপ্তি তাঁর সেই দৃষ্টিতে। লোকনাথের নয়নযুগলে পলক ছিল না, দৃষ্টি সর্বদা স্থির ও অবিকৃত থাকতো। লোকনাথের সম্মুখে শতসহস্র লোক বসে থাকলেও মনে হতো বাবা সবারই দিকে তাকিয়ে আছেন। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা শারীরিক ধর্মগুলোকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেছিলেন। অগ্নিতে তাঁর দিব্যদেহ দগ্ধ হয়নি, বরফেও তাঁর শরীর বিকৃত হয়নি। শ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন—"ব্রহ্মচারী বাবা ইচ্ছা করিলে এখনই চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা অনন্তকাল দেহধারণ করিয়াও থাকিতে পারেন।" শুক্র ভগবান যোগী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ভক্তির অভাবেই তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। তাই তিনি লোকনাথকে ভক্তিমার্গে পরিচালিত করেছিলেন।

লোকনাথই ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি বলেছেন, "মানুষগুলি আমাকে মানুষ ভেবে ভেবে সব মাটি করলে।" যদিও লোকনাথ স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন তবুও দেহধারণের জন্য তাঁকে কতকগুলি কর্ম করতে হতো। লোকনাথ ব্রহ্মপদ লাভ করেও লোকশিক্ষার জন্য "আমিত্ব" রক্ষা করেছিলেন। লোকনাথ বলেছেন—"আমার এখন যা কিছু কর্ম দেখিতে পাও, তাহা সমস্তই জীবানু-কম্পাবশতঃ জগতের মঙ্গলের জন্য। কেহকে বকি, তাহাও তাহার মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠান করি। সুতরাং আমি যে কেহকে মারি, ইহাও তাহার ভাবী মঙ্গলের জন্য। কেহকে কোলে নেই তাহাও তাহার মঙ্গলের জন্য।" লোকনাথ বলতেন—"যে কারণে মোহ আসে, তাহা আমার জানা আছে, আসতে না দিলেই হয়।" তিনি মৃত্যুকেই মোহ বলতেন। সুতরাং মৃত্যু যে তাঁর ইচ্ছাধীন একথা স্পষ্টই বোঝা যায়।

লোকনাথের গুরুভক্তির কোন তুলনা নেই। তিনি নিজের সুখদুঃখের দৃষ্টিপাত না করে গুরু ভগবানের গুরুতত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি যখন দেখেন গুরুদেব তখনো অসিদ্ধ তখন তিনি পুত্ররূপে গুরু ভগবানের জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করে কর্ম ও ভক্তি মার্গে তাঁর সিদ্ধিলাভের অঙ্গীকার করলেন। গুরু ভগবানকে শিষ্যরূপে লাভ করা এবং তাঁর দীর্ঘকাল ব্যাপী সিদ্ধজীবনের সঞ্চিত মহারত্নরাশি অযাচিতরূপে বিতরণ করে জ্ঞান, যোগ, কর্ম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় জগতে শিক্ষা দেওয়াই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রী৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছেন— "লোকনাথের প্রতি রোমকূপে দেবতা, আমি তাঁহাকে ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধ মূর্তিতে দেখিয়াছি।"

লোকনাথ স্বয়ং পূর্ণ অবতার। গোস্বামী মহাশয়কে তিনি ত্রিবিধ মূর্তিতে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। তিনি বলেছেন—"আমি যদি ধরা না দেই, আমায় ধরে কার সাধ্য।" লোকনাথ মাঝে মাঝে বলতেন—"অন্ধ সমাজ, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধের ন্যায় চলিতেছে।" এর থেকে বোঝা যায় যে তিনি সমাজের জন্য কত চিন্তিত ছিলেন। অসৎ এবং সৎএর বিচার নেই—এই চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। অনেকে তাঁর কাছে সামাজিক সমস্যা মীমাংসার জন্য উপস্থিত হোতেন। তিনি তাঁর যথোচিত মীমাংসা করে দিতেন। একবার বারদী নিবাসী জনৈক বিধবা মহিলা দত্তক পুত্র গ্রহণে অভিলাষিনী হয়ে তার এক কর্মচারীকে ফর্দ ধরে দেওয়ার জন্য লোকনাথের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ঐ মহিলার পুরোহিত যে ফর্দ [illegible] তা দেখে লোকনাথ বলেছিলেন—"তোমরা এই প্রকারে

অত্যধিক বস্ত্রের ফর্দ দেওয়াতে যজমানগণ বাধ্য হইয়া ছোট ও অব্যবহার্য অল্প মূল্যের বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করে, ইহাতে তোমাদের লাভ না হইয়া বরং ক্ষতিই হয়, কারণ, ঐ সমস্ত বস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হয়। অতএব তোমার ফর্দের লিখিত পঁচিশখানা বস্ত্রের পরিবর্তে আমি তোমার বাড়ীর প্রত্যেকের ব্যবহার্য একখানা করিয়া ১২ খানা বস্ত্র ধরিয়া দিলাম।" এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে কত সামান্য বিষয়েও লোকনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল। একবার কলকাতা নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক বিবাহ না করে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়ার অভিপ্রায়ে বাবা লোকনাথের কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। বাবা লোকনাথ তাকে "বিবাহ করাই সঙ্গত" শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে বিবাহ করতে সম্মত করেছিলেন।

লোকনাথ প্রায়ই বলতেন,—"আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাই।" তিনি নিজে কর্ম ও ধর্মের অতীত হলেও জগতের শিক্ষার জন্য ধর্ম ও কর্ম করতেন। দয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম। এই দয়ার দৃষ্টান্ত সমাজে দেখাবার জন্য অনেক দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখী ব্যক্তিকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেছেন তিনি। গীতায় ভগবান বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তদ্রূপ করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, অন্য লোকেও তাহারই অনুবর্তন করে।" সমাজের সকল শ্রেণীব লোকই পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। সকলে সকলের সাহায্য পাবে বলেই একসাথে বাস করে। লোকনাথ তাঁর আচরণ দ্বারা এই সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। বারদী অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই লোকনাথকে ভক্তি করতো। কৃষক এবং যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে লোকনাথ সেই বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। বারদীর মুসলমানেরা বাবা লোকনাথের সম্মানার্থ ঐ অঞ্চলে গোহত্যা বর্জন করেছিল।

এক ভক্তের "প্রকৃত পুত্রের কর্তব্য" বাবা লোকনাথেব নিকট জানতে চাওয়ায় বাবা তাকে বলেন—"যে পুত্র পিতামাতার ইচ্ছা, কারণ না জিজ্ঞাসা করিয়া প্রতিপালন করে, সেই প্রকৃত পুত্রের কাজ করে। পিতামাতার মৃতবৎ অবস্থায় তাহারা যাহা খাইতে চায়, যে পুত্র তাহা যোগাড় করিয়া দেয়—সেই প্রকৃত পুত্র। গয়াসুরকে পিণ্ড না দিলে গয়াসুর ক্ষেপিয়া ওঠে, ইহাতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপাদ পদ্মের গয়াসুরকে থামাইবার শক্তি নাই, পিণ্ডের থামাইবার শক্তি আছে। বহুসংখ্যক গয়াসুর বিশিষ্ট লোককে যে পুত্র পিণ্ডদান করে, অর্থাৎ বহু ক্ষুধার্থ ব্যক্তিকে যে পুত্র খাওয়ায় সেই প্রকৃত পুত্র।" লোকনাথ

বলেছেন—যদি পিতৃপুরুষকে সন্তুষ্ট করতে চাও, তবে দরিদ্র দিগের দুঃখ দূর কর, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। লোকনাথের আশ্রমে কখনো কোন দুঃখী দরিদ্র বিমুখ হতো না।

মিরপুর গ্রামের বারদী স্কুলের পণ্ডিত একবার লোকনাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে বারদীর আশ্রমে গিয়েছিলেন। তিনি যখন লোকনাথের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন একটা কাক আশ্রমের বৃক্ষশাখায় বসে বিকৃত শব্দ করছিল। পণ্ডিত মহাশয় বিরক্ত হয়ে কাককে বারবার তাড়াতে গেলেন। তখন লোকনাথ তাকে বললেন—"কাকের শব্দ তোমার নিকট বিকৃত বোধ হইয়াছিল বলিয়া তুমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ, কিন্তু তোমার শব্দও তো আমার নিকট বিকৃত বোধ হয়।" সংসারে হয়তো অনেক অপ্রিয় জীবজন্তু, পশুপক্ষী আছে। কিন্তু কাউকেও তাড়িয়ে দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই। সৃষ্টির যে কোন বস্তুতে ঘৃণা করা বা অনাদর করা মহা পাপ।

বাবা লোকনাথ তাঁর এক ভক্তকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"ধার্মিক হইতে চাহিলে প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় প্রতিদিনের কর্মের হিসাব-নিকাশ করবি, অর্থাৎ ভালো কর্ম কি করিয়াছিস এবং মন্দ কর্ম কি করিয়াছিস, তাহা চিন্তা করিয়া মন্দ কর্ম আর না করিতে হয় সেইজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবি।" একবার ভাওয়ালের ভূতপূর্ব রাজা ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ফটোগ্রাফার নিয়ে বাবা লোকনাথের ফটো তুলতে আসেন। প্রথমে বাবা ফটো তুলতে অস্বীকৃত হন কিন্তু যখন তিনি শোনেন মহাপুরুষের মূর্তি সকলের গৃহে থাকলে মঙ্গল হবে এবং ফটোগ্রাফাররা ব্যবসা করে খেতে পারবে তখন তিনি ফটো তুলতে দিতে স্বীকৃত হন।

কোন কার্যে জগতের মঙ্গল হবে জানলে তিনি সেই কাজ করতে খুবই আনন্দ উপভোগ করতেন। কঠোর তপস্যার ফলে লোকনাথ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই ঐশ্বর্য্য লোকনাথের শরীরে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু কোন মানুষকে তিনি ঐ সমস্ত প্রদর্শন করেননি। বরং লোকাচারের আশ্রয় নিয়ে তিনি অনেক ধর্ম কর্ম লোক শিক্ষার্থ আচরণ করেছেন। হিমালয় পর্ব্বতে অনাবৃত শরীরে এবং নিরন্ন অবস্থায় বাস করেও তিনি বারদীতে এসে ব্রহ্মচর্যোপযোগী আহার করেছেন এবং সমাজের উপযোগী বস্ত্র ও বাসস্থান গ্রহণ করেছেন। মায়ার অতীত হয়েও তিনি জগতের মঙ্গলের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন।

একবার এক ব্যক্তির মনে সংশয় হয়েছিল যে, "গুরু দত্ত মন্ত্রে অশুদ্ধতা

রয়েছে।" তিনি লোকনাথের নিকট মীমাংসার জন্য গেলেন। বাবা লোকনাথ তাকে বললেন—"গুরু দত্ত মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা শিষ্যের কর্ম নহে। গুরু যাহা বলিয়াছেন কোন দ্বিধা না করিয়া তাহা জপ করিয়া যাওয়াই শিষ্যের কর্তব্য।"

লোকনাথ মহাপুরুষ ছিলেন। ভক্তগণের সঙ্গে আলাপ করবার সময়েও নয়ন সর্বদাই অন্তর্নিহিত ও সমাধি নিমগ্ন থাকতো। দেহটি অসার, নিস্পন্দ মনে হতো। নেত্র নিমীলিত থাকতো কিন্তু মনে হতো তিনি যেন কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। তিনি বারদী ছেড়ে কখনো কোথাও যেতেন না কিন্তু দূর দেশে বহু ভক্ত তাঁকে দর্শন করেছে। তাঁর কৃপা লাভ করেছে।

লোকনাথের সাধন ভজন কেউ কোন দিন দেখেনি। যা কিছু কর্ম করতেন সমস্তই লোক শিক্ষার জন্য। লোকনাথ ধ্যান, জ্ঞান, কর্মযোগ, ভক্তির চরম ফল লাভ করেছিলেন। তিনি জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান, ধ্যানার্থীকে ধ্যান, কর্মার্থীকে কর্ম এবং ভক্তজনকে ভক্তি উপদেশ দিয়েছেন। এই ধ্যান, জ্ঞান, কর্মযোগ ও ভক্তির সমন্বয়ে তিনি এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যেখানে ভগবান ও তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই লোকনাথ বলেছেন—"আমি নিত্য পদার্থ। আমার নাশ নাই, শ্রাদ্ধও নাই।"গীতা যোগের অনুমোদন ও উপদেশ করে ঈশ্বরে চিত্ত সংযোগকেই যোগের মুখ্য উপায় বলেছেন। গীতা মতে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করে তাঁকে উপাসনা করেন। গীতা চরম যোগের উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরে মন অর্পণ কর, ঈশ্বরকে যজন কর, ঈশ্বরকে ভজন কর, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ঈশ্বরকে সার কর; এইরূপে আত্মার যোগ করিলে ঈশ্বরে মিলিত হবে। গীতার মতে "যোগের ফল ভগবানের সঙ্গ লাভ। গীতা বলেছেন—সংযত চিত্ত যোগী ভগবানে স্থিতিরূপে মোক্ষ প্রধান শান্তি লাভ করেন, নিষ্পাপ যোগী আত্মাকে যোগ মুক্ত করে ব্রহ্ম সংস্পর্শ রূপ অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।"

যোগ দ্বারা সমাহিত চিত্ত এবং সর্ব বিষয়ে সমদর্শন ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী দেহাদি পরিচ্ছেদ শূন্য আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্বভূতকে আত্মাতে অভেদ স্বরূপ দর্শন করেন। যিনি আমাকে সর্বত্র অর্থাৎ ভূত মাত্রে দেখেন এবং আমাতে ভূত মাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না। যিনি সর্ব ভূতে বর্তমান আমাকে একত্বে আশ্রয় করে ভজনা করেন অর্থাৎ যিনি ভেদ জ্ঞান পরিশূন্য হয়ে 'আমি সর্বভূতে আছি', এইরূপ প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করেন, সেই যোগী যেভাবেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন,

যিনি জীবদ্দশায়ই মৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যোগী এর পর এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যার নাম চরম যোগফল। অর্থাৎ যার পর আর শ্রেষ্ঠ অবস্থা নেই। ঐ যোগীকে তখন চরম যোগী বলে।

সিদ্ধি যোগীগণের মধ্যে যিনি ভূতানুকম্পী অর্থাৎ সর্ব ভূতে করুণাশীল, যিনি সর্ব জীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সঙ্গে তুলনায় সমান দেখেন অর্থাৎ আমার যেমন সুখ প্রিয় ও দুঃখ অপ্রিয় অন্যেরও সেইরূপ, এই ভেবে সকলেরই সুখ ও মঙ্গল কামনা করেন, হে অর্জ্জুন, আমার মতে সেই পরম মহাযোগী বা যোগী শ্রেষ্ঠ। "তুমি যে আপনাকে জীবন্মুক্ত মনে কর, আমি যে তা দেখি না?"

লোকনাথ স্বয়ং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্বয়ং ভগবান, তাই প্রিয় পুত্রকে জীবন্মুক্তির উপদেশ দিয়েছেন। যাঁর দেহ ধারণ এবার শেষ হলো—তাঁকেই জীবন্মুক্ত বলে। যাঁর মানব বা দৈবই হোক, কোন রূপ দেহ ধারণের সম্ভাবনা থাকে, তিনি জীবন্মুক্ত নহেন। সুতরাং লোকনাথেরও এই শেষ দেহ ধারণ।

"আমি ব্রাহ্মণ হয়েছি কি না—পরীক্ষা করবার জন্য বাক্য দ্বারা ২৪টি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করেছি। এখন আর আমার সেই স্পৃহা নাই। তবে যদি কেহ ইচ্ছা করাইয়া নিতে পারে, সে এখনও আরোগ্য হয়। ক্ষুন্নিবারণের জন্য যেমন দেহের প্রয়োজনবোধ, মলমূত্র ত্যাগের জন্য দেহের যেমন প্রয়োজনবোধ সেই রূপ প্রয়োজনবোধ যার আমার জন্য থাকে, সে এখনও আমার ইচ্ছা করাইয়া নিতে পারে।" এই বাক্যের দ্বারা লোকনাথ জ্ঞানের চরম রূপই ব্রহ্ম এবং অপর দিকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়েছেন তিনি নিজেই ব্রহ্ম, জ্ঞানের প্রকৃত রূপ আবার যাঁকে না দর্শন করলে প্রাণ ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে—সেই অবস্থাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা।

লোকনাথ তাঁর এক ভক্তকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—"যদি এমন ভালবাসা তোমার আমার প্রতি জন্মে যে, আমাকে না পাইলে তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তবেই আমার কৃপা লাভ তোমার ঘটিবার সম্ভাবনা।" তিনি অনন্ত প্রেমের আধার ছিলেন বলেই জগতের জন্য এমন করে কাঁদতে পেরেছিলেন। বাবা লোকনাথের শিক্ষার মূল মন্ত্রই ছিল ভক্তি। নাম কীর্তনই কলি যুগের এক মাত্র উপায়, এই শিক্ষাই তিনি জগতকে দিয়েছেন। ভক্ত যেই রূপ অধিকারী লোকনাথ তাকে সেই রূপ ব্যবস্থার কথা বলেছেন। যিনি সাধারণ কর্মী তাকে নিত্য কর্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যিনি ভোগ বিলাসী তাকে ভোগের মধ্যে রেখেও ধর্মপথে আকর্ষণ করেছেন। লোকনাথ যখনই যাকে যাহা কিছু দান

করেছেন, প্রার্থী তাঁর মধুর বচনে প্রীত হয়ে তখনই তাঁর পবিত্র চরণে প্রণত হতেন।

লোকনাথের শিক্ষা প্রণালী ছিল অদ্ভুত। তিনি নিজের আচরণ দ্বারা ভক্তগণের পারস্পরিক তারতম্য বুঝিয়ে দিতেন এবং তাদের উন্নতির পথ দেখিয়ে দিতেন। সম্পূর্ণ আত্মবিস্তৃতি না জন্মালে এবং মহাপুরুষের প্রতি এক-নিষ্ট ভক্তি না থাকলে তাঁর পবিত্র সংসর্গের ফল লাভ করা যায় না। রজনী ব্রহ্মচারীকে একবার লোকনাথ বাবা পায়ে হেঁটে বিনা ছাতিতে বারদী যাওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর ঐরূপ হাঁটবার অভ্যাস ছিল না তবু বাবার আদেশ শুনে প্রসন্ন চিত্তে প্রখর রৌদ্র কিরণে পায়ে হেঁটে বারদী পেঁ ছিলেন। পথে তাঁর কোন কষ্টই হলো না। এর থেকে বোঝা যায় যে ভক্তকে কষ্ট দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বাবার আদেশ ভক্ত কত ভক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে তা দেখাই বাবা লোকনাথের উদ্দেশ্য।

লোকনাথের ন্যায় স্নেহময় পিতা জগতে মেলে না। মহাপুরুষ বলেছেন—"আমি শতাধিক বৎসর পাহাড় পর্ব্বত পরিভ্রমণ করে বড় একটা ধন কামাই করেছি, তোর ঘুরতে হবে না।" যে পিতা বহু পরিশ্রম করে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন তাঁরও ইচ্ছা থাকে পুত্র যেন আরো উপার্জ্জন করে সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করে। কিন্তু বাবা লোকনাথ অক্ষয় ধনের ভাণ্ডার খুলেছেন, তাই তিনি বলেছেন "আমার গৌরব থাক বা না থাক তোরা আমার অপেক্ষা গৌরবান্বিত হবি।" অপার্থিব ধনে ধনবান লোকনাথ সেই ধন বিলাবার জন্য বারদীর সমস্ত মানুষকে আহ্বান করেছিলেন।

বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত অভয়াচরণকে বাবা বলেছিলেন—"যার জন্য এতো ঘুরেছিস, আজ তা তোর হাতে বেঁধে দিলাম আর ঘুরতে হবে না।" "ঘুরলে কি হবে। কর্মই ব্রহ্ম।" মহাপুরুষ এই বাক্যের দ্বারা বুঝিয়েছেন যে অভয়াচরণ যে পথের জন্য এত বৎসর ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেই পথের সন্ধান আজ তিনি তাকে ধরিয়ে দিলেন। কর্ম দ্বারা সেই পথে অগ্রসর হলেই তাঁর সকল মনস্কামনা পূরণ হবে।"

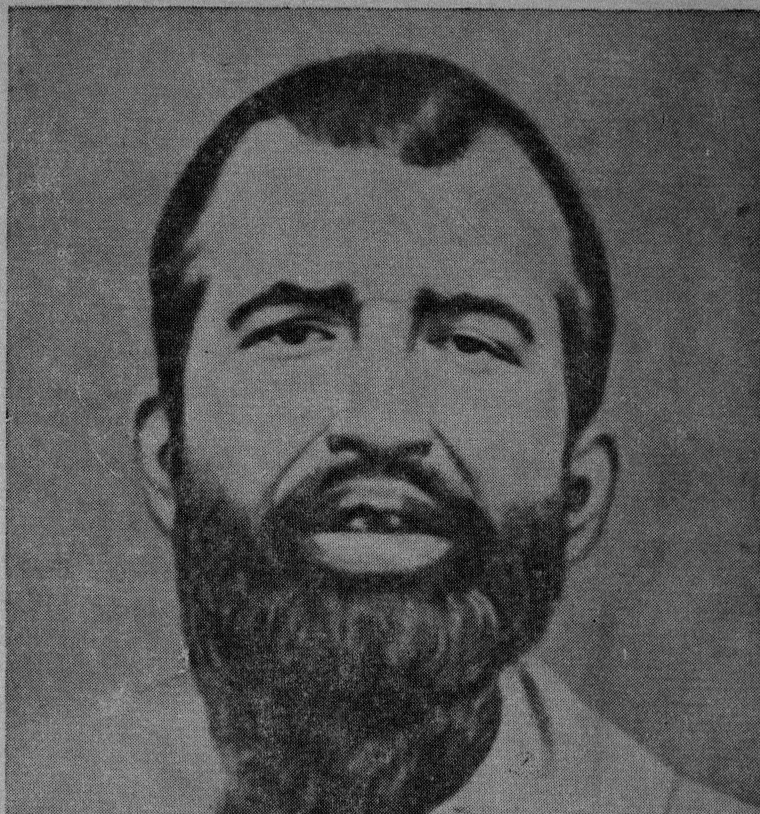
একবার রজনী ব্রহ্মচারী বারদী গেলে লোকনাথ তাঁকে বললেন—"স্বনাম পুরুষ্ ধন্য, তুই তো তোর নিজের নামেই ধন্য রে, তবে তুই আমার নাম করিয়া বড় হইতে চাস কেন?"—রজনী ব্রহ্মচারী বললেন যে তিনি বাবার নামেই অত্যন্ত সুখ অনুভব করলেন। লোকনাথ এই কথা শুনে আহ্লাদের সঙ্গে বললেন—"ছেলেটা যতো বড়ই হয় না কেন বাবা যে তাহা অপেক্ষা বড় এত

স্বতঃ সিদ্ধ কথা।" লোকনাথ এই বাক্য দ্বারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, অবিচলিত গুরুভক্তি না থাকলে কেহই ধর্ম জগতে উন্নতি লাভ করতে পারে না।

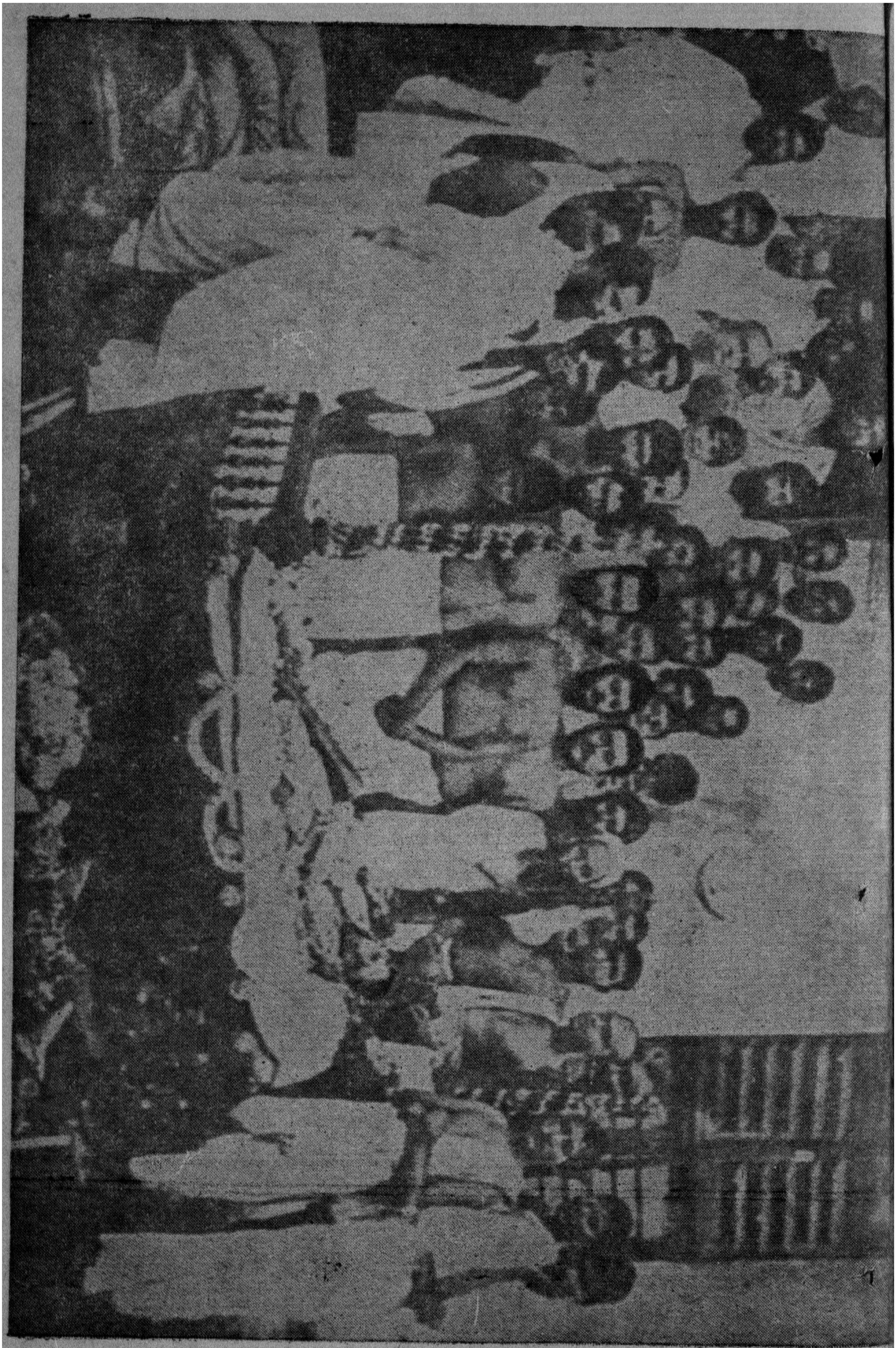
একবার নাগবাবুদের পাঁচ জন বাবু নিজেদের ঝগড়া মীমাংসা করার জন্য বাবা লোকনাথের নিকট উপস্থিত হলেন। বাবা লোকনাথ তাদের অপরাধ শুনে ৬০ টাকা জরিমানা করেন। এবং তিনি ঐ টাকা তাদের কাছ থেকে আদায়ও করেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তারা লোকনাথের নিকট উপস্থিত হোলে লোকনাথ তাদের বললেন—"আমি যে তোদের ৬০ টাকা জরিমানা করেছিলাম তাতে তোদের মনে খুৎখুৎ হয়েছিল কি?"—চার জন বললো তাদের খুঁত খুঁত লেগে ছিল। পঞ্চম ব্যক্তি বললো তার কোন খুঁত খুঁত লাগেনি। এই শুনে লোকনাথ বললেন—"এই জন্য তোদের টাকা আমি ফেরত দিয়েছিলাম। আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, কেহ কোন অন্যায় কার্য করিয়া সরলভাবে আমার নিকট প্রকাশ করিলে আমি যদি তাহার উচিত শাস্তি বিধান করি, তবে আমার উপর আবার শাস্তা কে আছে রে? আমি ইহাও তোদের বলিয়াছি যে আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, তোদের বিশ্বাস নাই, কাজেই তোদের ফল হয় না।"

যে নির্ভয়ে বাবার উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না সে কখনো বাবার কৃপা লাভ করতে পারে না। ব্রহ্মচারী বাবা বারদী অবস্থান কালে তাঁর পুণ্য প্রতিভা ও তপোবল যখন দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল, দেশ দেশান্তর থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক তাঁর শরণাগত হইতে ছিল, ঠিক এমন সময়ে ভাওয়ালের স্বর্গগত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণও ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করবার জন্য পারিষদবর্গ নিয়ে বারদী যাত্রা করলেন। পথে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন যে একজন রাজা হয়ে সামান্য একজন সাধুর পদধূলি নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন সে কথা তাঁর স্মরণ রইলো না। ব্রহ্মচারী বাবার সন্নিহিত হওয়া মাত্র তিনি ভূমিষ্ট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়া মাত্র বাবা তাকে হেসে বললেন "কেন বাবা! প্রণাম করিবে না বলিয়াই তো মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলে?"

বাবার আশ্রমে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসতেন। ব্রহ্মচারী বাবা তাদের খাদ্য ও অর্থ সাহায্য করতেন। প্রথম দিকে তারা বাবাকে তাদের মতোই সাধারণ সাধু বলে মনে করতেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তারা বাবার আশ্রমের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে যেতেন। বাবার চক্ষু তেজ এবং অলৌকিক



ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব



যোগৈশ্বর্যের এমনই প্রভাব ছিল। লোকনাথ কর্মযোগী ত্রিকালদর্শী ছিলেন। হিমালয়ে গিয়ে কর্মযোগাবলম্বনে বিশেষ ভাবে সমাধি বা চিত্ত স্থির করে রসায়নিক ফলোদয়ের দ্বারা সহসা শ্রবণমনন নিদিধ্যাসনের ফল প্রাপ্ত হলেন। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় আপনাকে কর্মের কর্তা ও ফলভোক্তা দেখিলেন না, কর্ম বা জগৎ হতে তিনি পৃথক পদার্থ, এ সকল তাহা হতে পৃথক বস্তুরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। পদ্ম পত্র জল মধ্যে বাস করলেও যেমন তাতে জল লিপ্ত হতে পারে না, তিনি কর্মের মধ্যে থেকেও তেমন কর্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। তিনি সকলের দ্রষ্টা। তিনি সংসারের সমস্ত বন্ধন হোতে মুক্ত হয়েছেন। বেদ বলেন "দধির মধ্যে ঘোলের সত্তা বাদ দিয়া যেমন অবশিষ্ট ঘৃত সত্তা গ্রহণ করিতে হয়, দীপ শলকাস্থিত কাষ্ঠ ও ফস্‌ফরাসের সত্তা বাদ দিয়ে যেমন গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত অগ্নির সত্তা অনুমান করা যায়, তেমন অন্তঃকরণ মধ্যে আত্মসত্তা উপলব্ধি হইতে পারে।" লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেইভাবে হিমালয়ে আত্মদর্শন করেছিলেন। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য করার নাম যোগ। বাবা লোকনাথ সিদ্ধির পূর্বে যাকে জীবাত্মা বলে জানলেন সিদ্ধির পরেই তাকে পরমাত্মারূপে অনুভব করলেন।

বাবা প্রায়ই বলতেন যে "বাড়ির গরুতে বাড়ির ঘাস খায় না।" "দেহটি যেন পাখীর খাঁচা। আমাকে উহারা মানুষ ভাবে। ভবরোগী পেলেম না।" সংসার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করেছি যে, কোন মূল্যবান বস্তুও নিতান্ত সুলভ হলে লোকে তার আদর করে না। লোকনাথ এই বাক্যের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, যারা তার অতি নিকটবর্তী—তাঁর সঙ্গলাভ করে আসছেন তারা অনেকেই প্রকৃত পক্ষে তাঁর মর্যাদা বোঝেন নি। এজন্য তিনি করুণাপরবশ হৃদয়ে গভীর মনবেদনা প্রকাশ করেছেন। লীলা সম্বরণের পূর্বে তিনি এইরূপ কথা বলতেন। দেহের প্রতি বিস্মৃতি জন্মালে সে দেহ অধিক দিন থাকে না। এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি লীলা সম্বরণ করেন।

লোকনাথ ভবরোগের বৈদ্যরূপে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। একবার শ্রী ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় বাবা লোকনাথকে বলেন—"বাবা, আমি আপনার নিকট এতো ঋণী যে, আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ আপনার জন্য ব্যয়িত হইলেও, সে ঋণের পরিশোধ হয় না।" গুরুদেবের এই কাতরোক্তি শুনে লোকনাথের নয়ন অশ্রুতে ভরে উঠলো এবং তিনি বললেন—"তুই কিসের ঋণীরে, আমি না তোর খাতক হয়েছি, তোকে গাইটেরটা খাওয়াই, তোর পায়ে

ধরি, তবু তোকে কিছু দিয়া দিতে পারি কিনা।" এর থেকে বোঝা যায় ব্রহ্মচারী করুণার সাগর ছিলেন।

লোকনাথ যে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর অপর কোন ভ্রাতা কর্তৃক তাহা হোতনা ব'লে ভগবানের অমোঘ ইচ্ছা ও শক্তি বলেই লোকনাথ জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। বিশ্ববিধাতা কোন বস্তু দ্বারা কোন কার্য এবং কার দ্বারা জগতের কোন হিতসাধন করবেন তাহা পূর্ব হতেই স্থির করে রাখেন। ব্রহ্মচারী বাবা বুঝেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান মিলন ব্যতীত ভারতের মঙ্গল সম্ভব নয়। তাই তিনি করুণা পরবশ হয়ে একবার মুসলমানের লীলাক্ষেত্র আরবদেশ এবং ভারতবর্ষে প্রকৃত ধর্মের চরম আদর্শ দেখাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তারই উপকরণ সংগ্রহের জন্য কাবুলে গিয়ে তিনি কোরাণ শিক্ষা করেন এবং তারই আদর্শ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করেন। যে মহাপুরুষ হিন্দু মুসলমান দুই ভাইকে দুই হস্তে সন্তানবৎ ক্রোড়ে তুলে আলিঙ্গন করতে পারেন, যিনি স্নেহময় পিতার ন্যায় হিন্দু মুসলমানের অশ্রুজল সমানভাবে মোছাতে পারেন তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ।

লোকনাথ কর্মমার্গ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য তিনি ব্রহ্ম হতেই অনুধাবন করেছিলেন। বাবা লোকনাথ বলেছেন—" 'আমি' হলাম গীতায় বর্ণিত সেই 'পরমাত্মা'। অস্ত্র যাঁহাকে ছেদন করিতে অসমর্থ, অগ্নি যাঁহাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে অক্ষম, বরুণ যাঁহাকে আদ্র করিতে অসমর্থ এবং বায়ু যাঁহাকে শুষ্ক করিতে বিফল কাম হয়।" "বহু বছর পাহাড় পর্বতে ঘুরেছি কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আমি দেখেছি আমাকে, আমি বদ্ধ আছি কর্মে অর্থাৎ সংসারে। সংসার বদ্ধ আছে জিহ্বা আর উপস্থে। যে ঐ দুটি সংযম করতে পেরেছে সেই কেবল সিদ্ধিলাভ করতে পারে।" "রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনি বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও। আমিই রক্ষা করিব।" "সঙ্গ হতে কাম, কাম হতে ক্রোধ। ক্রোধ হতে মোহ, মোহ হতে অসৎ পথে প্রবৃত্তি ও দুষ্প্রবৃত্তি, পুনঃ দুষ্পবৃত্তি হতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হলেই জীব অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়।" "সৎকর্ম, সদুপদেশ শ্রবণ, লোক সমাজে গুরুর সম্মানার্থে গুরুর প্রিয় কাজ করাই গুরু সেবা।" "অহং চলে গেলে মনই নিজের গুরু হয়, বুদ্ধি জাগ্রত হয়, সৎ ও অসৎ বিচার আসে। জ্ঞানের সাথে ভক্তির যোগ ক'রে দিয়ে তোরা মণিকাঞ্চন হোলে শ্রদ্ধা হবে তোদের আশ্রয়, শ্রদ্ধাই তোদের বান্ধব, শ্রদ্ধাই হবে তোদের পাথেয়।"

মধুমিতা দাশগুপ্তা

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

১৩৯০ বঙ্গাব্দের (১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখ মাসে পুরীধামে নাম কীর্ত্তনের একটি দল নিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দির পরিক্রমা করেন একজন সাধু—শীর্ণ, জটাজুট মণ্ডিত এক দিব্যমূর্তি। বক্ষে তাঁর গুরু পাদুকা যুগল। দক্ষিণ চরণটি খঞ্জ। চারশো বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখে রেখে গেছেন যে, বুকে গুরুদেবের খড়ম বাঁধা, খঞ্জ, মহামন্ত্র প্রচারে নির্দিষ্ট সময়ে পুরীতে নাম প্রচারে আসবেন। প্রভু স্বয়ং নরতনু ধারণ করে এই অবতারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন। তোমরা এঁর আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে থেকো। ত্রিকালজ্ঞ অচ্যুতানন্দের চোখে চারশত বৎসর পূর্বে যিনি "প্রভু" রূপে ধরা দিয়েছিলেন সেই সাধুটিই হলেন আজকের বিশ্ববন্দিত লক্ষ লক্ষ ভক্তের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

ধর্মের গ্লানি দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবার আবির্ভূত হলেন বাংলা ১২৯৮ সালের ৬ই ফাল্গুন, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে বুধবার সকাল ৮টা বেজে ১ মিনিটে শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। কাশ্যপ গোত্রে, মীন লগ্নে, শুক্র তুঙ্গস্থ এবং বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে। নবজাতকের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতবাণী শোনা গেল "ধর্মজগতে জাতকের প্রভাব হবে পূর্ণ। আধ্যাত্মিক আলোক জীবনে নতুন বাণী বহন করে আনবে। স্নেহে, প্রেমে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যে ইনি দান করবেন অদ্বিতীয় দাক্ষিণ্য। ত্যাগে, তপস্যায়, তিতিক্ষায় তাঁর চরিত্র-মাধুর্য্য লোক-শিক্ষায় আদর্শ ও অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।" সীতারামের পিতার নাম শ্রী প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়। মাতা শ্রীমতী মাল্যবতী দেবী। পিতামাতা তাঁর নামকরণ করেন প্রবোধচন্দ্র। তাঁর জন্মস্থান মাতুলালয় হুগলীর কেওটায়। সীতারামের পিতামাতা বাস করতেন হুগলীর ডুমুরদহ গ্রামে। ১৮৯৭ সালে মাল্যবতী দেবী পরলোকগমন করেন। এলেন আরেক মা, বালিকা গিরিবালা দেবী। গিরিবালা দেবী এলেন নিষ্কাম মাতৃপ্রেম নিয়ে। তিনি তাঁর মাতৃত্বের সবটুকু বাৎসল্য উজাড় করে বুকে তুলে নিলেন দিব্য শিশুটিকে।

১৩০৬ সালে মামার বাড়ী প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের কাছে পাঠ শুরু। কৈশোরে ব্যাণ্ডেল চার্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বাঙলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও ইংরাজী ভালো না লাগায় তিনি স্কুল ছাড়লেন। পরে ঘটনাচক্রে তিনি দিগ্সুইয়ের

শ্রী দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের নিকট আশ্রয় লাভ করেন। ১৩১৮ সালে পিতৃ-বিয়োগ হয়। ১৩১৯ সালের ২৯শে পৌষ মকরসংক্রান্তির দিন দাশরথি দেব তাঁকে দীক্ষা দেন। নামকরণ করেন সীতারামদাস। গুরুগৃহে তাঁর কঠোর তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্মচর্য্য শুরু হয়। তপস্যার সাথে সাথে চলতে লাগলো পড়াশুনো। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ। উপাধি নিলেন পুরাণতীর্থ, পুরাণরত্ন। ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হয় দিগ্‌সুইয়ের ঠাকুর শ্রীচরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সঙ্গে। বিবাহের পর নামকরণ হয় কমলা দেবী। লোক-চক্ষুর অন্তরালে শুরু হয় আদর্শবাদী—নিরাসক্ত পতির কাছে সমর্পিত-প্রাণা কমলার গার্হস্থ্য ধর্মশিক্ষা। উদাসী পতির অতন্দ্র সেবা করে যৌবনেই ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে তিনি বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি মধ্যরাত্রে চুঁচুড়ার ভূদেব চতুষ্পাঠীতে সীতারাম ধ্যানরত অবস্থায় দেবাদিদেব শঙ্কর ও মহামায়াকে দর্শন করলেন। অভিনব উপায়ে যুগবৎ আত্মদর্শন ও ইষ্টসাক্ষাৎকার। মন্ত্র লয় হয়ে গিয়ে ওঙ্কারের আবির্ভাবে উন্মীলিত চোখের উপরে গোলাকার জ্যোতির ছটা। ওঙ্কারধ্বনি সর্পগর্জনে পর্যবসিত হয়ে শূন্যে অন্তর্হিত হলো। তারপর থেকেই সীতারামের জীবনে এক নতুন রূপান্তর ঘটলো। সর্বদা মুখে জয়গুরু ধ্বনি। সেই বছরই সরস্বতী পুজোর দিন তাঁর পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়লো। তিনি এক বিশ্ববরেণ্য মাতৃসাধক ছিলেন। দোল পূর্ণিমার রাত্রে স্ব-স্বরূপ অবগত হলেন। গুরুদেব সব শুনে নতুন করে তাঁকে কাজ শুরু করতে বললেন। ১৩৩৮ সালে ঠাকুর সীতারাম স্বপ্নে ব্রাহ্মী দীক্ষা লাভ করলেন। এক বৎসর পরে গুরুদেব নিত্য ধামে গমন করলেন। নিত্য হোম ও তিলতর্পণ চলতে লাগলো। ১৩৪০ সালে সকল কর্ম ত্যাগ করলেন। জপ, তপ, তর্পণ, পূজা-পাঠ প্রভৃতি কোন কাজ করবার ইচ্ছাই তাঁর রইলো না। রাতদিন শুধু "হরেকৃষ্ণ" সঙ্গীতের শব্দ কর্ণে ধ্বনিত হতে লাগলো। "সীতারাম" নাম গুরুদেব পূর্বেই দিয়েছিলেন। এবার উর্দ্ধলোক থেকে নামকরণ হোল "ওঙ্কারনাথ"। ১৯৩৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি ত্রিবেণীতে আনুষ্ঠানিকভাবে "সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ" নাম ধারণ করলেন। ঐদিন থেকে কাশ্যপগোত্রীয় প্রবোধচন্দ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে অচ্যুত গোত্রীয় শ্রীবৈষ্ণব সীতারামদাসরূপে ওঙ্কার-নাথের সন্তজীবনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হল।

১৯৩৭ সালের ২৪শে এপ্রিল রাত্রে শ্রী জগন্নাথদেবের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে তিনি বিশাল কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পুরী, ডুমুরদহ, দিগ্‌সুই,

বাঁকুড়া, বর্ধমান—একটির পর একটি স্থানে বছরে বছরে চললো চাতুর্মাস্তে অখণ্ডনাম আর অন্নদানব্রত। রামনামক্ষেত্রম্ একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। সেখানকার সেবকদল সীতারামের প্রেমের জোয়ারে ভাসলেন। ভারতের সমস্ত প্রান্তে এরপর ৪৫ বৎসর যাবৎ মন্দির স্থাপনা, জীর্ণমন্দির উদ্ধার, নর নারায়ণসেবা, বস্ত্রদান, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের সাহায্য, শত শত দুর্গত পরিবারের আজীবন ভারবহন, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, সারা ভারতে ২৯টির বেশী অখণ্ড মহামন্ত্র সংকীর্তন কেন্দ্র স্থাপন, ১২৫ কোটি হস্তলিখিত রামনামের মন্দির স্থাপন প্রভৃতি অজস্র কাজ অবিরাম চলতে লাগলো। এর সাথে চলেছে নিয়মিত মৌন তপশ্চর্য্যা। এই মৌনকালে প্রস্তুত হয়েছে দেড় শতাধিক অমূল্য গ্রন্থরাজি। এইসব গ্রন্থে রয়েছে প্রজ্ঞার অমর স্বাক্ষর। ওঙ্কারেশ্বরে ১৯৫২-৫৩ সালে ৫ মাস ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৬ মাস কঠোর মৌনব্রত অবলম্বন করলেন ঠাকুর। ১৯৬৫ সালে হার্নিয়া রোগ উপলক্ষ্য করে গঙ্গাতীরে ব্যারাকপুরে "জাহ্নবীকুঞ্জে" বাস করে সৃষ্টি করলেন একে একে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রাণকেন্দ্র মহামিলন মঠ, কিশোর সঙ্ঘ, যুবক সঙ্ঘ এবং দিকে দিকে বিস্তৃত মাতৃ জাতির কীর্তন, সাধ্যায় ও মিলনকেন্দ্র—সতী সঙ্ঘ। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে এলেন বহু ভক্তবৃন্দ। ডুমুরদহের মোল্লা সাহেবদের কাছে তিনি ছিলেন "পীর" সদৃশ। হৃষীকেশে ১৯৮১ সালে এবং কন্যাকুমারিকায় ১৯৮২তে ফরাসী ও মার্কিন শিষ্যদের প্রতি করুণার বন্যা নতুন করে বয়েছিল। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯০ তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এক ধর্ম সম্মেলনে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে ঠাকুরকে বর্তমান যুগের সমন্বয় অবতার ও আধ্যাত্মিক কর্ণধার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। ঠাকুর গঙ্গাসাগর মহাতীর্থে হাজার হাজার নরনারীকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্বের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

১৯৮২ সালে কন্যাকুমারিকায় এলেন অসুস্থ অবস্থায়। শরীরে নানা উপসর্গ। বাল্যের সাথী ফুসফুসের রোগ দেখা দিল—সঙ্গে রক্তাল্পতা, পুষ্টিহীনতা, শ্বাসকষ্ট। গেলেন শ্রীরঙ্গমে। রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও আনন্দময়। সেবকরা নিয়ে এলেন কলকাতায়। ১৩৮৯ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ ইংরাজী (৬/১২/৮২) রাত্রি ১-৩০ মিনিটের সময় উপবিষ্ট অবস্থায় উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারাম বাহ্যলীলা সম্বরণ করে অন্তরে প্রবেশ করলেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের অলৌকিক জীবনের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।

ইংরাজী ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের B. T. পরীক্ষায় অন্যতম প্রধান পরীক্ষার্থী ছিলেন শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান টাউন স্কুলের শিক্ষক। History of Education-এর প্রশ্নপত্র খুবই কঠিন হওয়ায় হতাশ হয়ে নিমীলিত নয়নে নিস্তব্ধভাবে বসে আছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন ঠাকুর বলছেন তাকে লিখে যেতে। রাখালদাস বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লিখতে লাগলেন প্রশ্নের উত্তর। আশ্চর্যজনকভাবে তার মনে হলো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই তার পক্ষে সম্ভব। পরীক্ষার ফল বেরুল। তিনি আশাতীত সাফল্য-লাভ করলেন। ঠাকুরের অশেষ করুণা তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল। প্রণাম পর্ব চলাকালীন কত রকমের প্রণামার্থী আছেন। পরীক্ষার্থী'র হৃদয় উৎকণ্ঠায় ভরা তাই পেনটিকে ঠাকুরের করস্পর্শ করিয়ে নিতে চায়। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ পেনে পরীক্ষা দিয়ে তার ফল ভালো হবে। ঠাকুর শুধু তাকে আশীর্বাদ দিতে চাননা, তার সাথে ভালবাসাও দিতে চান। পরীক্ষার্থীটি অস্থির হলে সীতারাম ঠাকুর পেনটা তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে দূরকে নিকট করেন, পরকে আপনার করে নেন, চিরতরে একটি মুহূর্তের মধ্যে। মাতৃমণ্ডলীর বেশীর ভাগ যশোদার ন্যায় বাৎসল্য রসের উপাসিকা। তাই সীতারাম তাদের কাছে গোপাল সোনা। তাঁর কাছ থেকে 'মা' ডাক শোনার জন্যই তারা অস্থির। শত সহস্র লোকের মধ্যে, বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যেও কখনো স্পর্শ দিয়ে, কখনো হাসি দিয়ে, কখনো করুণা দৃষ্টি দিয়ে ঠাকুর সীতারাম তাঁর রূপটি যে কত ভাবে মাধুর্যমণ্ডিত করেই প্রকাশ করতেন! নিত্য কত প্রার্থী'র প্রার্থনা পুরণ করতে গিয়ে সীতারাম শ্রীনিবাসের সেবকদের উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন—'মনে রাখিস যে কোন প্রার্থনা নিয়েই আসুক না কেন—তা পূরণ করাই আমাদের ব্রত!' কত অসংখ্য পাপী তাপীকে সীতারাম তাঁর অভয়পদে স্থান দিয়েছেন, কত লোহার মানুষ তাঁর সংস্পর্শে সোনা হয়ে গিয়েছে। একবার এক ভক্ত শ্রীরামাশ্রমে আগত হলে ঠাকুর তাকে বললেন যে সামনের কার্তিক মাস পুণ্যের মাস। ঐ মাসটা ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে তার ভালো হবে। বাড়ী ফিরে ভক্তটি ব্রহ্মচর্য্য পালন করা শুরু করলেন। ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার পর হঠাৎ একদিন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বিছানায় একমাস শয্যাশায়ী রইলেন। অগ্রহায়ণের শেষে এক রাত্রিতে ঠাকুর নিজে এসে ভক্তের রুগ্ন শরীরে হাত বুলিয়ে তার রোগ যন্ত্রণা লাঘব করলেন। ভক্তটি ভালো হবার পর বাবাকে বললেন যে সে এতো কষ্ট করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করলো তবুও তার কেন এতো কঠিন অসুখ হলো। বাবা তখন তাকে বললেন যে কুষ্টীতে তার

মৃত্যুযোগ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য করার ফলেই তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

সহস্র সহস্র শিষ্য, ভক্ত, অনুগামী অনুরাগী সীতারামের। প্রত্যেকের অন্তরই তাঁর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে আছে। কেবলমাত্র ভক্ত শিষ্যদের নয়, একদিকে সীতারাম যেমন সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের পরম ভক্তিভাজন তেমনি শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধাস্থল। তিনি শাস্ত্র সদাচার স্বধর্ম পালনে একান্ত আস্থাশীল বলেই তাঁর বিশ্বপ্রেম হয়ে উঠেছে প্রাণ-স্পর্শী অথচ বাস্তবানুগ, গভীর অথচ আতিশয্যবর্জিত। শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ একজন সন্ন্যাসী। ন্যায়, সততা আর মানবতাই হচ্ছে তাঁর ধর্ম। চিরকালই তিনি ছিলেন সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সীতারাম একই ভাবধারার বাহক ও ধারক। তাঁর নিজের জন্য নিস্প্রয়োজন হলেও আদর্শ রক্ষার্থে, জগৎ শিক্ষাকল্পে তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিলাসব্যসন বর্জিত দীনহীন ভিক্ষুকের জীবনযাপনে আগ্রহী। ত্যাগী, বিরক্ত সন্তানদেরও অনুরূপ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন—"পরমাণু সাগরে আমরা ডুবে আছি। পরমাণু খুব সূক্ষ্ম। জানলা দিয়ে রোদ এলে তাতে ছোট ছোট যেন কি দেখা যায়—তা ছয়টি পরমাণু দিয়ে তৈরী। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা, সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, পাপ, পূণ্য—এক কথায় যা কিছু সব পরমাণুময়। যখনই ক্রোধ হ'লো অমনি চারিদিকে ক্রোধের পরমাণু রাগ বাড়িয়ে দেয়। কাম এলেও কামের পরমাণু এসে আনন্দ দান করে। জপ, ধ্যান, নাম করলে—জপ, ধ্যান, নামের পরমাণু এসে আনন্দ দান করে। আরতি করলে ঘড়ি ঘণ্টা, শাঁখ বাজালে, ধূপ দিলে সাত্ত্বিক পরমাণু জমে আনন্দ দান করে। যেমন যেমন বাইরের অবস্থা, মনের অবস্থা, সেই সেইরূপ পরমাণুরূপিণী মহাশক্তি এসে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম-মত পাপী বা পূণ্যবান করত পাপীকে রোগ শোক, দুঃখ-জ্বালা শেষ পর্যন্ত নরকে পাঠান আর পূণ্যবানকে শাস্ত্রপথে চালিত করত আনন্দের উপর দিয়ে পরমানন্দে ডুবিয়ে দেন।"

এই জগৎ শ্রী ভগবানের বিরাট দেহ। শ্রী সূর্যদেব স্থাবর জঙ্গমের আত্মা, তিনি প্রত্যেক জীবের প্রাণরূপে হৃদয়ে এবং মুখে চক্ষুরূপে অবস্থান করছেন। —চক্ষুকে বড়ো সাবধানে রাখতে হয়। শ্রী ভগবান সব সেজে লীলা করছেন—এইভাবে দর্শন ও প্রণাম অভ্যাস করতে হয়। তিনি মহৎ হ'তেও মহীয়ান, অণু হ'তে অণু, বাইরে বিরাট রূপে ও নরনারীর সহস্র দলে কোটি সূর্য্যের

প্রভাসম্পন্ন পরম বিন্দু রূপে অবস্থান করত প্রাণকে চালিত করছেন।" "আমার করুণাময় শ্রী ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য সাধারণতঃ মন্ত্রযোগ, হঠযোগ ও লয়যোগের সৃষ্টি করেছেন। মন্ত্রযোগের ধ্যেয় —শ্রী ভগবানের সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহ, হঠযোগের ধ্যেয়-জ্যোতি আর লয় যোগের ধ্যাতব্য-নাদও বিন্দু। মন্ত্র জপ করতে করতে সব আপনিই প্রকাশ হয়। চরম জন্মে ত্রি-যোগের সাধকগণ, সেই কোটি সূর্য্যসম প্রভ, কোটি চন্দ্র সুশীতল পরমবিন্দুতে একীভূত হয়ে যান—এর নাম নির্ব্বাণ।"

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—কলিযুগে নামই পরম ধর্ম। নাম করাই পরম তপস্যা। নামকারীকে ভগবান দর্শন দেন, বর দেন। পাপী তাপী রোগী শোকী যে কেউ হওনা কেন, তুমি নাম করো। পাপী তুমি নাম করো, তোমার ভয় নাই। নাম করতে করতে তোমার পাপ করার সামর্থ্য আর থাকবে না। নাম করতে করতে পাপীর পাপ যাবে, রোগীর রোগ যাবে, শোকীর শোক যাবে। ভগবান প্রত্যেককেই স্ত্রী পুরুষ সকলকেই একটি পরমরত্ন দান করেন। সে রত্ন একবার গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না, সে মহারত্নকে খুব সাবধানে রক্ষা করতে হয়। সে রত্ন হচ্ছে 'চরিত্র'। এই অমূল্য নিধি যার নষ্ট হয়ে যায় তার সব যায়। সেই জন্য পুরুষ স্ত্রী থেকে এবং স্ত্রী পুরুষ থেকে দূরে থাকবে। তোমরা কাউকে দ্বেষ করবে না। হিংসা করবে না, কারও প্রতি আঘাত করবে না। কারণ ভগবানই সব সেজে লীলা করছেন। যাকে আঘাত করবে ভগবানকেই আঘাত করা হবে। ভগবান সকলের হৃদয়েই বাস করছেন। শ্রীভগবান বলেন—এমন কোন কর্মজ, বাগজ বা মানস পাপ নাই যা গোবিন্দ কীর্তনের দ্বারা ক্ষয় না হয়। তোর জ্বালা অশান্তি থাকবে না, আমি তোকে বুকে করে তুলে নেবো। কেবল সময়ের অপেক্ষায় আছি। নাম কর্—সময় হলেই আমার দেখা পাবি। উঠতে বসতে খেতে শুতে হেলায় শ্রদ্ধায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভক্তিতে অভক্তিতে যে কোন প্রকারে নাম করলে কৃতার্থ হবেই হবে। নাম নাম নামই এ যুগের একমাত্র উপায়।"

"ভোগে তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, আছে জ্বালার পর জ্বালা। ইন্দ্রিয়গণের অসংযমই আপদের পথ, ইন্দ্রিয় জয়ই ইন্দ্রিয় সংযমই সম্পদের মার্গ—যে পথে ইচ্ছা যাও।" এই ভাবে সীতারাম দেহবোধ বিস্মৃত হয়ে কলিহত ভোগ-সর্ব্বস্ব জীবকূলকে ধর্মমার্গে উদ্বোধিত করেন। ধর্মকর্মে অনুপ্রেরিত করেন। দিনের পর দিন চলে তাঁর অক্লান্ত ধর্মপ্রচার অভিযান। সীতারাম বিগ্রহ এই নাম ও প্রণামের মিলিত বিগ্রহ, যুগল প্রকাশ।

সীতারাম শুধু বিশ্বগুরু নন, তিনি সর্বশিষ্যও। তাই তিনি শিষ্য ভক্তরূপী ভগবানের দিকে বারে বারে প্রণাম জানিয়েছেন। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছেন। বলেছেন "তুমি যে দণ্ডরূপী ভগবান, একান্তভাবে নাম আশ্রয় করে থাকার জন্যই নিজেকে নিয়ে বিরাট ব্যাপার। সীতারাম নাম আশ্রয় করে আছে বলেই আজ লোকে—বড় বড় পণ্ডিত মহাত্মা পর্যন্ত কেউ মহাপুরুষ কেউ জগদ্‌গুরু কেউ অবতার কেউবা সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্তব করছেন। শুধু আজ নয়, চিরকালই ভগবানাশ্রিত ব্যক্তিকে লোকে এইসব বলে থাকে। সীতারাম ভালোভাবেই জানে এ তার গৌরব নয়—নামের।" তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। সে দীক্ষা একেবারে সিদ্ধযোগ। তার জন্য শুধু দরকার মনকে সৎকাজে লাগিয়ে রাখা।

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন—"আমি দেহ নই, শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা, ঘ্রাণ নই, বাক্-পানি-পাদ-পায়ু-উপস্থ নই, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার নই, আমি নিত্য শুদ্ধ মুক্ত পরব্রহ্ম। এ জগৎ নাই, জীব নাই, একমাত্র আমি আছি। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, সেইরূপে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়েছে—জগৎ বলে কিছু নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন।"

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন—"যখন কোন শব্দ করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করা হয় তখন হৃদয়ে বা অন্তঃকরণে প্রথম প্রণব বা 'ওঁ'কার শব্দ হয়। যখন কোন একাক্ষর শব্দ উচ্চারণ করা হয়, তখনও এই প্রণব উচ্চারিত হইয়া থাকে। কোন স্বরযন্ত্রে আঘাত করিলে এই প্রণব ধ্বনিত হয়। যতকাল দেহে প্রাণ থাকিবে ততকাল দেহমধ্যে এই শব্দ ধ্বনিত হইবে—ইহা দেহ মধ্যে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। ইহা শুনিবার জন্য উপযুক্ত হইলে সর্ব্বদাই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আমরা অন্যান্য শব্দে আকৃষ্ট থাকি, তাই এই শব্দ শুনিতে পাই না। নতুবা দেহ মধ্যে অহর্নিশি এ শব্দ উত্থিত হইতেছে। এই তত্ত্ব হইতে জ্ঞানিগণ বিচার বিবেচনা করেন যে সর্ব্বত্রই এ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ কোন শব্দ করিবার পূর্ব্বেই প্রণব ধ্বনি আমাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়। আর্য ঋষিগণ এই জন্যই প্রণবকে প্রথম শব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রণব প্রথম শব্দ বা প্রথম মন্ত্র। ইহার আর একটি অর্থ ব্রহ্ম—সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই প্রণব। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি প্রথমে নাম পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রকাশ পান। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই

রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে। 'স্ফোট" অর্থে সমস্ত জগতের অভিব্যক্তির কারণ শব্দব্রহ্ম। সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের অনন্ত সমবায়ী উপাদান স্বরূপ এই অনন্ত কোটি স্ফোটই সেই শক্তি, যদ্বারা ভগবান প্রথমে আপনাকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে পরিণত করেন। এই স্ফোটের একমাত্র বাচক শব্দ আছে 'ওঁ'। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ বলেই যখন আমরা শব্দকে পৃথক করিতে পারি না, তখন এই ওঁকার রূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি বল শব্দও ভাব নিত্যসম্বন্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক অনন্ত শব্দ থাকিতে পারে সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে ওঙ্কারই তাহার কোন অর্থ নাই। একথা বলিলে আমাদের উত্তর এই—

ওঙ্কারই এইরূপ সর্ব্বভাববাচক শব্দ আর অন্য কোন শব্দ এতত্তুল্য নহে। অর্থাৎ শব্দগুলির মধ্যে পরস্পর যে প্রভেদ তাহা দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে, সুতরাং এই স্ফোটকে নাদ ব্রহ্ম বলে। অন্য যে কোন শব্দ হউক না কেন, তাহার দ্বারা স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলিবে যে তাহার বিশেষ ভাবাপন্ন হইবে আর যাহা যথাসম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করিবে, তাহাই উহার প্রকৃত বাচক হইবে। ওঙ্কার—কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ। কারণ অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষর একত্রে 'অউম' এইরূপ উচ্চারিত হইলে, উহাই সর্ব্বপ্রকার শব্দের বাচক হইতে পারে। অ—সমুদয় শব্দের ভিতরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিশেষ ভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন অক্ষরের মধ্যে আমি সকার। আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দেই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ' কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম' শেষ ওষ্ঠ শব্দে। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাবে প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটার সূচক, আর যে কোন শব্দেরই সে শক্তি নাই; সুতরাং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী বাচক —এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর বাচক বাচ্য হইতে পৃথক হইতে পারে না, সুতরাং 'ওঁ' ও স্ফোট একই পদার্থ। আর এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতমাংশ বলিয়া ব্রহ্মের খুব নিকটবর্তী। অতএব উহা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ। সুতরাং ওঙ্কার ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক।"

ঠাকুর বলেছেন—"ধৃতি মানে ধৈর্য্য—সুখদুঃখে সমভাব, ক্ষমা হল—ক্ষমতা

থাকতেও অপকারীর অপকার না করা, দম—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, অস্তেয়—হচ্ছে কায়মনোবাক্যে অপরের দ্রব্য চুরি না করা, শৌচমৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ, মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা অন্তরের শুচিতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ —বাহ্য বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করে অলৌকিক বিষয় লাভের জন্য শাস্ত্রপথে চালনা করা! ধী আত্মবিষয়িনী বুদ্ধি, অর্থাৎ আমি দেহ নই, আত্মা—এই বুদ্ধি, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান যাতে লাভ হয় এমনি ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনই বিদ্যা। সত্য—যথার্থকথন—লোকহিতকর বাক্যকথন, আর ক্রোধের কারণ উপস্থিত হলেও ক্রোধ না হওয়ার নাম অক্রোধ। ইহাই দশবিধ ধর্মের লক্ষণ। যিনি এই দশলক্ষণযুক্ত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত তিনিই যথার্থ ধার্মিক।”

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—“বল পথিক! দুর্গা দুর্গা বলো, কোন সংশয় করো না। অতি বড় মহাপণ্ডিতও নাম বিশ্বাসকে অল্প বুদ্ধির কার্য্য বলেন, তিনি অবৈদিক। ভাইরে! শিবের চেয়ে বড় কে আছেন? শিব বলেছেন—দুর্গা দুর্গা করলে মানুষ জীবন্মুক্ত হয়; সে শিব হয়ে যায়—যে ব্যক্তি মহোৎপাতে, মহারোগে, মহাবিপদ সঙ্কটে মহাদুঃখে, মহাশোকে, মহাময় উপস্থিত হলে সতত দুর্গাকে স্মরণ করে করে—দুর্গানাম পরম মন্ত্র জপ করে, যার যা প্রিয় ও ভাল দ্রব্য আছে তার দ্বারা মার পূজা করছে। আমি শুধু মা বলে ডাকবো। মাই আমার শাস্ত্র। বেদ আগম স্মৃতি বেদান্ত আদি বিবিধ দর্শন যাঁহাকে অনেক প্রকার প্রমাণের দ্বারা “ব্রহ্ম” বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন ইনিই সাক্ষাৎ ভগবতী নিত্যা। ইনিই বিশ্বাত্মিকা, নিরুপমা, নিরুপদ্রবা, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি লয়াদির কারণ। যোগীগণ ইঁহারই পাদপদ্মের নখদ্যুতি ধ্যান করেন, ইঁহাকেই আকৃতি বিহীন বলেন। এই দেবীই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, ইনিই পালন করেন আবার ইনিই জগদাধার ভূতা সর্ব্বরক্ষাকারিণী, পরম মোক্ষদা। ইনিই সিন্ধু নিমগ্না, বিষ্ণুর রক্ষার জন্য বটপত্রময়ী হইয়া সেই জলরাশি মধ্যে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেবী দুর্গতি প্রাপ্ত ব্যক্তির দুর্গতি নষ্ট করেন বলিয়া লোকে দুর্গতিনাশিনী বলিয়া থাকে।”

ভগবদ্দর্শনেই নিজে থেকেই সমস্ত কর্ম গলিত হয়ে যায়। মন্ত্র থাকে না, নাদাত্মক জ্যোতির্ময় ওঙ্কার হৃদয় কমলে আবির্ভূত হয়ে আনন্দ দিতে দিতে পরম ব্রহ্মে একীভূত করে দেন। গায়ত্রী জপ, কৃষ্ণ, রাম, শিব, কালী, দুর্গা, গুরু জপ করতে করতে ভক্ত ওঙ্কারে পৌঁছে যান।

সীতারাম বললেন—“নাম করাই তো মহাযোগ, চেঁচিয়ে রাম রাম করা কীর্ত্তনযোগ, মনে মনে নাম করা মন্ত্রযোগ। নাম করতে করতে বায়ু জমাট

বেঁধে আলো জ্বলে উঠলে হঠযোগ, বাঁশি বাজলে—বিন্দু যখন নেচে নেচে খেলা করে তখন লয়যোগ, পাগলী সাপিনী যখন গান গাইতে গাইতে পাগলের সঙ্গে মিশে গিয়ে একেবারে নিঃশব্দ হয়, তখন রাজযোগ। শুধু নাম কর। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি তোর সব ভার গ্রহণ করলাম। তোর কিছুর জন্য ভাবতে হবে না। আমার প্রেমলাভে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি। নামময় হবি। তার অতীত সপ্ত পুরুষ, ভবিষ্যৎ চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। যেমন করে হোক নামের সঙ্গ কর। নাম করতে ইচ্ছে করে না? তবে শোন। শুনতেও ইচ্ছা করে না? তবে আনন্দিত হও। তাতেই কাজ হবে। যে নিত্য আমার কথা বলে, যে নিত্য আমার কথা শোনে, যে আমাব কথায় আনন্দিত হয় আমি তাকে ত্যাগ করি না।"

শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রতিটি কথাই অনুভূত সত্য। তাই তার প্রত্যেকটি বাণী এক একটি বেদ বাণী। "জগতে সবই চঞ্চল, স্থির এক ভগবান। দেবতা একটি—'একমেবমদ্বিতীয়ম্।' তবে তাব রূপ ও নাম বহু। যেটি যাহার প্রকৃতির অনুগত—শ্রী গুরুদেব তাই নির্দেশ করিয়া মন্ত্র দেন। শ্রী ভগবান আছেন—এখনও দর্শন দেন। প্রেমী ভক্তের আকুল আহ্বানে প্রেমময় ঠাকুর ইষ্ট মূর্তিতে দর্শন দিলেন—সে দর্শন স্বপ্নের মতো, দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হন, সে দর্শনে ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা হয় না—তাহাতে বিরহ আছে। ভগবান সেই দেহমাত্র পরিচ্ছন্ন—এই জ্ঞান লাভে ভক্ত কৃতার্থ হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইষ্ট দেবতাকে নর-নারীতে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতায়, সূর্যে, চন্দ্রে, আকাশে, বাতাসে, নক্ষত্রে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষ্যে—এক কথায় সর্বত্র, অণু-পরমাণুতে পর্যন্ত দর্শন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে দর্শন প্রকৃত দর্শন নয়—তাহাতে দুঃখ শান্তি হয় না। যত্র যত্র নেত্র পড়ে তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে।" "মাকে যে ভক্ত আশ্রয় করেছেন তিনিই পরমা শান্তি লাভ করেছেন। ওই রামপ্রসাদ, ওই কমলাকান্ত, ওই বামাক্ষ্যাপা, ওই রামকৃষ্ণ পরমহংস—সকলেই তাঁর দর্শন লাভ করেছিলেন। এ যুগেও মা আসেন—কাতরভাবে ডাকলে দেখা দেন। কেবল মা মা কর, আর কিছু করতে হবে না—মা বুকে করে সেই আলো আনন্দ সুরের দেশে নিয়ে যাবেন। কেবল মাই শরণাগত। ওরে শাস্ত্রের বন্ধন বন্ধন নয়, সে মহামুক্তির বিজয় দামামা। শাস্ত্র বিহিত পথই প্রহরী-বেষ্টিত রাজপথ। বর্ণাশ্রম ধর্ম হল আর্যগণের প্রাণ, সর্বত্র সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। যদি কেউ বলেন—আমি ভগবান মানি—বর্ণাশ্রম মানিনা, তিনি ভগবানকে পেলেন কোথায়! যে শাস্ত্র ভগবানের

সন্ধান দিয়েছেন, সেই শাস্ত্রই বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলেছেন। যিনি ভগবানকে মানেন, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম মানতে বাধ্য। বিনা আচারে মানুষের হৃদয়ে ভগবদ্ভাবের স্ফূর্তি লাভ হইতে পারে না। সদাচার ও সাত্ত্বিক আহার সাধন ভজনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সত্ত্বগুণ বাড়ালে মন স্থির হয়। তুলসী হইলেন সত্ত্বগুণের একটি মূর্তি। তুলসীর পত্রে, তুলসীর কাষ্ঠে, তুলসীর গন্ধে, তুলসী মূলের মৃত্তিকায় প্রচুর সত্ত্বগুণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তুলসীর সেবায় মন সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত হয়। এক দেখতে অভ্যাস কর। সব শ্রী ভগবানের দেহ—এই বোধে সমস্ত বস্তুতে মনে মনে প্রণাম অভ্যাস করবে। "গৃহস্থের কর্তব্য অতিথি সেবা, পুত্রের কর্তব্য পিতৃ-মাতৃ সেবা, শিষ্যের কর্তব্য গুরু সেবা, নারীর কর্তব্য পতি সেবা। যৌবনই সাধনার শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ, দেখো, যেন এ দুর্লভ ক্ষণ ব্যর্থ হইয়া না যায়। অপরের নিন্দা কোবো না। অপরের নিন্দা শুনো না। ঐরূপ করিলে তুমি পাপীর পাপের অংশ গ্রহণ করিবে এবং পূর্বার্জিত সকল গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। যিনি নিন্দুকের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দুকের পুণ্য লাভ করে থাকেন। আর ঐ সহনশীল পুরুষ আপনার সমস্ত পাপ ঐ ক্রোধী নিন্দাকারীকে দেন। ঋষিগণ বহু পথের কথা বলেছেন। যে যেমন পথের অধিকারী সে সেইরূপ পথ ধরে নেবে বলেই বহু পথের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তারপর শেষে গিয়ে সব এক হয়ে যায়। গুরু আজ্ঞা মত সাধন-ভজনই শ্রী গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট—তিনটি, একটি, প্রত্যহ জপকালে ইহা ধারণ করত জপ কর্তব্য। যদি শান্তি চাসরে মন সদা ভাব শ্রী গুরুচরণ। আমি "তোমার শরণাগত" সদা সর্বদা বলবে।"

শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথের মহিমা অপার। আমরা সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তার কতটুকুই বুঝতে পারি। এ যুগে শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের আবির্ভাব শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বেই গুরুত্বপূর্ণ। গুরুর আদেশ নিয়ে তিনি যে কর্মময় জীবনের অধ্যায় শুরু করেছিলেন তা ছিল—জনসাধারণকে ঈশ্বর লাভের সহজ, সরল পথের সন্ধান দেওয়া। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের অন্য দেশগুলিও তার ধর্মীয় জীবনের আধ্যাত্মিকতাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। হে ঠাকুর আমরা যেন তোমার পথকে অনুসরণ করে চলতে পারি। তুমি আমাদের শক্তি দিও।

শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন—"সাধকের কাহারো আগে নাদ আসে, কাহারো বা আগে জ্যোতি আসে। সেই নাদবিন্দু বা বিন্দুনাদ—এই দুই প্রকার রূপই শাস্ত্রে দেখা যায়। নাদ অনাহত ধ্বনি, ইহা কোটি সহস্র প্রকার, বিন্দু বা

জ্যোতি কোটি শত প্রকার। বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন আছো সেই ভাবে শুধু নাম কর। নামই ভগবান। একেবারে যদি তাঁকে ধরে থাকতে পারো তবে চিন্তা কি? যে রাজার কাছে সর্বদা থাকে সে দ্বারবান্‌গণের কৃপা ভিক্ষা করবে কেন! যার জিহ্বা নাম-গান কুণ্ঠিত, সে বৈরাগ্যের কথা ভাবুক। যে নাম করতে পারে বিবিক্ত, বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, শমদমা—দিষ্ট সম্পত্তি এই সাধন চতুষ্টয় তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটতে থাকে।"

হে ঠাকুর! আমরাও যেন সদা সর্বদা তোমার নাম গান করতে পারি। তুমি আমাদের রক্ষা কর। তোমার কৃপালাভে যেন কখনো বঞ্চিত না হই।

॥ ওঁ চৈতন্যঃ শাশ্বতঃ শান্তো ব্যোমাতীতো নিরঞ্জনঃ
বিন্দুনাদ-কলাতীতস্তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ ॥

মধুমিতা দাশগুপ্তা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কথা। জনগণের জীবন ও চিন্তাধারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। একদিকে পরাধীন ভারতবাসীর অন্তর বেদনা, অন্যদিকে মানবতাবিরোধী, ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান—গতি প্রতিটি মানুষের জীবন কে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। বিশ্বপরিস্থিতির এই প্রতিকূলতার মধ্যেও আছেন কিছু শুভবুদ্ধি প্রবুদ্ধ সাধু-সজ্জন।

এমনই একজন মানুষ ছিলেন শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। উত্তরবঙ্গের (বাংলাদেশ) পাবনা জেলার হিমায়েতপুরে তাঁর বসবাস। ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্র শিবচন্দ্র। কুল-কৌলীন্যে শীল-নিষ্ঠায় প্রখ্যাত। শাণ্ডিল্য গোত্রজ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শিবচন্দ্র যখন সাত-আট বছরের, মা মৃন্ময়ী দেবী তখন স্বর্গারোহণ করলেন। বাবা গেলেন ছেলেকে ষোল বছরের রেখে। ছেলেবেলা থেকেই তাই শিবচন্দ্রকে একলা চলতে শিখতে হয়েছে। পথ যত বন্ধুর, দুস্তর, তিনি হয়েছেন ততই দুর্দম। রণ যত দুর্মদ, বর্মও করেছেন তত দুর্ভেদ। কর্মের হয়েছে তাই প্রসার আর অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিস্তর। ব্যক্তিত্বে বাঁধা পড়েছে সাহস, দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সুকৌশল। চরিত্রের মণিকুঠিরে দয়া, দাক্ষিণ্যে আর ঈশ্বর-প্রীতির কুল-সংস্কার। শিবচন্দ্র যেমন স্বাধীনমনা, তেমনি সৎ-বিবেচক। কর্তব্য-সম্পাদনে যেমন অটল-সংস্থ, দুস্থ সেবায় তেমনি অকুণ্ঠ।

গ্রামের যে লোক যে দায়ে ঠেকেছে তারই দিনে রাতের সহায় হবেন শিবচন্দ্র। ঘর-দোর-বাড়ি বন্ধক রেখেও রাজি সকল মানুষের উপকার করতে। শিব তো যেন সাক্ষাৎ শিবই। যেমন পরস্বার্থী ঠিক তেমনি ক্ষমতাশীলও। আর শিশু দেখলেই শিশু হয়ে যেতেন শিবচন্দ্র। ভোলানাথের মত আত্মভোলা হয়ে থাকতেন শিশুদের সাহচর্যে। কখনো দেখা যেত ঘর ভরা শিশুরা খেলছে, ছুটছুটি করছে, এটা নাড়ছে, ওটা ফেলছে, আর শিবচন্দ্র? যেন ঘরের মালিক নন, ওদেরই একজন। সরল শিশুদের সহচর। রাগ নেই, অদ্ভুত অনুরাগ।

এই শিবচন্দ্র পাত্র নির্বাচিত হলেন মনোমোহিনীর। বারোশ ছিয়াশি সালের তেরই অগ্রহায়ণ শিবচন্দ্রের সাথে বিয়ে হয়ে গেল মনোমোহিনীর। ইষ্টমন্ত্র—জপপরায়ণা ভগবৎ-প্রাণা নয় বছরের বালিকা তখন মনোমোহিনী। লোকসেবা, পারিপার্শ্বিক-সেবা শিবচন্দ্র মনোমোহিনীর ছিল সারাজীবনের ব্রত।

একদিন অতিথি এসেছেন মনোমোহিনীর বাড়িতে। দীর্ঘবপু জটাজুটধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী। বললেন, ভিক্ষা দাও মাগো।

সেবা-স্বভাবা মনোমোহিনী যাকে খাওয়াবে তার শুধু পেট ভরলেই ছাড়বে না, প্রাণ, মন ভরিয়ে তুলবে। যেমন দরদ তেমনি শ্রদ্ধা। সাধুজনে তেমনি ভক্তি।

মনোমোহিনী সযত্নে ভিক্ষা গ্রহণ করাতে সন্ন্যাসী পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হলেন। এবং যাবার সময় বলে গেলেন রিষ্টিনাশ লোকপতি আসবেন এই ঘরে।

বারশো পঁচানব্বই সালের তিরিশে ভাদ্র, শুক্রবার, তালনবমী তিথিতে সকাল সাতটা পাঁচ মিনিটে মনোমোহিনী দেবীর প্রথম সন্তানের জন্ম হয় এবং কালক্রমে বিশ্ববাসী তাঁকেই জানতে পারে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলে।

মনোমোহিনী দেবীর আরো কয়েকটি পুত্র ও কন্যা সন্তান হয়। মধ্যম পুত্র প্রভাসচন্দ্র, কনিষ্ঠ কুমুদরঞ্জন দীর্ঘ জীবন লাভ করে। সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা গুরুপ্রসাদী দেবী বর্তমান।

অতি শৈশবকাল থেকে অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে লোকোত্তর দিব্য চেতনার এক বিশেষ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। নয় মাসে পড়তে অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। মুখে ভাত তুলে দিলেন কাকা। শিবচন্দ্রের মামাতো ভাই গুরুদাস চক্রবর্তী। মুখে পরমান্ন ছোঁয়ানো হলে হাতে টাকা ধরতে দিলেন পুরুতমশাই। শিশু টাকা স্পর্শ করল না। মাটি দেওয়া হল হাত পেতে গ্রহণ করল শিশু। লোকে বললে, এ ছেলে হবে মহাত্যাগী। কাগজ দিলেন এবং তাও নিল আগ্রহ করে। সকলে বললে এ হবে জ্ঞানাধিকারী পণ্ডিত। চাঁদের কলার মত বাড়তে লাগল, অনুকূলচন্দ্রের দেহকলা। শত পূর্ণ-চন্দ্রের জ্যোতি মাখানো ওই দেহে। নরম তুলতুলে সুঠাম তনু। কেউ বলে এ কানাই। কেউ বলে এ নিমাই। সকলের মন কেড়েছে শিশু অনুকূল। সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে ওই শিশু।

এগার মাসেই হাঁটতে শিখেছে অনুকূলচন্দ্র। যতই বড় হয় ততই দুরন্ত হয়ে ওঠে অনুকূলচন্দ্র। বাগানে ঢুকে লংকা চারা বেগুন চারা উপড়ে ফেলে। ও কি হচ্ছে রে? গাছ উপড়ে ফেলছিস যে? জিজ্ঞেস করলে বলে: বারে, দেখব না তলায় কি আছে? বাইরেটা তো দেখতে পাচ্ছি, ভেতরটা দেখব না? ডাল তো দেখছি, মূল দেখব না?

সব ব্যাপারেই তত্ত্ব বার করতে চায়। সব জিনিষেরই গোড়া দেখতে চায়, শেকড়ে পৌঁছাতে চায়। কথা মুখে ফুটতেই আরম্ভ করে কি? কেন? ওটা কি? এমন হল কেন? ও দিয়ে কি হয়? কেন হয়? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে

উত্যক্ত করে তোলে সকলকে। আবার যা-তা একটা উত্তর দিয়ে দিলে কিন্তু ছাড়বে না। জবাবটা ওর মনের মত হওয়া চাই। ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলতে চায়। যতক্ষণ না বুঝবে, ততক্ষণ ছাড়বে না।

মন্দিরে ঢুকে শালগ্রাম বের করে নিয়ে যায়। বাঁশঝাড়ে গিয়ে শুকনো বাঁশপাতা চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখে। চন্দন-প্রলেপ দিয়ে নিজের কপাল চর্চিত করে।

বাড়ির কাছেই থাকেন এক কবিরাজ মশাই। একদিন তিনি একথালা বড়ি বানিয়ে রোদে শুকতে দিয়েছেন। কোথা থেকে অনুকূলচন্দ্র এসে মুঠো ভরে খেতে আরম্ভ করে দিল বড়িগুলো। টের পেয়ে কবিরাজ মশাই ছুটে এলেন। তাঁর চোখ তখন ছানাবড়া। কারণ বড়ি তো গেলই কিন্তু এখন ছেলেকে বাঁচাবেন কি ভাবে? এ যে বিষাক্ত বড়ি। যে ওষুধের একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ, তাই শতাধিক মাত্রায় যে একবারে খেয়ে ফেলেছে এই শিশু। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়লেন কবিরাজ মশাই।

দুরন্ত শিশু মিটমিট করে হাসে, কিছুই হল না তার।

বাড়ির কাছে মুকুন্দ বসুর বাড়ি। তার ভাইপো হেমচন্দ্রের খুব বাগান করবার শখ। অনেক টাকা খরচ করে ফুলের বাগান করেছে একখানা। কাউকে ঢুকতে দেয় না, তালা দিয়ে রাখে গেটে। হঠাৎ একদিন দেখে বাগানের সব গাছ লণ্ড ভণ্ড হয়ে আছে। ফুল-পাতা সব ছেঁড়া, ডাল-পালা সব ভাঙা। গেটে তালা ঠিকই আছে। হেমচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারে না। কোন রকমে জুত করে আনে বাগানটা। সাজিয়ে তোলা হয় আবার। কিন্তু আবার একদিন দেখে একেবারে তছনছ হয়ে আছে। যেমন হল দুঃখ, তেমনি হল রাগ। কে রে, কে এমন কাজ করল? রাগে হুংকার দিয়ে উঠল হেমচন্দ্র।

কেন, কে আবার করবে? আমি করেছি। প্রশ্নের জবাব দিল অনুকূলচন্দ্র। এমন বেয়াদব! দজ্জাল ছেলে! বয়স তো ওই এতটুকু। ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল মার কাছে। অতটুকু ছেলেকে কি আর শাস্তি দেবেন মা। ধমকে ধামকে দিলেন খুব করে। ধমক খেয়ে অনুকূলচন্দ্র হেমকে বললে: তুমি এখানে বাগান করছ কি গো? এখানকার বাগান কয়দিন ভোগ করবে? এখানে তো আর তুমি থাকছ না। এখানে কেন মিছিমিছি জাঁক করছ? অস্থায়ীকে স্থায়ী করবার জন্যে এত মাতামাতি কেন? যা চিরস্থায়ী, মগ্ন হও দেখি তাতে। এখানে থাকা কদিন?

এ বাগান পরে থাকল। অল্প দিনের মধ্যে হেমচন্দ্র চলে গেল ভবপারের বাগান সাজাতে।

বাড়ির কাছে ছেলে হয়েছে একজনের। মা বললেন, 'অনুকূল, চল ওদের ছেলে দেখে আসি।' অনুকূল বললে, 'যে বাঁচবেই মোটে আঠার দিন, তাকে আবার দেখতে যাব কি?' 'ওমা, ওকথা কি বলতে আছে?' বললেন মা। 'কেন, ও এসেছেই যে এই কদিনের জন্তে।' ছেলে মাকে পরিস্কার উত্তর দেয়। ঠিক আঠার দিন পরেই চলে গেল ওদের ছেলে।

অনুকূলচন্দ্র সব বলে ফেলে যে কোন রকম অন্যায়ই করুক না কেন, মিথ্যা বলে না কখনও।

পাঁচ বছর বয়সে সূর্য শাস্ত্রীকে দিয়ে হাতে খড়ি দিলেন শিবচন্দ্র। বর্ণ পরিচয় নিয়ে কাশীপুর হাটতলায় কেষ্ট বৈরাগীর পাঠশালায় পড়তে গেল অনুকূলচন্দ্র। তখন তেরশো সালের শেষের দিক। কেষ্ট বৈরাগীর পাঠশালাই হল অনুকূলচন্দ্রের বিদ্যারম্ভের পীঠভূমি। ও হল এই নতুন বিদ্যাপীঠের প্রথম দলের ছাত্র।

দিন চলে যায় বড় হতে থাকে অনুকূলচন্দ্র। এদিকে কাশীপুর পাঠশালা শেষ করে ভর্তি হয়েছে হাইস্কুলে। নাম পাবনা ইনষ্টিটিউশন। অনুকূলচন্দ্র পড়ছে সেখানে। গুরুজনে শ্রদ্ধা, দীন দুঃখীর প্রতি মমত্ববোধ, অনুসন্ধিৎসা, লোকসেবা, উদার মনোভাব, বন্ধু বাৎসল্য সম-বয়স্কদের নিকট তাকে বরণীয় করে তোলে। বন্ধুরা তাকে রাজা ভাই বলে ডাকত। স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গেল একদিন। সেদিন ছিল অঙ্কের পরীক্ষা। মা বললেন এত দেরীতে যাচ্ছিস, আজ আর তুই অঙ্কের পরীক্ষা মোটেই দিতে পারবি না। স্কুলে এসে দেখা গেল তত দেরী হয়নি। পরীক্ষা দিতে বসে গেল অনুকূলচন্দ্র। কিন্তু খাতা-কলম সামনে নিয়ে বসেই আছে, লিখছে না কিছুই। বসে বসে শুধু কাঁদছে। মাষ্টার মশাই এসে জিজ্ঞাসা করেন, ও কিরে, তুই কাঁদছিস কেন? তোর কি হয়েছে? কিরে পারছিস না একটাও অংক করতে? অনুকূলচন্দ্র উত্তর দেয়, আজ্ঞে পারতাম, কিন্তু এখন আর পারছি না। পারলে যে মার কথা মিথ্যা হয়ে যায়। আমার মা বলেছেন, আজ আমি অংকের পরীক্ষা দিতে পারব না। আমি যদি উত্তর লিখি তবে মা আমার যে মিথ্যাবাদী হন। অদ্ভুত কথা! মাষ্টার মশাইরা সবাই অবাক। পরীক্ষা কিসের? মা-ই সকলের আগে। মায়ের কথা মিথ্যা হতে দেবে কেমন করে?

দরদর করে পা কেটে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণায় কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

অনুকূলচন্দ্র ভাবছে এমন অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে স্কুলে যাবে কেমন করে। মা বললেন দেখি কতটা কেটেছে? মা দেখে বললেন, ও কিছু নয়, বেশী কিছু হয়নি-যা, স্কুলে যা। মা যখন বলছেন তখন সত্যিই কিছু হয়নি। বালক দিব্যি চলল স্কুলে। মার ভাবনা কখন মিথ্যা হয়? মা যেমন ভাবেন অনুকূলচন্দ্রও তেমন ভাবে।

মা সোহাগ করেন, আবার শাসনও করেন। বাঁশের কঞ্চি হাতে পিছু ধাওয়া করেছেন একদিন। ছেলের নামে নালিশ শুনে বিরক্ত হয়েছেন ভীষণ। দুপুরের দারুণ রোদে আগে ছুটছে ছেলে, পিছনে পিছনে মা। রোদে দৌড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন মা আর ঘাম ঝরছে ঝরঝর করে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বড়ই কষ্ট হল বালক অনুকূলচন্দ্রের। মার হাতে এসে ধরা দিল। সে মায়ের কষ্ট সইবে কেমন করে?

স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে এক ময়রার দোকানে রসগোল্লা খেতো অনুকূলচন্দ্র। একদিন খেলো, দুদিন খেলো, শেষে রোজই খেতে ইচ্ছে করে। পকেটে পয়সা তো আর রোজ থাকে না। জোটেও না পয়সা রোজ। বাকির খাতায় অংক উঠে গেল। একদিন আবার বাকিতে রসগোল্লা খেতে গিয়ে ময়রা বললো, অনেক বাকি জমে আছে আগে সেটা শোধ কর। কথা গিয়ে মর্মে বিঁধল বালকের। তাই তো বাকিতে খেয়েছি বলেই না এই কথা শুনতে হল। তক্ষুণি বাড়ি গিয়ে কোন রকমে পয়সা জুটিয়ে ময়রার বাকিটা শোধ করে মনে মনে পণ করল, রসগোল্লা আর খাব না এমন করে। আবার একদিন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দোকানের দিকে নজর পড়তেই মনে পড়ে গেল রসগোল্লার কথা। মন ছুটে গেল ঐ দিকে এবং এগিয়ে গেল এক পা এক পা করে। হাতে আছে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা।

অনুকূলচন্দ্র ভাবে সেদিন না পণ করেছিলাম এমন করে আর রসগোল্লা খাব না। মনকে জিজ্ঞেস করে: কোনটা চাস তুই? লোভ না নির্লোভ? জয় না পরাজয়? আনুগত্য না আধিপত্য? নিজের মনের কাছ থেকে উত্তর পায় বালক অনুকূলচন্দ্র। আমি ক্ষণভংগুর হবনা, সহস্র খণ্ড হব না।

ছুটে পালিয়ে যায় ময়রার দোকানের সামনে থেকে, রাস্তার পাশে অড়র ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ে চেপে ধরল অড়র গাছ এবং মনে মনে ভাবল এবার আর উঠছি না দেখি লোভ কি ভাবে আমাকে নিয়ে যায় রসগোল্লার দোকানে। কিছুক্ষণ এই ভাবে পড়ে থাকবার পরে সত্যিই লোভ দূর হয়ে গেল। ভূত নেমে গেল ঘাড় থেকে যেন। তখন উঠে দৌড়

দিয়ে পদ্মার জলে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিল অনুকূলচন্দ্র। মস্ত একটা দিক পরিস্কার হয়ে গেল। ইন্দ্রিয় জয়ের একটা সাধ্যায় ও সংকেত, একটা মোক্ষম কৌশলের পথ পাওয়া গেল। এই ভাবে নানা রকম অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে বড় হতে লাগল অনুকূলচন্দ্র।

কোন এক সময় শাশুড়ীর সম্পত্তি দেখতে এসে শেষ পর্যন্ত ঠিকাদারি ছেড়ে দিতে হয়েছিল শিবচন্দ্রকে। নিজের অর্থ-সম্পদ যা কিছু ছিল সবই ব্যয় করেছেন সম্পত্তি উদ্ধারের কাজে। শাশুড়ীর জমি-জমা তাও সব উদ্ধার হয়নি। সংসার চলাচলের পথই এক রকম বন্ধ। তাতে শিবচন্দ্র এখন অসুস্থ, শয্যাগত। নৈরাশ্যে মুষড়ে পড়েছেন মনোমোহিনী দেবী। একি! মায়ের এই মুখ! না মা তোমার ভয় নেই, বলে অনুকূলচন্দ্র। মা বলেন ভয় নেই? রুগ্ন তোমার বাবা শয্যাশায়ী। উপার্জন নেই। চিকিৎসা চলে না, পথ্য বন্ধ হয় হয়, কি দিয়ে কি হবে? না মা, ভয় কিসের আমি তো আছি। এত দুঃখেও মা হেসে ফেলেন। এতটুকু ছেলে বলছে কি? তোমার ভয় নেই, আমি তো আছি। ওরে, পয়সা না হলে ওষুধ দেবে কে? পথ্য আসবে কি করে? কেন, এক কাজ কর না মা, তুমি মুড়ি ভাজ আমি বেচি। খুব করে ভাজ আর আমি খুব করে বেচি। ওষুধ তো ওষুধ অনেক টাকা জমিয়ে দেব তোমায়।

অতটুকু ছেলে, আড়াই, তিন মাইল পথ হেঁটে যায় পাবনা শহর। আবার হেঁটে ফিরে আসে বাবার ওষুধ নিয়ে। রোদ বৃষ্টি কিছুই মানে না।

হিমায়েতপুরে বাড়ির চারদিকে ভাঁটের বন। একদিন ভাবলে, এত ভাঁটের গাছ, এর কোনো গুণ নেই? আচ্ছা, দেখা যাক না একটু পরীক্ষা করে। একটা ভাঁট গাছের ডগা ভেঙ্গে চিবিয়ে খেলো পাতা-সমেত। একটু পরেই অনুকূলচন্দ্রের আরম্ভ হল দারুণ পেট ব্যথা আর গা বমি-বমি। অভিজ্ঞতার খাতায় টুকে রাখল ভাঁট-পাতার ভেষজ-তত্ত্ব। একদিন এক বন্ধুর পেট ব্যথা হয়েছে ভীষণ। সে অনুকূলচন্দ্রকে বললে, ভাই, পেটটা বড্ড ব্যথা করছে আর গা-টা কেমন বমি-বমি করছে। ব্যাস মিলে গেল নিজের অভিজ্ঞতার সাথে। অমনি বললে, দাঁড়া, ওষুধ দিচ্ছি আমি।—তুই ওষুধ জানিস?

হ্যাঁ তুই দেখনা। তোর ভাল হলেই তো হল।

তখনি গিয়ে কতকগুলো ভাঁটপাতা এনে চিপে রস বার করলে খানিকটা। একটু জলের সাথে মিশিয়ে দিয়ে বললে, নে ওষুধ ধর, খেয়ে ফেল।

অবাক হয়ে ভাঁটপাতার রস খেয়ে ফেলল বন্ধুটি। খেয়ে তার পেট ব্যথা ও বমি ভাব কমে গেল বার আম্মা। অনুকূলচন্দ্র বললে দেখ, ওটা খেয়ে

একদিন পেট ব্যথা হয়েছিল আমার। সত্যিই তো, যাতে পেট ব্যথা হয়েছিল, তাতেই পেট ব্যথা সারল। হোমিওপ্যাথির মূলসূত্র ধরা পড়ে গেল বালকের কাছে।

একদিন অনুকূলচন্দ্রের মনে হল দোয়াত-কলম নিয়ে স্কুলে যাওয়া বড় ঝঞ্ঝাট। কাজটা কেমন করে সহজ করা যায়?

একটা খাগের নলে কালি ভরে তাতে শক্ত করে নিব লাগাল। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখা গেল কালি সরে না। বুদ্ধি এলো মাথায়। উপরের বন্ধ মুখটায় আলপিন দিয়ে একটা ছিদ্র করে দিল এবং দিব্যি লেখা হতে লাগল।

বাড়ির কাছে ষ্টিমার ঘাট। কুলিরা মাল টানছে ষ্টীমার-ঘাটে। অনুকূল চন্দ্রর মনে হল আচ্ছা কুলিরা কেমন করে মাল টানে। ঘাড়ে ব্যথা হয় না ওদের? জানতে ইচ্ছা হয়েছে। আর দেরী নয়। তখুনি চলে গেল ষ্টিমার ঘাটে। যে কুলি পাচ্ছে না তার কাছে গিয়ে বলে বসে, দাও আমার মাথায় মাল চাপিয়ে দাও আমি নিয়ে যাচ্ছি। মাল দিয়েই দে দৌড়, বাবু পয়সা বার করবার আগেই। কখনো এক একটা ভারি বোঝা পড়ত মাথায়। বয়ে নিয়ে যাবার সময় মনে হত ঘাড়টা যেন শরীরের মধ্যি সিঁধুচ্ছে। গা ঘেমে নেয়ে যেত। অল্প বয়সের ছেলে বলে কি কেউ দয়া করবে? কুলি যখন তখন ও টানবেই। একদিন এক মশাইয়ের গাটরি তুলে দিতে গিয়ে খানিকটা ঘি পড়ে গেল। মশাইটি নিজের দোষ দেখল না, বেশ দু কথা শুনিয়েছিল বালককে। কুলি-জীবনের স্বাদ পেয়ে নিল অনুকূলচন্দ্র।

মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াদণ্ডধারী ব্রহ্মচারী হয়েছে অনুকূলচন্দ্র। পৈতে হয়েছে। একে সোনার মত দেহের রং। তার ওপর গৈরিক আস্তরণ। সে ঘর আলো করা মন আলো করা রূপ। সোনার জালে বাঁধা চাঁদের চাঙড়। বয়স তখন এগার বছর। বাড়ন্ত দেহে ফুটেছে কমনীয়তার রুচি। কৈশোর তারল্যে পৌরুষের কাঠিন্য। যাকে বলা যায় মেঘ মেদুর আকাশে স্থির প্রকাশ বিদ্যুৎ। গড়ন-পেটন গোলগাল। কিন্তু নাতিস্থূল, বলিষ্ঠ। অথচ কোমল। সেই কমল-কোমলতায় আবার অমল জ্যোতির দিক্ রাঙানো রঞ্জন। সে জ্যোতিতেই ঘর আলো, মন আলো। দৃষ্টি গম্ভীর কিন্তু দৃষ্টিপাত অতি মৃদু। তত্ত্বদর্শনে তীক্ষ্ণ। বদন প্রীতিপূর্ণ, স্নেহল। চলন দ্রুত, অথচ গাম্ভীর্যময়। এ এক দৈব মাধুর্যের সমাবেশ, স্বর্গ সুষমায় ভরা। যে দেখেছে, সেই জেনেছে। নয়ন মজেছে, মজেছে মনও।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গান-বাজনার ভারি সখ। গানের গন্ধ পেলেই প্রাণ মাতাল হয়ে ওঠে অনুকূলচন্দ্রের। গীত বাদ্যের মধু-প্রলোভন মন-অলিকে নাচিয়ে তোলে। ছুটির দিন পেলেই সেদিন গান-বাজনার আসর বসায়। কোনো-কোনো দিন আবার পালা গাওয়া হয়! অনুকূলচন্দ্রের যেমন মিষ্টি গলা, তেমনি সুন্দর স্বর। নাটক লিখে দেবে সে, গান লিখে দেবে সে। আবার মুখ্য ভূমিকায় অভিনয়ও করবে সে। অন্যদের পার্ট শেখাবে কে? সেও অনুকূলচন্দ্র। স্কুলে যখন মোটে ফোর্থ ক্লাশের ছাত্র তখন লিখে ফেলল দেবযানী নাটক। অমিত্র গৈরিশ-ছন্দে লেখা। দেবযানী শুনে বেশ সোরগোল পরে গেল চারদিকে।

টেষ্ট-পরীক্ষার পর এনট্রান্স পরীক্ষার জন্যে নির্বাচিত হল অনুকূলচন্দ্র। বাবার কাছ থেকে ফি-এর টাকা পেল। কিন্তু জানতে পারল ফি-এর টাকার অভাবে একজন সহপাঠীর পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারই মত অস্থির হয়ে উঠল অনুকূলচন্দ্রের মন। ফি-এর টাকা জমা দিয়ে এল বন্ধুর নামে। সতীর্থকে বলে দিল—ঘাবড়াসনা তোর ফি-এর টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার জন্যে এখন তৈরী হ। ছেলেটি পরীক্ষা দিয়ে পাস করে গেল। আর অনুকূলচন্দ্রের এণ্ট্রান্স পড়ার ইতি হল।

পিতামাতার ইচ্ছায় সতের বছর বয়সে, বাং ১৩১৩ সালের ২৮শে শ্রাবণ তারিখে পাবনা শহর নিবাসী ধোপাদহ গ্রামের রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা একাদশ বর্ষীয়া সরসীবালা দেবীর সহিত অনুকূলচন্দ্রের শুভ পরিণয় হয়। সরসীবালা দেবীর মাতার নাম ত্রিনয়নী দেবী। সরসীবালার স্বামী-ভক্তি, তৎসহ নিষ্ঠা, সেবা, প্রেরণা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রতিটি নারীরই অনুকরণীয়।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হল না। কিন্তু একটা তো করতে হবে। বাবা বললেন, ডাক্তারী পড়লে মন্দ হয় না। বাবার কথামত কলকাতায় এলো অনুকূলচন্দ্র। বউবাজার শরৎ মল্লিক ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে গিয়ে বললে, আমকে ভর্তি করে নিন। আমি ডাক্তারি পড়ব।

কতদূর পড়েছ? প্রশ্ন করেন কর্তৃপক্ষ।

আজ্ঞে এণ্ট্রান্স অবধি পড়েছি। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

কিন্তু আজকাল তো এণ্ট্রান্স পাশ না হলে ভর্তি করা হয় না। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন অনুকূলচন্দ্রকে।

আমি যে এনট্রান্সের পড়া সব শিখেছি। স্যার, শুধু পরীক্ষাটা দিতে পারিনি।

তুমি যে বলছ আমরা তা জানব কেমন করে ?

তবে আমার পরীক্ষা নিন। অনুকূলচন্দ্র নাছোড়।

কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। এ্যাডমিশন-টেষ্ট হল। বেশ শক্ত শক্ত প্রশ্ন দেওয়া হল তাতে। কর্তৃপক্ষকে খুশী করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল অনুকূলচন্দ্র। ভর্তি হয়ে গেল ডাক্তারি পড়তে।

ওদের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় অনেকগুলো টাকা ধার নিয়েছিল বাবার কাছ থেকে। শিবচন্দ্র এবার তাকে বললেন, টাকাটা এবার কিছু কিছু করে শুধতে হয়, নইলে ছেলেকে পড়ানো হয় না। ঠিক হল ভদ্রলোক মাসে দশ টাকা করে শোধ করবেন। টাকা প্রতিমাসে কলকাতায় অনুকূলচন্দ্রকে দিয়ে দেবেন। মাসিক দশ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গ্রে-স্ট্রীটের কয়লার-গদীতে এসে উঠল অনুকূলচন্দ্র। যোগেন ভট্টাচার্যের কয়লার গুদামে কয়লার গাদার পাশে বেচাকেনার একটা ছোট ঘর। সেরেস্তা ঘরে ফরাশের পাশে অনুকূলচন্দ্রের মাথা গুঁজবার জন্যে ছোট্ট একফালি জায়গা। সারাদিন কয়লা চালা-বাছা হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা কয়লার গুড়ো উড়ছে। জামাকাপড় একদিনেই কালো হয়ে যায়। পয়সা কোথায় যে রোজ পরিস্কার করবে ? ঐ দশ টাকার মধ্যে খাওয়া পরা সব। ওরই মধ্যে কাগজ, কলম, কালি, পেন্সিল। পায়ের জুতোয় তালি পড়েছে গণ্ডা কয়। তলক্ষয় হতে হতে সুকতলা ছিড়ল। তার পর একবারে নগ্নপদ। মাথাতেও একটু তেল জোটে না সব দিন। ক্লাশে মাষ্টার মশাই একদিন ধমকে ছিলেন অতি ময়লা পোশাক পরে ক্লাশে এস না। লজ্জায় মাথা কাটা গেল অনুকূলচন্দ্রের। এদিকে গ্রে স্ট্রীট থেকে বউবাজার রোজ পড়তে যেতে হয় হেঁটে। স্কুলে ডিসেক্‌শনের ব্যবস্থা নেই। ডিসেক্‌শনের দিন যেতে হয় মুরারী পুকুরে। তামাম কলকাতার যেখানেই যায়, পদব্রজে। কোথায় বউবাজার আর কোথায় গ্রে স্ট্রীট। তার উপর রাত্রে ওয়ার্ড ডিউটি। খাওয়া জুটুক বা নাই জুটুক কাজ চালিয়ে যায় নিয়মিত। কোন কোন দিন এলিয়ে পরে শরীর। পা যেন চলতে চায় না। মাথা ঝিম ঝিম করে দুর্বলতায়। মনকে জিজ্ঞাসা করে, ওকি, কষ্ট হচ্ছে নাকি ? সহ্য বাড়াও, কষ্ট কম হবে। অবস্থাকে ভয় না করে আয়ত্ত কর। বাধাকে বিঘ্ন বলে মনে কর না। বাধাই তো গতির পরিমাপ। কত দিন কেটেছে পয়সার অভাবে রাস্তার কলের জল খেয়ে এবং খিদের জ্বালায় পেট ব্যথায় ছটফট করে। এর মধ্যেও প্রার্থীকে ফেরাতে পারে না কোনদিন। বিমুখ করে না কাউকে। যতক্ষণ কানাকড়িটি আছে ততক্ষণ দেবে। নেই বলতে পারে না। দেব না বলে না কোনদিন

কাউকে। নিজের না থাকলে ভিক্ষার্থী হয় অপরকে সাহায্যের জন্তে। মন প্রাণ উজার করে ভালবাসে সকলকে।

গ্রে ষ্ট্রীট—শোভাবাজারের মোড়ে ডাঃ হেমেন্ত চাটুজ্জের হোমিওপ্যাথি ডিস্পেন্সারি ছিল। হেমন্তবাবু খুব ভালোবাসেন অনুকূলচন্দ্রকে। বললেন বাপু, এক কাজ কর। তোমাকে কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর একখানা বই দিই। বই পড়ে শিখে নিয়ে আশে পাশে কিছু কিছু ওষুধ দিতে থাক। তাতে দু'চার পয়সা হবে বলে মনে হয়।

পয়সার কথা নয়, অন্ত কথা ভেবে প্রচুর উৎসাহ পেল অনুকূলচন্দ্র। একটা নতুন জিনিষ শেখা যাবে। মহেশ ভট্টাচার্যের একখানা পারিবারিক চিকিৎসা ও কিছু ওষুধ দিয়ে দিলেন হেমন্তবাবু। এখন তাই নিয়েই লেগে গেল অনুকূলচন্দ্র। এলোপ্যাথি পড়তে পড়তে অবসর সময়ে হোমিওপ্যাথি করে। বই পড়ে ও ওষুধ দেয়। শেষে বই না পড়েই দিতে থাকে। রুগী দেখলেই ওষুধের কথা মনে আসে।

এক-একটা রুগী এক একটা ওষুধ, রুগীর অধিকাংশই হল কয়লা ডিপোর গরিব কুলিরা। কয়লার পাশেই মিছরির কারখানা। সেখান থেকে মজুররাও এসে জুটল। ওরা কি শুধু ওষুধই পায়? পেয়েছে নির্বিশেষে ভালবাসা। পেয়েছে সেবা, পেয়েছে আত্মীয়তা। অনুকূলচন্দ্র এদের ওষুধ তো দেয়ই, মাঝে মাঝে কিছু পয়সা জমিয়ে টুকিটাকি জামাটা কাপড়টা কিনে দেয় ওদের ছেলে-মেয়েদের জন্তেও। ওষুধের জন্ত পয়সা নেয় না তবুও তারা দেবেই। দাদাঠাকুর এই পয়সা ক'টা নাও। নিতে চায় না অনুকূলচন্দ্র। পয়সা নিলে চলবে কি করে তোমাদের। কিন্তু ওরাও ছাড়ে না, বলবে ও ওষুধ যে রেখেছ আমাদের জন্তে তা ফুরিয়ে গেলে পাবে কোথায়? তুমি ওষুধ কিনবে কেমন করে? ওরা জেনেছে এ ওদেরই জিনিষ। ওদের জিনিষকে ওরা বাড়িয়ে তুলতে চায়। ওষুধ পত্রও ওদের, দাদাঠাকুরও ওদের।

অনুকূলচন্দ্র যখন ছুটিতে বাড়ি যায় তখন দল বেঁধে ওরা আসে ষ্টেশনে তুলে দিতে। কবে ফিরবে জেনে নিয়ে সকলে হাজির হয় সেদিন। কবে দাদাঠাকুরের ছুটি ফুরোবে তার দিন গুণতে থাকে ওরা। অনুকূলচন্দ্রকে না হলে যেন চলে না কুলিদের। জীবনের যেন মূল্যবান অংশ ও। ঐ পরার্থী আত্মভোলা যুবকটি। প্রেম-প্রীতির খনি নয়ন-মণি মনের মানুষটি।

ডাক্তারি পাশ করে অনুকূলচন্দ্র যখন হিমায়েতপুরে ফিরে এলেন বয়স তখন পঁচিশ বছর। সরকার সাহেবের অনুমতি পেয়ে মা মনোমোহিনী দেবী দীক্ষা

দিলেন অনুকূলচন্দ্রকে। পরমসন্ত সরকার সাহেবের আসল নাম ছিল কামতা প্রসাদ সিংহ। তাঁর জন্ম শাহাবাদের অন্তর্গত মুরার গ্রামে (১২ই ডিসেম্বর, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে)। সরকার হল ওদিকার খুব সম্মানের উপাধি। মনোমোহিনী দেবী বিবাহের পূর্বেই আগ্রা সৎসঙ্গের তৎকালীন সন্ত সদ্‌গুরু হুজুর মহারাজের নিকট থেকে স্বপ্ন যোগে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

কানে নাম ঢুকতেই বাহ্যজ্ঞান হারান অনুকূলচন্দ্র। নামের সঙ্গে সঙ্গত করে নামী উঠে গেল নিত্য নামের দিব্য ধামে। স্থান-কালের অতীত হয়ে গেল মন। চিরন্তনেব অন্তরীক্ষে গিয়ে বন্ধবিহীন হল দৃষ্টি।

দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হল, এবার ডাক্তারি করার পালা। অনুকূলচন্দ্র ডাক্তারি করতে গেলেন। বাড়ি থেকে তিনপোটাক রাস্তা হবে ডিসপেনসারি। বেশ রুগী আসতে লাগল। রুগীরা শুধু ওষুধই পেল না, পেল ভালবাসা আর ভরসাও। রুগীর কাছে গিয়ে বসে থাকেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন অনুকূলচন্দ্র। মিষ্টি কথা বলে রুগীর খবর নেন। কঠিন রোগ হলে একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কাছ থেকে উঠে আসেন না। সবাই ভাবে, এ কেমন ডাক্তার! এ তো ভিজিটের জন্য রুগী দেখে না। রোগ সারাবার জন্যেই শুধু রুগী দেখে। রুগীর কষ্টটা নিজের কষ্ট বলে মনে করে, রোগ সারানো চাই, যেমন করেই হোক সুস্থ করা চাই রুগীকে।

চারিদিকে রটে গেল, নতুন ডাক্তার যে রুগীকে হাতে নেয় তাকেই সারায়। তার হাতে রুগী নষ্ট হয় না। অনুকূল ডাক্তার এসেছে শুনলেই রুগী আশ্বস্ত হয়। রোগ-যন্ত্রণা অর্ধেক কমে যায়। দশগ্রামের ডাক্তার হয়ে উঠলেন অনুকূলচন্দ্র।

একদিন কাশীপুরের রাস্তা দিয়ে রুগী দেখতে যাচ্ছেন। রাস্তায় দেখলেন, ধামা মাথায় নিয়ে একজন মুসলমান পাবনার বাজার থেকে বাড়ি ফিরছে। হাতে ঝুলছে ছোট ছোট কতকগুলো বোয়াল মাছ। লোকটাকে দেখেই অমনি হোমিওপ্যাথির ভিরেট্রাম এলবাম-এর কথা মনে পরে গেল। ভিরেট্রামের লক্ষণগুলো যেন ওকে তেড়ে এসে ধরেছে। লোকটাকে ডেকে বললেন, ভাই তুমি এই মাছ খেয়ো না। তোমার পেটের অসুখ করবে। লোকটা তো খাপ্পা হয়ে গেল। বলে গেল, ওতে পরোয়া করি না, খোদা যখন পয়দা করেছেন একদিন মরতেই তবে।

রুগী দেখে বাড়ি এসেছেন। কিছুক্ষণ পরে কল্‌ দিতে এল একটি লোক। বললে, দয়া করে চলুন ডাক্তারবাবু, আপনি যা বলেছিলেন তাই হয়েছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অনুকূলচন্দ্র। কার কি হল ?

ঐ যে বাজার থেকে মাছ আনছিল রাস্তায় আপনার সাথে দেখা হয়েছিল।

বড্ড পায়খানা আর বমি হচ্ছে. একবার চলুন।

রুগী দেখতে বেরুলেন অনুকূলচন্দ্র। রুগী দেখে সেই ভিরেট্রাম এলবাম ৩০ দিয়ে এলেন খেতে। তাতেই রুগী সেরে উঠল। আর ওষুধ লাগল না। লোকটি বলতে লাগল। অনুকূলবাবুর দাওয়াই তো নয়, মন্তর। ও ডাক্তার নয়, পীর। সব গাঁয়ের লোকেরই এক কথা। এ বড় অদ্ভুত চিকিৎসক। অদ্ভুত এঁর মানবগতপ্রাণ।

ডাক্তারি করেন এদিকে নামে বিভোর। ডাক্তারখানায় বসে নাম করছেন।

নাম করতে করতে করতে রুগী দেখছেন। দিনরাত সব সময় নাম করতেন। শুধু নামই নয়, নামের সাথে দর্শন, অনুভূতি।

একদিন ভাবলেন দেহের জন্যে তো ডাক্তার আছেই, মনোরোগের ডাক্তার চাই। মনকে আরোগ্য করতে হলে মনকে আগে মাতানো চাই। হরি কীর্তনের নেশা লাগিয়ে মনকে আগে মাতাতে হবে। ডাক্তারি করা প্রায় ঘুচে গেল। ডিস্‌পেনসারিতে অনন্তনাথ থাকেন।

এল কীর্তনের যুগ। তাঁর জীবনের এই তীব্র ভাবোন্মাদনাময় অধ্যায়ে যাঁরা তাঁর সাথী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয় হলেন—কিশোরীমোহন দাস, অনন্তনাথ রায়, দুর্গানাথ সান্যাল, নফর ঘোষ, কোকন, বুণে প্রভৃতি। ক্রমে ক্রমে এই কীর্তনে যোগদান করেন প্রভুপাদ অদ্বৈত বংশের সতীশচন্দ্র গোস্বামী, সুশীলচন্দ্র বসু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। সেই অপূর্ব্ব কীর্তনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। দীর্ঘ গৌরবর্ণ, সুঠাম তনু, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু, কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশদাম, প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে প্রকটিত বরাভয়. শুভ্র উপবীত ও বসন পরিহিত অনুকূলচন্দ্রের সপার্ষদ সে কীর্তন যে দেখেছে সে ধন্য। এই সময় থেকে হিন্দু, মুসলমান সকলেই অনুকূলচন্দ্রকে শ্রীশ্রী ঠাকুর আখ্যায় আখ্যায়িত করে।

যে কলেজে অনুকূলচন্দ্র ডাক্তারী পড়তেন সেই কলেজেরই জনৈক অধ্যাপক ডাঃ শশীভূষণ মিত্র পরবর্তীকালে তাঁর এই ছাত্রটির মধ্যে ঐশ্বরিক বিভূতির অভিব্যক্তি দেখে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন।

যৌবন কালে অনুকূলচন্দ্র সত্যনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কীর্তনের দল নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা শহর ও গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ঐসকল অঞ্চলের

মধ্যে—কলকাতা, বরাহনগর, ২৪ পরগণা, মজিলপুর, চক্রতীর্থ, পাবনা ও পাবনার নিকট দোগাছী, সালগেরে, কাশীপুর, নাজিপুর, প্রতাপপুর, নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া, সদাপুর, বাবাদি, বরৈচরা, দুধকুমড়া, খোকসা, জানিপুর ধলহরাচন্দ্র, কমলাপুর। রংপুর শহরে—রংপুর, বদরগঞ্জ, গোদাগারী ঘাট, ফরিদপুরে—ফরিদপুর শহর; যশোহরের অন্তর্গত হরিনাকুণ্ডু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। একবার তিনি কীর্তনের দল নিয়ে পুরীধাম, কটক, সাক্ষী-গোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে নাম বিতরণ করেন। কীর্তনের দল সহ কার্সিয়াং এও কিছুকাল ছিলেন এবং নাম প্রচার করেছেন। ভক্তবৃন্দ পরি-বৃত্ত হয়ে অনুকূলচন্দ্রের তুমুল কীর্তনে সর্ব্বত্রই শ্রোতারা মেতে উঠত। সমবেত জনতা তাঁর প্রাণ মাতানো কীর্তনে ও মধুর নর্তনে মুগ্ধ হত। এবং তাঁর অভূতপূর্ব্ব ভাব সমাধি দর্শনে ও ভাববাণী শ্রবণে বিস্মিত হত। তাঁর অলৌ-কিক ঐশী প্রেরণা ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হত সকলে। ভক্তিবিগলিত চিত্তে শ্রীপদে আত্মসমর্পণ দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগল শতশত মানুষ। তাঁর কাছে কোন ধর্মের ভেদ ছিল না। সব ধর্মের মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, বা অন্য যে কোন ধর্মের কোন প্রভেদ ছিল না তাঁর কাছে। কীর্তন চলার সময় মাঝে মাঝে অনুকূলচন্দ্রের ভাবসমাধি হত। এই অবস্থায় দেহ কখনও হয়ে উঠত প্রচণ্ড উত্তপ্ত, কখন বা তুহীন শীতল। তিনি তখন ভাবসমাধিতে বিলীন হয়ে যেতেন। প্রায়শঃই দেহে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হত না। তখন বহু বিচিত্র আসন অবলীলাক্রমে অথচ দ্রুতবেগে সংঘটিত হয়ে চলত। এই অবস্থায় পদ্মাসন, কূর্মাসন, ময়ূরাসন, রাজা-সন, ইত্যাদি জ্ঞাত অজ্ঞাত কত রকমের কত অদ্ভুত আসনই যে হত তার ইয়ত্তা নেই। কখনও দেহ অনেকটা উর্দ্ধে ভূমিতে পতিত হত। দেহের রোমকূপ থেকে রক্ত নির্গত হত। ক্রমে ক্রমে সমস্ত স্পন্দন বন্ধ হয়ে দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পেত। কিন্তু তখন তাঁর বদনমণ্ডল বিস্ফারিত ও জ্যোতিবিভাসিত হয়ে উঠত এবং শ্রীমুখ থেকে অনর্গল নির্গত হয়ে চলত বিশ্বরহস্য, সাধন-ভজন, ঐশী স্বরূপ আখ্যান সম্বন্ধীয় অজস্র বাণী। এর মধ্যে উপস্থিত ভক্তজনেব অনেক দুরূহ প্রশ্নের উত্তরও থাকত। এই বাণীগুলি বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় নির্গত হত। তার মধ্যে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার বাণীগুলি পাবনা শহরের ব্যবহারজীবী বৃন্দাবন অধিকারীর পরামর্শ অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হতে থাকে। এবং সেগুলি 'পুণ্যপুঁথি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কীর্তন কালে নৃত্যপরায়ণ অবস্থায় অনুকূলচন্দ্র অনেক সময় সংজ্ঞাহারা হয়ে যেতেন। তাঁর অবশ তনু নিষ্প্রাণবৎ নিশ্চল হয়ে মাটিতে পরে যেত। নানা বিচিত্র ছন্দে শরীর কেঁপে উঠত। কখন শরীর বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হয়ে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যেত। কখন তীর ভূমিতে সদ্য উৎক্ষিপ্ত মাছের মত তাঁর শরীরটি ছটফট করত। দিব্য দেহখানি মাটির উপর শবের ন্যায় স্থিরভাবে পরে থাকত। দেখতে দেখতে তাঁর শরীরের নিম্নভাগ হতে সর্বাঙ্গ অসাড়, নিথর ও হিম-শীতল হয়ে যেত। এই অবস্থায় অভিজ্ঞ ডাক্তার অতিশয় নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ আছে।

ভাবাবস্থায় সন্দেহশীল দুষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে নির্দয় নির্যাতন করতে ও পরীক্ষা করতে ছাড়ত না। কেউ তাঁর দেহে সজোরে চিমটি কাটত, কেউ তাঁর আঙুলের অগ্রভাগে সূঁচবিদ্ধ করত। কেউ তাঁর কোমল অঙ্গে জলন্ত কয়লা চেপে ধরত। তাতে মাংস, চামড়া পুড়ে দুর্গন্ধ বের হলেও কিছুতেই অনুকূলচন্দ্রের দেহে প্রাণের পরিচয় অণুমাত্র প্রকাশ হত না। তাঁহার এইরূপ মৃতবৎ চরম অবস্থা দেখে আপনজনেরা শোকাকুল হয়ে পড়তেন। ভয়াবহ অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে জননী মনোমোহিনী দেবী এক সময় অনুকূলচন্দ্রকে সস্নেহে অনুযোগের সুরে এই মহাভাব সংবরণ করতে বলেন এবং মাতৃবৎসল অনুকূলচন্দ্র নিজ ইচ্ছা শক্তিতে এই মহাভাব আয়ত্তে আনেন এবং পরে তা চিরতরে বন্ধ করেন।

অনুকূল তো অনুকূলই। সকলের কাছেই অনুকূলের বিগ্রহ। সকলের কাছেই পরিপূর্ণ মধুভাণ্ড। জীবনের অনুকূল হয়ে হাজির হয়েছেন সর্বজীবের সম্মুখে। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে যাচ্ছেন। কোন বাছ-বিচার নেই, কোন শ্রেণী বিভাগ নেই। সবাইকে বাঁচাতে হবে, বাড়াতে হবে। সবাইকে নিয়ে যেতে হবে সম্পূর্ণতার স্বর্গালোকে। প্রত্যেককে পূরিত করবার যজ্ঞ তাঁর। আগে ভিতরে ঢোকা, তারপর ভরিয়ে তোলা। তাই যেখানে লোক সেখানেই তাঁর আলোক, সেখানেই তাঁর অন্তর্দ্যুতি। তিনি হলেন সকল পথের পথপ্রদর্শক। যাদের যে গান প্রিয়, সেই গানই করছেন তাদের দলে এসে। কালী ভজলেও হল, কেষ্ট ভজলেও হল। মোটের ওপর ঈশ্বর ভজো। ঈশ্বর কীর্তন কর।

নিজের তৈরী গান। গান করেন আর হাততালি দেন। আবার কখনও গাইছেন:

আমি বেদ বিধি ছাড়ি বেহ্মাহারি
হরিনাম সদা গাই রে।
হয় হোক মম লক্ষ জনম
তাহে কোন ক্ষতি নাই রে ॥

যেমন মধুর কণ্ঠ তেমনি অপূর্ব্ব সুর। গাইতে গাইতে পাগল প্রায় হয়ে পড়েন। ঐ এক নামামৃত ছাড়া আর বোঝেন না।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি কত আশা করে বসে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।

রজনীকান্তের এই গানটি প্রায়ই গাইতেন অনুকূলচন্দ্র। কিন্তু "পাব জীবনে না হয় মরণে" কিছুতেই বলতে পারতেন না। একটু শুধরে নিয়ে বলতেন, "পাব জীবনে গো এই জীবনে"। অনেকে সংসার বৈরাগ্যের কথা বলে। বিষয় তৃষ্ণার নিন্দা করে, ছাড়বে বলে ভয় দেখায়, কিন্তু ছাড়তে পারে না। বলে দাঁড়াও না, যেদিন সংসার ছেড়ে যাব আর ফিরব না। কিন্তু যে সত্যি সত্যি ছাড়বার লোক সে বলে, কেমন করে সংসার ছাড়ে এই স্যাখ। স্নান করতে গামছা কাঁধে নিয়েছিল, সেই গামছা কাঁধেই বেরিয়ে যায়, আর ফেরে না।

রাজা যখন রাজমহলে থাকেন তখন তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। রাস্তায় যখন আসেন তখন ভিখারী পর্যন্ত দেখে।

ঈশ্বর দর্শনও তাই। তিনি যখন রূপমূর্ত হন, মানুষের মধ্যে আসেন মানুষ হয়ে, তখনই তিনি দৃশ্য। তখন দেখবার জন্যে চোখ খুললেই ব্যাস, দেবদুর্লভ দর্শন। তখন দেখবার জন্যে সাধনার দরকার নেই, সাধনা তাঁকে পাওয়ার জন্যে। তনুমন দিয়ে তাঁর হবার জন্যে। আর করা ছাড়া কিছুই করতলগত হয় না আমাদের।

সতীশ জোয়ারদারের মনে প্রসন্নতা এসেছে। ভরসার উষালোক দেখতে পেয়েছে চোখে। কিন্তু আর একটি গ্রন্থি এখনও বাকি।

আমার যে গুরু আছে, গুরু ত্যাগ করব কেমন করে ?

মনের এই কথা নিবেদন করলেন ঠাকুরের কাছে (তখন সবাই ঠাকুর বলে ডাকে তাদের প্রাণের অনুকূলচন্দ্রকে)। ঠাকুর বললেন—গুরু ত্যাগ আবার কি কথা ? গুরু কখনও ত্যাগ হয় ? সব গুরুই শিক্ষাদাতা, উপেক্ষা করা চলে না কাউকে। তবে গুরু থেকে গুরুতর, গুরুতর থেকে গুরুতম। সাচ্চা

করতে হবে সেই জগদ্‌গুরুকে। কুলগুরু তো অনুপেক্ষণীয়ই, কিন্তু পেতে হবে যে সেই কুলমালিককে। গুরুকরণের কি তাই শেষ আছে? অসিদ্ধির সিদ্ধি এই গুরুকরণ। যতক্ষণ পরম গুরুকে না পাচ্ছি ততক্ষণ গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর বললেন, দেখুন দাদা, আমি কারও গুরুও হতে চাই না, আর কাউকে আমার শিষ্যত্বও গ্রহণ করতে হতে বলি না। যা সাচ্চা সত্যি বলে দেখি—বুঝি, বন্ধু ভাবে তা সবাইকে বলি।

সতীশ জোয়ারদার বুঝলেন কথাটি এবং স্ব ইচ্ছায় আবার দীক্ষা গ্রহণ করেন।

যাই হোক দীর্ঘকাল ধরে কীর্তন ও সদালোচনার মাধ্যমে নাম প্রচারের ফলে এক সময় বাংলার যত বাজার-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, পল্লী ও শহরাঞ্চল এবং বাংলার বাইরে বহু স্থানে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অপূর্ব অমিয় কথা লোক মুখে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হল। বহু স্থান থেকে আর্ত নরনারী দলে দলে তাদের তাপিত প্রাণ শীতল করতে তাঁর শ্রীচরণে এসে স্থান লাভ করে। আত্মীয়, অনাত্মীয়, স্বদেশী, বিদেশী সকলেই তাঁর সংস্পর্শে এসে ধন্য হল। দেখতে দেখতে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, সত্যান্বেষি শত শত আর্ত, ব্যথিত ও জিজ্ঞাসুর সমাগমে তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীভবন আনন্দে কোলাহলময় হয়ে উঠল। মিলন হল সর্ব ধর্মের এক ধর্মে তা হল বাঁচা বাড়ার ধর্ম।

সমাগত শরণার্থী সবাইকে ঠাকুর অবারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করলেন। তাঁহার জ্ঞানের আলোকে কত জনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল, তাঁর প্রাণের পরশে কত প্রাণ সঞ্জীবিত হল। বৈজ্ঞানিক এসে পেল নূতন তথ্য। দার্শনিক দর্শনের দর্শন লাভ করল। শিক্ষিত এসে জানল শিক্ষার মূলতত্ত্ব। সাহিত্যিক তাঁর নিকট আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টির নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হল। প্রবীণ সমাজসেবী তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। এই ভাবে বহু লোক ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অপূর্ব জ্ঞান, কর্ম-প্রেরণা ও প্রেমমোহতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে ধন্য হল।

ঠাকুরের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর পরদুঃখকাতর, প্রেমময় মধুর ভাব। আগন্তুকদের সাথে তৎকালে এবং সারা জীবন ধরেই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেশের ও দশের দুরবস্থা এবং তাহা নিবাকরণের উপায় সম্বন্ধে কত কথা বলতেন। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও পাপাচার, মাতৃজাতির ঘোর দুর্দশা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ, বিদ্যালয়ে প্রচলিত কুশিক্ষার

প্রভাব, সারাদেশব্যাপী অন্নবস্ত্রের হাহাকার, রোগ যন্ত্রণায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর করুণ আর্তনাদ ইত্যাদির কথা বলতে বলতে নিদারুণ দুঃখে তিনি অভিভূত হয়ে পরতেন। অকাল মৃত্যু নিরোধ, প্রচলিত বিবাহ ও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, ধর্মনীতি সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞতা নিরসন করে তাদের মধ্যে ধর্মের প্রচার ও বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা জাতির সুখ সম্পদ বিস্তার প্রভৃতি কল্যাণকর অবশ্যকরণীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে তিনি সকলকে প্রাণের কত আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতেন এবং সকলকে কত ভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন এই সকল কর্মে জীবন উৎসর্গ করতে। প্রতিটি মানুষকে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র শ্রী ভগবানের মত প্রিয়তম মনে করতেন। সর্ব্ব সত্তা দ্বারা সেবা করতেন তাদের। লোক কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। তিনি ছিলেন জন্মভূমি হিমাইতপুরের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসীর দুঃখ তিনি নিবিড় ভাবে বোধ করতেন। দুঃখ দৈন্য পীড়িত এই সকল দুঃস্থ গ্রামবাসীকে কেমন করে জীবনীয় রসধারায় স্নাত করান যায় এই ছিল তাঁর সাধনা। বন-জঙ্গলে ঘেরা, ব্যাধি পীড়িত; আত্মকলহে ও গৃহবিবাদে পারিবারিক সুখ শান্তিহীন পল্লী-গুলিকে স্বাস্থ্যে, সম্পদে, জীবনে, ধর্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে—জীবন বিকাশের যা কিছু প্রয়োজনীয় সর্ব্ব বিষয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে তাঁর মন প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। ঠাকুরের সস্নেহ করুণ আহ্বানে অনুসরণকারীদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় পার্থিব সুখ সম্পদ ত্যাগ করে সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত রূপে বাস করে বহু লোক কল্যাণকর ভাবরাজি বাস্তবে মূর্ত করেন। নিবেদিত প্রাণ অনুগামীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঠাকুরের সঞ্জীবন স্পর্শে ও দীপ্ত পরিচালনায় এবং কর্মীবৃন্দের দুশ্চর তপস্যায় সমগ্র পরিবেশ সজীবতায় ভরপুর হয়ে ওঠে, দেখতে দেখতে একের পর এক গজিয়ে উঠে কত অভিনব অপূর্ব্ব কর্মকেন্দ্র রচিত হল ভাবীকালের সুপ্রসিদ্ধ সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ভক্ত সমাগমের সাথে সাথে প্রয়োজনের তাগিদে ঐ সুদূর গ্রাম বাংলায় গড়ে ওঠে বিশাল কর্ম প্রতিষ্ঠান—স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কলাকেন্দ্র, ছাপাখানা, নানারকম কুটির শিল্প, বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র প্রভৃতি।

বাংলা তেরশো ষোল (১৩১৬) সালে অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য নামে জনৈক ভক্তের মিনতি ক্রমে এক রাত্রে তাঁকে কতকগুলি উপদেশ লিখে দেন ঠাকুর। পরে সেই উপদেশগুলি "সত্যানুসরণ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংকীর্তন লীলা, ভাবসমাধি ও অমিয়বাণী রাজির কথা ক্রমশঃ দিকে দিকে প্রচারিত হতে থাকে। ভারত তথা বর্হিভারতের

[illegible] ভক্ত ও জিজ্ঞাসু নরনারী মধুলোভী মধুকরের মত এসে [illegible] তাঁর পূত সান্নিধ্যে। প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে সব কিছুই এবং ভক্তমণ্ডলী ও অনুরাগীরা এই আশ্রমকে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আশ্রম বলে অভিহিত করতেন। পরে জননী মনোমোহিনী দেবীর ইচ্ছানুসারে এই আশ্রমের নাম হয় "পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম।"

মারোয়াড়ী ভক্তদের মধ্যে গৌরীশঙ্কর আগরবালাই প্রথম। তারপর এলেন পূর্ণমল আগরবালা, লছমিনারায়ণ আগরবালা এবং আরও অনেকে। গৌরীশঙ্করের বাড়িতে প্রায়ই সৎসঙ্গ হয়। সেখানে শুধু বাস্তকর হিসাবে নয়, গায়ক হিসাবেও দেখা যেত শ্রীশ দত্তকে। আলোচনা-অন্তে ভজন গেয়ে শোনান। এটা-ওটা ভক্তিতত্ত্বের গানও করেন। কিন্তু একখানা গানেই বিভোর হয়ে থাকেন বেশী।

"আমি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
তোমার দুয়ারে এসেছি,
সকলের প্রেমে বিমুখ হইয়া
তোমারেই ভালবেসেছি।"

অনুভূতির রস নিংরে পড়ে দুচোখ দিয়ে। শুধু দত্ত মশাইয়ের না সকলেরই, রামকৃষ্ণ, ভক্ত গহুর আলি, পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ, উকিল ত্রৈলোক্য সেন সকলেই উজ্জীবিত হয়েছে ঠাকুরের ভালবাসায়। এই রামকৃষ্ণ বিশ্বাস কি ছিল?

কীর্তন নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন সতীশ গোঁসাই। রামকৃষ্ণের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে রুখে দাঁড়াল সে। ও-সব ভজকট নিয়ে এ-পাড়ায় কেন বাবা? ও-পাড়াটা জ্বালিয়ে খেয়ে এখন আবার এদিকেও ঢোকার সখ হয়েছে? আমাদের কাছে ও সব চলবে না, বুঝেছেন তো? ঘুঁসি উচিয়ে দেখিয়ে দেয় রামকৃষ্ণ। এই হল গোঁসাইয়ের সাথে রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ।

ঐ রামকৃষ্ণ শেষে ঠাকুর ছাড়া কিছু জানত না। বলত, ঠাকুরের কথা কি আর বলব! এই ছাখো, রামকৃষ্ণকে তো চেনো? নরক থেকে উদ্ধার করে স্থান দিয়েছেন তাঁর চরণবৈকুণ্ঠে।

সত্য দত্তর কথা ও ছিল ঠিক এই রকম। তিনি যে পাপাপহ, তিনি যে পরমতারণ, তার প্রমাণ স্বরূপ এই ছাখো আমাকে। দূষিত বলে হেলা করেন নি। দূষিতকে শোধিত করেছেন ঠাকুর নিজ গুণে। তাঁর মত প্রশ্রয়ী নেই। আর নেই তাঁর মত প্রণেতা। গোময়কে রূপান্তরিত করেছেন চন্দনপঙ্ক। [illegible]

দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যায় অতীত জীবনের কথা কাহিনী। আর বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। ওগো, এমন দরদী আর দেখিনি। অতুল, অসীম, অপার করুণার নিধি তিনি।

ঈশ্বরে ভক্তি হলেই তেজ এসে ঢোকে ভিতরে। বাইরে বিনয়, অন্তরে শক্তি। অন্যায়ের সামনে প্রলয় পরাক্রম।

একদিন গোপাল সরকার হিমায়েতপুর যাচ্ছে হেঁটে। বাজারের রাস্তা দিয়ে ফেরিঘাট-মুখো হতেই একজন চেনা দোকানী জিজ্ঞেস করল, গোপাল-দা, কোথায় চললেন গো?

ঠাকুর বাড়ি—হিমায়েতপুরে। উত্তর দিলেন গোপালবাবু।

দোকানে বসে ছিল একজন অচেনা লোক। অমনি টিপ্পনী কাটল: ও বাবা, হিমায়েতপুরে! ঐ অনুকূল ঠাকুরের ওখানে!

দাঁড়িয়ে পড়েন গোপালবাবু, লোকটার দিকে তাকান। কেন, কি বলতে চান আপনি?

বলব আর কি মশাই, অনুকূল ঠাকুরকে আর চিনি না? যত নষ্টামির ঠাকুর।

গোপালবাবুর চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। এগিয়ে গেলেন লোকটার কাছে।

নষ্টামির ঠাকুর, না? কেমন করে জানলেন? অধৈর্যে টগবগ করছে তখন ভিতরটা।

জানব আর কেমন করে, লোকে বলে তাই বলছি।

ও, আপনি তাহলে লোকের কথা শুনে বলেন?

তা বলব না কেন? বেয়াড়া লোকটা তবু বিনীত হয় না।

তবে শুনুন আমিও একজন লোক। আমি বলছি, পাবনার ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র স্বয়ং ভগবান। যান, বলে বেড়ান লোকের কাছে যে, অনুকূল ঠাকুর ভগবান। যান মশাই, উঠে পড়ুন। রুদ্র ভয়াল মূর্তি তখন গোপালবাবুর।

কই, উঠে পড়ো! বলা আরম্ভ কর! নইলে এই হাত দেখছ?

অত ফষ্টিনষ্টি সব জল। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে পথ পায় না তখন লোকটা। আশে পাশের লোক ছুটে এসে বলে: হ্যাঁ গোপালবাবুর কথাই ঠিক। উচিৎ শিক্ষা হয়েছে বাছাধনের। শির দেব কিন্তু বেণী দেব না। সেই শিখবীরের মত কথা।

সদর রাস্তার ধারে একখানা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আরম্ভ করা হল নাম—চিকিৎসালয়। নেম-হস্‌পিটাল। সে এক রীতিমত হাসপাতাল এবং নিয়মিত চিকিৎসক হল বীরু রায়, সতীশ জোয়ারদার, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, গহর আলি, গোঁসাই। এরা ডাক্তার, ওষুধ হল সৎনাম। চিকিৎসা দেখে সকলেই অবাক্! এ-সব ভৌতিক যাদু নাকি!

ঠাকুর বুঝিয়ে দেন: যাদু হবে কেন? নাম তো আদিনাদ। যার থেকে সৃষ্টির উৎসার। নাম যদি মূল তবে ঐ নামই হল প্রাণের প্রাণ। জীবনী-শক্তির আদি প্রকাশ। সমস্ত সত্তার কেবল-কারণ। অস্তিত্বের সার আর জীবনের ধৃতি। যে নাম সেই জীবন। সর্ব্বরোগ হর ওষুধ। তবে হ্যাঁ, বিধি মাফিক হওয়া চাই। যাঁতে নাম সার্থক হয়েছে। সেই নামী-পুরুষের অনুসরণ থাকা চাই। এ-তো আজগুবি কথা নয়, পরীক্ষিত সত্য।

প্রবল চাঞ্চল্য পরে গেল কুষ্টিয়ায়। শুধু কুষ্টিয়ায় কেন, যেখানে-যেখানে খবর গেল সেখানেই। সবার মুখে আলোচনা: সৎসঙ্গীরা নাম জপ করে রোগ সারাচ্ছে গো। সে আবার যে-সে রোগ নয়, যার বাঁচার আশা নেই তাকেও বাঁচাচ্ছে।

রুগী আসতে লাগল নানা দিক থেকে। আবার কল্ ও আসতে লাগল দূর—দূর থেকে।

যে রুগীকে নড়ানো চলে না, হাসপাতালের লোকই সেখানে যায় নাম করতে।

কুষ্টিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত যেতে হয়েছে চিকিৎসা করতে।

সতীশ জোয়ারদারের ভাই রাধারমণ জোয়ারদার তখন বরইচারার বাড়িতে থেকে ডাক্তারি করেন। ঘরে-পড়া ডাক্তার। একদিন একটা রুগী হাতে এলো, রুগীর জীবন এখন যায় যায়। ডবল-নিউমোনিয়ার শেষ অবস্থা। রাধারমণ রুগীর ভাইকে ডেকে বললেন, খোকা, এ রুগী তো দেখছি ওষুধের বাইরে। পারো তো কুষ্টিয়ায় গিয়ে নাম-চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। এই নাও, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। খোকার হাতে চিঠি দিয়ে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলেন কুষ্টিয়ায়।

ঠাকুর শুনে বললেন, রামকৃষ্ণ তাহলে যাক।

সন্ধ্যার ট্রেনেই রওনা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রুগী আরোগ্য করে একেবারে তাকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়ায় ফিরে এলেন পরদিন। রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার। সবাই মানা করেছিল জনকী হালদারকে। আরে,

একটু ভালো লাগছে বলে অতো বাড়াবাড়ি কোরো না। এ অবস্থায় কখনও গাড়িতে ওঠে! জানকী যে ষোলআনা সুস্থ বোধ করছে এ কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি। জানকী বললে, যাঁর নামের গুণেই এতো, চোখ দিয়ে তাঁকে দেখব না? যিনি প্রাণ দিয়েছেন একবার প্রণাম করব না তাঁকে?

রামকৃষ্ণের সাথী হয়ে চলে এলো নিজের ইচ্ছায়। জানকী যখন আরও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, তখন লোকে বিস্মিত হল। সত্যিই জানকী একেবারে ভালো হয়ে গিয়েছে তো! সত্যিই এ অতি আশ্চর্য্য, অতি অভিনব।

বিভিন্ন তিথিতে বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মোৎসব করছে তখন কুষ্টিয়ার সৎসঙ্গীরা। হজরত মহম্মদের জন্মোৎসব শুধু মুসলমানরাই মানবে? প্রভু যীশু কি শুধু খ্রীষ্টানদেরই পূজ্য? তা তো হয়না। আর সে এক একটা উৎসব কি! বিরাট আয়োজন, ব্যাপক আনন্দ। প্রস্তাব হল, সাধারণ ভোজ কাজের সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণ সেবাও হবে।

ঠাকুরের কানে কথা গেল। খুব খুশী হলেন শুনে। কিন্তু বললেন, ঐ নামটি পালটিয়ে রাখো। দরিদ্র নারায়ণ সেবা নয়, নরনারায়ণ সেবা। নরনারায়ণ কখনও দরিদ্র হয়? তাবৎ নরের পূর্ণৈশ্বর্যের পথ করে দিচ্ছেন যিনি, তিনিই হলেন দরিদ্র নিঃস্ব?

আর, যাকে দরিদ্র বলে মনে করে নিয়েছ তার আর সেবা করবে কি? দয়া করে চাট্টি খেতে দিচ্ছ ভাবলে তো আর সেবা হয় না, দম্ভ প্রকাশ পেল। অহংকে জাহির করা হল। উদ্দেশ্য পণ্ড হল। সেবা করলেই আনন্দ আসবে, কৃতার্থ হওয়ার বোধ আসবে।

আরম্ভ হয়ে গেল তাই। জাত ধর্মের বিচার নেই, গরীব বলে অশ্রদ্ধা নেই, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ডেকে আনতে লাগল মানুষকে ঠাকুর ভক্তেরা। সাধু, ফকির, মুসাফির সবাইকে। সাদরে আহ্বান করে পায়ের ধুলো ধুইয়ে, আসনে বসিয়ে, কাছে ডেকে খাওয়াতে লাগল ইষ্টপ্রাণ ভক্তজনেরা। উৎসবে ঠাকুর হাজির থাকতেন অনেক সময়।

ঠাকুরকে পেয়ে কীর্তনের তাণ্ডব আরম্ভ হয়েছে। নগরের রাস্তায় শুধু নামের প্রবাহ।

উৎসব করতে করতে সকলের খেয়াল হয় আচ্ছা, যিনি এই অভেদ বুদ্ধির মূলে, আমরা যে তাঁকেই ভুলে থাকলাম! পূর্বতনের জন্মোৎসব তো হচ্ছে, কিন্তু বর্তমানের কই?

খুঁতখুত করে মনটা সব ভক্তদের। এবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করব আমরা।

সে হল তেরশো পঁচিশ সালের শ্রাবণ মাস। সামনের তিরিশে ভাদ্র ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের তিরিশ বছর পূর্ণ হবে ঐ দিনে। বৎস, তবে ঐ সময়েই হোক।

মহাসমারোহের সাড়া পড়ে গেল দিকে-দিকে। ঠিক হল, দুদিন চলবে উৎসব।

গৌরীশঙ্কর বাবুর বাড়িতে বসল উৎসবের অফিস। রজবালি খাঁ-মশাই ছেড়ে দিলেন তাঁর প্রকাণ্ড বাড়িখানা। বললেন, ঠিক আছে, এইখানেই উৎসব বসানো হোক।

মোহিনী মিলের কর্তারা নিলেন বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার। যত আলোক-সজ্জা সব তাঁরা করবেন। হিন্দু-অহিন্দু, বাঙালি-অবাঙালি সবাই মিলে উৎসবের দায়িত্ব নিল।

কিন্তু একটা কথা, ঠাকুরকে এখনও বলা হয়নি। প্রস্তাবটা তাঁকে জানানো দরকার। তাঁর আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি চাই। ঠাকুরের কাছে লোক ছুটল হিমাইতপুরে।

সে আবার কি কথা! মতলব শুনে ঠাকুর যেন বিস্মিত হন। আমাকে বুঝি ভগবান বলে প্রচার করবেন আপনারা? এ মোটেই ভাল নয়।

মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন ঠাকুর। জন্ম উৎসবের সম্মতি তো দিলেনই না, ও প্রসঙ্গে কথাই বললেন না। সকলে অনেক চেষ্টা করেও ঠাকুরের মন গলাতে না পেরে মাথা চুলকাতে চুলকাতে পদ্মার ধারে গিয়ে বসল সবাই যুক্তি করতে। কিন্তু শেষে ব্যর্থকাম হয়ে আশ্রমের থেকে ফিরে গেল কুষ্টিয়ার ভক্তরা।

অশ্বিনী বিশ্বাস, সত্য দত্ত ও ডাক্তার গোকুলবাবু বললেন, তার মানে? নিজের জন্মদিন মানি আর ঠাকুরের জন্মদিন পালন করতে পারব না?

আবার লোক গেল হিমাইতপুরে। কিন্তু ঠাকুর তেমনি অটল।

তাহলে উপায়? মাতা মনোমোহিনী দেবীর কাছে গিয়ে কেঁদে পরে ওরা।

মাও রাজি হল না। ছেলেকে নিয়ে এসব কি ছেলেমানুষি করছ তোমরা!

কিন্তু এখন অনুমতি না নিয়ে ফেরা যায় না। জানে, মা অনুমতি করলে মাতৃভক্ত ছেলের আপত্তি জল। এত লোকের ধরাধরি ঠেলতে পারলেন না মা, রাজি হন অবশেষে।

কি আনন্দ! আনন্দে নেচে উঠল সকলেই।

কিন্তু ঠাকুর আবার চেপে ধরলেন, শুনুন, কথা শুনুন! মা যখন হুকুম দিয়েছেন তখন তো আর ছাড়বেন না। কিন্তু আমার জন্মোৎসব বলে কিছু না করে একটা ধর্মোৎসব মতন করুন। নরনারায়ণ সেবা হোক, ধর্ম কথা হোক—এই তো আনন্দের হবে।

উৎসবের আগের দিন। লোকে গমগম করছে বাজারপাড়াটা। কাল থেকেই সুরু হয়ে যাবে পরমানন্দের মহোৎসব। আশ্রম থেকে লোক চলে গেল মাকে আর ঠাকুরকে আনতে। মা তো রাজি হয়েছেন, মুশকিল হল আবার ঠাকুরকে নিয়ে। বললেন, ওর মধ্যে আবার আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

কিন্তু অন্ত্র সকলের জানা হয়ে গিয়েছে। ছুটল সকলে মার কাছে।

ওদের যখন এত ইচ্ছে চল না হয়। মা সাথে নিয়ে উঠলেন স্টীমারে।

রাত প্রায় এগারটা। কুষ্টিয়ার স্টিমার ঘাটে লোকের অরণ্য। কাতারে কাতারে লোক এসেছে ঠাকুর ও মাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ঘাট থেকে ঠাকুর সোজা চললেন উৎসব মণ্ডপে। বলে দিলেন, আমার জন্ম ব্যস্ত হবেন না, অতিথিদের দিকে নজর দেবেন। দেখতে হবে, কারও যেন সেবা যত্নের ত্রুটি না হয়।

সভামণ্ডপ, হেঁসেল, বসবার জায়গা, সব তন্ন তন্ন করে দেখলেন নিজে।

কিন্তু, ওটা কি করলেন? জানতে চান ঠাকুর।

কোনটা?

ছবিটা পালটিয়ে ফেলুন, কোন মহাপুরুষের ছবি রাখুন ওখানে।

উৎসব মণ্ডপে বেদীর উপর সিংহাসনে তাঁর যে ফটো রাখা হয়েছে তারই কথা বলছেন। বলছেন ওটা সরিয়ে দিয়ে অন্য ছবি রাখলে ভাল হয়।

কিন্তু এখন কে কথা শোনে? বীরু রায় অশ্বিনী বিশ্বাসকে বললেন, ভাই শুনেছ, ঠাকুর কি বলছেন?

শুনেছি, তা বলুন। কত কথাই তো তাঁর শুনি না, এটাও না হয় তার মধ্যেই গেল। কিন্তু বিশ্বগুরুর সিংহাসনে যে মূর্তি বসিয়েছি তা আর নামাচ্ছি না। গুরুর আদেশ অমান্যের জন্যে যদি নরকে যেতে হয়, তাই যাব। বুক ঠুকে দাঁড়ালেন তিনি বীরের মত। লেট মে বি ক্রাশ, কিন্তু ঠাকুরকে নামাচ্ছি না।

ঠিক, ঠিক। নামাব না, লাফিয়ে উঠলেন সত্য দত্ত। আর হাজার বার বলব তাঁর কথা। আজীবন বলব, বিশ্বগুরুর আবির্ভাব হয়েছে, আজীবন বলব।

সুন্দর ভাবে শেষ হয়ে যায় ঠাকুরের প্রথম জন্ম উৎসব।

ঠাকুরের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে জননী মনোমোহিনী দেবী একটি উপদেশ গর্ভ কবিতা লিখে তাঁর নামকরণ করে ছিলেন অনুকূল। এবং তাঁর পুত্র সকলের জীবন, প্রাণ, মনের অনুকূল হয়ে গেলেন। তাঁর ভালবাসা কত শত লোককে বাঁচবার পথ, ধর্মের পথ দেখাল। সকলের জীবন ভূমিকে উর্ব্বর করে তুলল।

নামকরণের সময় পুত্রকে উদ্দেশ্য করে মাতা মনোমোহিনী দেবীর লেখা কবিতা এই রকম :

"অকূলে পড়িলে দীন হীন জনে
নুয়াইও শির, কহিও কথা।
কূল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা॥"

কবিতা সম্বন্ধে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহার ছত্র চারটির আগু অক্ষরগুলি পর পর পড়িলে অনুকূল নামটি পাওয়া যায়।

১৩৩০ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর লোকান্তর ঘটে। ঐ প্রচণ্ড শোকের মধ্যেও ঠাকুর মানুষের পরিচর্যা করে চলেছেন, পথ ভ্রান্তকে পথের সন্ধান দিয়েছেন। মৃত্যুকালে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর বয়স হয়েছিল আটষট্টি বৎসর। পাবনার তদানীন্তন সর্ব্বজনবরেণ্য পণ্ডিত তারানাথ সপ্ততীর্থ মহোদয় শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে যথাযথভাবে শ্রাদ্ধকৃত্য নিম্পন্ন করেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে সমগ্র পাবনা জেলা ও রাজসাহীর ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্যমান্য সকলকেই যথাযোগ্য আমন্ত্রণ করা হয়। বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতের সমাগমে ও সহযোগিতায় উক্ত অনুষ্ঠান বিশেষরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়। নানা শ্রেণীর বহুলোককে ভূরিভোজনের উত্তম ব্যবস্থা করা হয়।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অজস্র বাণী ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁর আদর্শকে তুলে ধরলেন জগৎ সমক্ষে। উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন—"ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রেরিতগণ এক-ই বার্তাবাহী।" পূর্ব্বতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি বর্তমান পুরুষোত্তমে আনত হওয়ার কথা বললেন। প্রবর্তন করলেন যজন, যাজন, স্বস্ত্যয়নী, ইষ্টভৃতির মহাবিধান। বর্ণাশ্রম ও বৈধী বিবাহ পরিপালনের ভিতর দিয়ে তিনি সমাজের তথা রাষ্ট্রকে সুবিন্যস্ত করার নির্দেশ দান করলেন। গুরু হ'ল জীবনের চর্য্যামুখর উদ্বোধন, মরনের মৃত্যু ঘটাবার

অভিযান। ধর্মের নতুন সংজ্ঞা দিলেন ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। তাঁর ধর্মের সংজ্ঞা হল—"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে সধর্ম্মঃ।" (যাতে সপারিপার্শ্বিক নিজের ও অপরের জীবন বিধৃত হয় তাই ধর্ম) এই আদর্শ দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি সৃষ্টি করেন ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, ও যাজক-সম্প্রদায়। ঋত্বিক সংঘের নেতৃত্বে সুরু হয় বাঁচা বাড়ার দিব্য আন্দোলন। প্রতিটি ব্যক্তি ইষ্টকেন্দ্রিক সাধন-ভজনের ভিতর দিয়ে তার অন্তরস্থ শক্তি—উৎসের সন্ধান লাভে সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে অসৎ যা যা-কিছু তার নিরসনের সাধনায় উদ্দাম হয়ে উঠল মানুষ। একাদর্শ-বিধৃত পারম্পরিকতায় বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ-সংগঠন প্রকল্পে ব্রতী হ'ল সকলে।

কিন্তু ঠাকুরের এই যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য হ'ল লোক সংগ্রহ—কিছু খাঁটি মানুষ তৈরী করা, যারা জীবন ও চরিত্র দিয়ে বহন করে নিয়ে চলবে তাঁকে বা তাঁর আদর্শবাদ, মূর্ত করে তুলবে তাঁর সব ইচ্ছাগুলি।

কালক্রমে সরসীবালা দেবীর গর্ভে প্রথমে দুই পুত্রের জন্ম হয়। যথাক্রমে অমরেন্দ্রনাথ ও বিবেকরঞ্জন। তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ বর্তমান। পিতার অমিয় বাণীগুলিকে অবিকৃত রাখতে সব বাধাকে জয় করেছিলেন ঠাকুরের মধ্যম পুত্র বিবেকরঞ্জন। কোন কিছুর ওপর লোভ, লালশা বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নি কোনদিন। পিতার ইচ্ছা পূরণ করাই তাঁর ছিল একমাত্র ইচ্ছা। ব্যায়াম করা, কুস্তি করা বিশাল সুগঠিত দেহ ছিল দেখবার মত। দারুণ অভিনয় করতেন। পিতার ইচ্ছায় যাত্রাদল করে "নাম" প্রচার করতেন বিবেকরঞ্জন। যাজন কার্যে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন তিনি। শেষ জীবনে ইষ্টপ্রোক্ত, পথ নির্দেশ ইত্যাদি বইয়ে তিনি তাঁর পিতা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী সঙ্কলন করেছেন। তাঁর জন্ম হিমাইতপুরে (বাং ১৩২১ সাল, ২৬শে আষাঢ়, শুক্রবার) এবং দেওঘর,"বিবেক-বিতান" নিজ বাস ভবনে ইং ১৯৮৩ সাল, ২৪শে সেপ্টেম্বর দেহরক্ষা করেন। দুই পুত্র সন্তানের পরে দুই কন্যা সাধনাদেবী ও সান্ত্বনাদেবীর জন্ম হয়। উত্তরকালে সরসীবালা দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী অনুকূলচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করার বাসনা মাতা মনোমোহিনী দেবীকে জ্ঞাপন করলে তিনি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁর প্রবল সঙ্কল্প বুঝে অনুকূলচন্দ্রকে গ্রহণ করতে আদেশ দেন। মাতৃভক্ত অনুকূলচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞায় সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে গ্রহণ করেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর এক পুত্র প্রচেতারঞ্জন বর্তমান।

১৩৪৪ সালের ৬ই চৈত্র মাতা মনোমোহিনী দেবী পরলোক গমন করেন।

মাতৃগত প্রাণ শ্রীশ্রী ঠাকুরের জীবনে এই মাতৃ বিরহ গভীর ব্যথার সৃষ্টি করে। সারা জীবন ধরে তিনি মায়ের কথা এবং মাকে হারাবার দুঃসহ বেদনা নানা ভাবে বারংবার ব্যক্ত করেছেন।

মাকে হারাবার ব্যথা অন্তরে থাকলেও শ্রীশ্রী ঠাকুরের লোক কল্যাণী মহাকর্মযজ্ঞে কোন শিথিলতা কখনও দেখা যায় নি। বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে যাঁর আবির্ভাব, তাঁকে তো কোন অভিভূতি গ্রাস করতে পারে না। তিনি যে চির-অচ্যুত।

ইং ১৯৪৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর এক বৃষ্টি ঝরা দিনে, চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সপরিবারে বিহার সাঁওতাল পরগণার দেওঘর-বৈদ্যনাথধামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ঐ সময় কিছু ভক্তও চলে আসেন তাঁর সাথে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভাগের ফলে পাবনা জেলা পাকিস্থানের অন্তর্গত হয়। হিমাইতপুরে শ্রীশ্রী ঠাকুরের কোটি কোটি টাকার যে সম্পত্তি ছিল তা তৎকালীন পাকিস্থান সরকার সরকারি সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে দেওঘরে আবার নতুন করে গড়ে ওঠে সব কিছুই।

দেওঘরের এই বিশাল কর্মযজ্ঞে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এসে যোগদান করে। দেশের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের বহু দেশের অগণিত নরনারীকে টেনে আনল এই পুণ্য পাদপীঠ-তলে। বিরাট এক গণ জাগরণের স্পন্দন ভারতের প্রতিটি প্রদেশ তথা প্রত্যন্ত প্রদেশকে স্পন্দিত ক'রে তুলতে থাকল। শুধু ভক্তগণই নয়, ভারত ও বর্হি-ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক প্রভৃতি মনীষীরাও শ্রীশ্রী ঠাকুরের সান্নিধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে তৎ-প্রবর্ত্তিত সদ্দীক্ষায় দীক্ষিত হতে থাকেন। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বোস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফজলুল হক, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, স্বামী অভেদানন্দ ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সাক্ষাৎ করেছেন এক সময়। এবং দীক্ষা গ্রহণ করেছেন অনেকে।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে দীর্ঘ দিনের ঐ সব কথোপকথন "আলোচনা প্রসঙ্গে" নামের গ্রন্থে ভক্ত প্রফুল্লকুমার দাস কর্তৃক সঙ্কলিত হয়েছে। এই সময় দেওঘর কেন্দ্র এবং আরও অন্যান্য জায়গা থেকে নানারকম পত্র পত্রিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও ভাবাদর্শ বহন করে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে।

দেওঘরে গড়ে ওঠে সব কিছুই—স্কুল, হাসপাতাল, গেস্ট হাউস, ভক্তদের আবাসস্থল, প্রেস, উপাসনা মন্দির, অফিস (যার নাম দিলেন ফিলানথ্রপি) ইত্যাদি একের পর আর এক অনেক কিছুই।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সুশীলচন্দ্র বসু, পঞ্চানন সরকার, খলিলুর রহমান, প্রফুল্লকুমার দাস, অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ পাবনা ও দেওঘরে বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও কথোপকথন অনুলিখনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর কথিত এই সুবিপুল সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে কয়েকখানির নাম—নানা প্রসঙ্গে, ইসলাম প্রসঙ্গে, কথা প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে, নারীর পথে, নারীর নীতি, চলার সাথী, অনুশ্রুতি, অমিয় বাণী, The message, Magna Dicta, দীপরক্ষী, ধৃতি বিধায়না, বিজ্ঞান-বিভূতি, আদর্শ-বিনায়ক, বিধান-বিনায়ক, সমাজ-সন্দীপনা। এছাড়াও তিনি শিক্ষা-বিধায়না, বিধি-বিন্যাস, আর্য্য কৃষ্টি, চর্য্যা-সূক্ত, আশিসবাণী, দেবী-সূক্ত, আচার-চর্য্যা, সেবা-বিধায়না, স্বাস্থ্য ও সদাচার ইত্যাদি গ্রন্থে অগণিত বাণী রেখেছেন। আর বহু গ্রন্থে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অকৃপণভাবে বিতরণ করেছেন জাগতিক সর্ব্ববিধ সমস্যার অমিয় সমাধান।

অবশেষে এসে পড়ে ইং ১৯৬৯ সালের সেই সর্ব্বনাশা ২৭শে জানুয়ারি। বিশ্ব-প্রকৃতি ম্লান মৌন মুখে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে মাঘ মাসের সেই নিষ্ঠুর মুহূর্তগুলির দিকে। প্রত্যূষ ৪টা ৫৫ মিনিট, পরমদয়াল, নিখিল মৌন বিধাতা, বিশ্বজনের প্রাণের প্রাণ শ্রীশ্রী ঠাকুর লক্ষ কণ্ঠের বুকফাটা হাহাকারের মধ্যে সংবরণ করে নিলেন তাঁর এবারকার মর্ত্যলীলা।

এর মাত্র দুই বৎসর পরে ১৯৭১ সালের ১০ই মে পরমরাধ্যা সরসীবালা দেবীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

অনুরাগী ও ভক্ত বৃন্দকে উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন, "আমার সবই লেখা আছে ছড়ায় ও গদ্যে। আমার বুদ্ধি, আমি না থাকলেও যেন মানুষ আমার সাথে কথা বলতে পারে। তোমরা আমার হাত-পা। তোমাদের ভিতর দিয়ে আমার সর্ব্বত্র চরে বেড়াতে ইচ্ছা করে।"

অকপট ভাবে ইষ্টে সুনিষ্ঠ হয়ে তাঁর নীতি বিধিগুলি পরিপালনের মধ্যে দিয়েই মনুষ্য জাতির শুভলগ্ন উপস্থিত হবে। ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে মানুষ স্বস্তি ও শান্তির অধিকারী হবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে সুদিন।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেছেন: গুরুভক্তি ছাড়া, হাতে-কলমে কাজ ছাড়া, শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চরিত্র গড়ে না, যোগ্যতাও বাড়ে না।

গুরুভক্তি থেকেই মানুষের মঙ্গল আসে। ঐ গুরুকেই ইষ্ট বলে। ইষ্ট মানে মঙ্গল। যাকে-তাকে গুরু করতে নেই। গুরু করণ করতে গেলে দেখতে হয় তিনি Surrendered (আত্ম নিবেদিত) কিনা, তিনি প্রবৃত্তি-অভিভূতির উর্দ্ধের এলাকার মানুষ কিনা, তাঁর divine qualities (ভাবগত গুণাবলী) আছে কিনা।

"যা ইচ্ছা তাই করবে তুমি
তা' কিন্তুরে চলবে না
ভাল ছাড়া মন্দ করলে
পরিস্থিতি ছাড়বে না।"

শ্রীশ্রী ঠাকুর—দীক্ষা নেওয়া মানে, দক্ষতা লাভের কৌশল জানা। সেই কৌশল জেনে নিয়ে তদনুযায়ী অনুশীলন করা চাই। দীক্ষা মানেই দক্ষতার অনুশীলন—যা' করতে করতে সর্ব্বতোমুখী দক্ষতা স্বতঃই বেড়ে ওঠে। যে মানুষ ভাবে, করে না, তার চরিত্রে সঞ্চালনী শক্তির সৃষ্টি হয় না।

শ্রীশ্রী ঠাকুর—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান যেই সৎসঙ্গী হোক, সৎসঙ্গী হওয়ার দরুণ, সে আরো খাঁটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও খ্রীষ্টান হবে এবং সকলের প্রতি তার ভালবাসা বেড়ে যাবে। অবশ্য যদি সে ঠিক ভাবে চলে। গুরুকে ভালবাসার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা, আদেশ, নীতিবিধি, আদর্শ ও স্বার্থকে প্রধান ক'রে নিয়ে তাঁর পরিপূরণে আপ্রাণ হ'য়ে ওঠা। brain (মস্তিষ্ক) সমুদ্র মন্থন করুন। ওতে সুধা গরল দুই-ই আছে। সুধা উঠান। সৎ-চিন্তা, সৎ-কর্মের দ্বারা সৎ-ভাব আর জ্ঞান রূপ সুধা তুলতে হবে। অসৎ কার্য্য বা চিন্তা দ্বারা গরল তোলা যেন না হয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর—নিজের পরিবারের জন্যে মানুষ যেমন feel (বোধ) করে, বাস্তবে করে, পরস্পরের মধ্যে তেমন হওয়া চাই। মানুষই তোমার সম্পদ। তোমার স্বার্থ তাদের খাটো করলে তুমিই তো খাটো হ'য়ে পড়বে। তোমার বড়ত্ব দাঁড়াবে কিসের উপর? এটা ঠিক জেনো পরিবেশের যদি ভাল না করা যায়, নিজেদের ভাল থাকবার কোন পথ নেই।

প্রশ্ন—আপনার উপদেশ চাই-কি-ভাবে কি করব।

শ্রীশ্রী ঠাকুর—আর্য-কৃষ্টি এবং সৎসঙ্গের casse (উদ্দেশ্য) অর্থাৎ বাঁচা বাড়া, তার মানে ভব-দুনিয়ার মায় একটা কেন্নোর পর্যন্ত বাঁচা বাড়া Sacrifeced পরিত্যক্ত না হয়। এই আমার অনুরোধ। যেন স্মরণ থাকে।

প্রশ্ন—মানুষের দুর্ভোগের কারণ কি ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর—মানুষের দুর্ভোগের পিছনে থাকে সাধারণতঃ কতকগুলি চরিত্রগত ত্রুটি—তার নিরাকরণ না হ'লে দুর্ভোগ যায় না।

প্রশ্ন—আশ্রম মানে কি ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর—আশ্রম মানে যেখানে সম্যকভাবে শ্রম ক'রে সত্যকে, মঙ্গলকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন—বহু ধর্মে কামড়াকামড়ি—এর সমন্বয় কোথায় ?

শ্রীশ্রী ঠাকুর—প্রেরিত বা অবতার পুরুষদের প্রত্যেককেই মান্য করতে হবে, এঁদের মধ্যে বিভেদমূলক বিচার করলে হবে না, আবার পূর্ব্বতন প্রত্যেককে স্বীকার করেন ও পরিপূরণ করেন এমনতর বর্তমান মহাপুরুষ যদি কেউ থাকেন, তাঁতে শ্রদ্ধানত হতে হবে। এতে আলাদা আলাদা সম্প্রদায় থেকেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ থাকবে না। ঈশ্বর এক, ধর্ম্মও এক, অবতার-মহাপুরুষরাও এক। ভগবান, ইষ্ট বা ধর্মের মৌখিক স্তুতির ভিতর দিয়ে যারা ধর্ম বিরোধী কাজ করে তারা হ'ল সব চাইতে বড় শয়তানের দূত—প্রকৃষ্ট লোকদূষক।

শ্রীশ্রী ঠাকুর—মহাপুরুষদের বাণী এমন করে ছড়িয়ে দেন যাতে প্রত্যেকে সৎভাবে উদ্দীপ্ত হযে ওঠে। মানুষের সদ্‌ভাবকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারলে, কৃষ্টিগত জাগরণ ঘটাতে পারলে, আর জাতির মধ্যে পারস্পরিক সেবা বুদ্ধি গজিয়ে তুলতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

বাসুদেব চক্রবর্তী

শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী

ভারতীয় সাধকেরা যুগ যুগ ধ'রে ধ্যানের মধ্যে দিয়ে পরমপ্রিয় দেবতার আরাধনা ক'রে চলেছেন। তাঁদেরই অন্যতম একজন হলেন শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি শুধু জাগতিক জীবনের নয়—আধ্যাত্মিক জীবনের পরম বন্ধু। বাংলা ১৩১১ সালের ২রা পৌষ—ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৭ টায় শুভ শুক্লপক্ষে পূণ্যদশমী বিদ্ধা একাদশী তিথিতে খুল্ল পিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মলীলা পরিগ্রহ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রী হেমচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতী বিনয়িনী দেবী। শ্রীশ্রী মহারাজের পিতা ৺হেমচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা তাঁর অতি শৈশবেই পরলোক গমন করেন—সেজন্যে তাঁর কাকা কাকিমা আপনার স্নেহের ছায়ায় মাতৃহীন বালককে টেনে নেন। আদি পূর্বপুরুষ ছিলেন ৺রামেশ্বর চক্রবর্তী। মহারাজের আদি নিবাস নদীয়া জেলার শিবনিবাস গ্রামে। শ্রীশ্রী মহারাজের খুল্ল পিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীশ্রী বালানন্দ মহারাজের একনিষ্ঠ প্রিয়তম শিষ্য। টাকা-পয়সা, ভোগবিলাস সমস্ত তুচ্ছ করে তিনি গুরুর চরণেই আত্ম সমর্পণ করেছিলেন। শ্রীশ্রী মহারাজের পিতা ও মাতা গৃহী হলেও সাধনায়, তিতিক্ষায়, বৈরাগ্যে কোন ত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। বিবাহের অনতিকাল পরেই কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে থাকাকালীনই তাঁরা শ্রীশ্রী বালানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর পিতা আব্‌গারী বিভাগে বিহার সরকারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না এবং তিন মেয়ের পর ছেলে হওয়াতে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। এই পুত্রই শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী। মাতার নয়নের মনি ছিলেন। সর্ব-সমেত আট ভাইবোন ছিলেন। শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্তগোষ্ঠীতে "কাতুমা" নামে এক শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। তিনিই শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর নামকরণ করেন কাব্‌লী। বাড়ীর সকলে তাঁকে "কাবু" বলেই ডাকতেন।

শ্রীশ্রী মহারাজ ছোট থেকেই শান্ত মধুর ছিলেন। ভালবাসার অমৃত তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে সর্বদাই ঝ'রে পড়তো। তাঁর পিতার বদলীর চাকরীর জন্য শৈশবে মজঃফরপুর, ভাগলপুর, ধানবাদ, পুরুলিয়ার—বিভিন্ন স্কুলে পড়াশুনা

করেন। তারপর ধানবাদ উচ্চ ইংরাজী স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে যান পড়াশুনা করতে। হোস্টেলে ব্রাহ্মণ রান্না করতো। মহারাজ নিরামিষ খেতেন। বেশীর ভাগ দিনই ফলমূল আহার করতেন। কলেজ জীবন থেকেই গান তাঁর জীবনের অনেকখানি অধিকার করেছিল। স্কটিশচার্চে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি শান্তিনিকেতনে বহুদিন পড়াশুনা করেছেন। সেখানেই এস্রাজের সঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। স্কটিশচার্চ হোস্টেলে দিনের পর দিন পূজাপাঠ নিয়ে তাঁর দিন কাটতো। শান্ত, প্রিয়দর্শন, নীরব, লাজুক, সৌম্য দিব্যমূর্তি। তাঁর নীরব মহিমাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের এক অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ছিল। কলেজে পড়াকালীনই তাঁর ব্রহ্মচর্য্য জীবনের সূচনা হয়েছিল। তার সাথে চলতো ধর্মগ্রন্থাবলী পাঠ।

শ্রীশ্রী মহারাজ গৃহাশ্রম ত্যাগ করেন ১৯২১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। শারদীয়া মহাষ্টমীর শুভলগ্নে শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মাতা বিনয়িনী দেবী অশ্রুসজলনেত্রে পুত্রকে গুরুর শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। মহারাজের বয়স যখন মাত্র দেড় বছর তখন পিতা মাতা তাঁকে নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে যান এবং শিশুপুত্রকে শ্রীশ্রী বালানন্দ মহারাজের পূণ্য চরণতলে রাখেন। বড় মহারাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই শিশুপুত্রকে দেখে মাতা বিনয়নী দেবীকে বলেন যে তাঁর এই পুত্র খুব বড় সাধু হবেন। শিশু পুত্রটিও তাঁর গুরুদেবেব মুখপদ্মখানি নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত করে নিয়েছিল। শ্রীশ্রী মহারাজ এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রী বালানন্দ মহারাজের মধ্যে দুর্নিবার আকর্ষণ। তারই ফলে আশৈশব যত্নে, স্নেহে, ধনে লালিত হয়েও মাত্র সতেরো বছর বয়সে মহারাজ দেওঘর আশ্রমে গুরুদেবের চরণতলে ছুটে যান। শ্রীশ্রী মহারাজ তাঁর ঘরের মাকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে বিশ্বের শত শত মায়ের অশ্রু মুছবার সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। যেমন করেছিলেন তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রী বালানন্দ মহারাজ। তিনি তাঁর মা নর্মদাবাঈকে কাঁদিয়ে মাত্র নয় বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বৃদ্ধা মা দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে পুত্রকে দর্শন করলেন দেওঘরের তপোবনে। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি প্রিয় পুত্রের হাতের সেবা পেলেন। প্রিয় পুত্রকে দর্শন করে নর্মদা মাতার বহুকালের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হলো। দেওঘর আশ্রমে "নর্মদা যাত্রীনিবাস" তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত আছে।

মহারাজ গুরুর পদপ্রান্তে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন। গুরু হলো তাঁর নতুন জীবন। নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীর সমস্ত নিয়ম তিনি পালন করতেন।

সন্ধ্যার লগ্ন এলে শত কাজ ও কর্তব্যের মাঝেও গুরুদেবের চরণপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে নিজের কর্তব্যের কাজে চলে যেতেন। শ্রীশ্রী মহারাজের আচরণ সকল সময়েই নীরব কিন্তু সেই মৌনের গভীরতার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতোই দু' একটি ইঙ্গিতে তাঁর আত্মসমর্পণের বিশালতা ও অনির্বচনীয় মহিমা আত্ম প্রকাশ করতো। সকল সময়েই নিঃশব্দে, অশ্রান্তভাবে শুধু গুরুর সেবা করে চলেছেন। সর্বদাই গুরুর আদেশ পালনের জন্য গুরুর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছেন। গুরুদেবের সেবার জন্য মহারাজ সব সময় তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। পাহাড়ের নীচে ইঁদারা থেকে তামার কলসীগুলি তেঁতুল দিয়ে আপন হাতে মেজে সোনার মতো ঝলমল করে সাত আট কলসী জল নিয়ে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় তুলতেন। গুরুদেবের স্নান, পান এবং ভোগের রান্নার জন্য। গুরুদেবের মুখ ধোয়ার জল। দাঁতন কাঠি নিয়ে ভোর রাত্রে অপেক্ষা করতেন। নিজের হাতে গুরুদেবের কৌপিন কাচতেন এবং গুরুদেবের জন্য নিজের হাতে ভোগ রান্না করতেন। গুরুদেব পরম তৃপ্তি সহকারে প্রিয় শিষ্যের হাতের ভোগ গ্রহণ করতেন। শিষ্যের নাম উল্লেখমাত্রই গুরুদেবের চোখে ভালবাসার দ্যুতি ফুটে উঠতো। শিষ্যকে বেশীক্ষণ না দেখতে পেলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। শ্রীশ্রীমহারাজের বয়স তখন ২১ বছর। একবার দেওঘরে শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজ নিম্ব বৃক্ষতলে চবুতারায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। বড় মহারাজ শিষ্য মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীকে বললেন তাঁর আশাদণ্ডটি এনে দিতে। মহারাজ আশাদণ্ডটি এনে দিলে তার উপর হাত রেখে গুরুদেব ধ্যানস্থ হলেন। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজও গুরুদেবের সঙ্গে একই স্পন্দনে যুক্ত হয়ে ধ্যানস্থ হলেন। গুরু শিষ্য সমাধির গভীরে এক মহামিলনে যুক্ত হলেন। শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ একশত বৎসরের অধিক কাল নরদেহ ধারণ করেছিলেন। ১৩৪৪ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার শুক্লপক্ষের তিথিতে মধ্যরাত্রে তিনি তাঁর সাধনপীঠ দেওঘর রামনিবাস ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধ্যানকুটিরে ব্রহ্মলীন হন। সর্বাঙ্গে বিভূতিলিপ্ত, গম্ভীর মুখে উদ্ভাসিত ব্রহ্মজ্যোতিঃ। কঠোর যোগী মূর্তি কিন্তু অন্তরে ভালবাসার ফল্গুধারা। তাঁর অবসান নেই। আছে শুধু অনন্ত আগমন। তাই তিনি তাঁর মানসপুত্রের মধ্যে দিয়ে জগতের কল্যাণ-সাধন করে চলেছেন। গুরু মহারাজও তাঁর নির্দেশ এবং প্রেরণা দ্বারা পৌঁছে গেছেন এক জ্যোতির্ময় রাজ্যে, সেখানেই তাঁর প্রকৃত স্থান। তাঁর করুণার ধারা আজও শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, জগতের সমস্ত প্রদেশে বয়ে চলেছে। তার অন্ত নেই।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজ শারদীয়া দুর্গা পূজায় এবং দোল পূর্ণিমায় মহা-পূজা ও মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। ১৪।১৫ দিন ধরে উৎসব চলতো। প্রত্যেক ব্রতীকে রেশমী চাদর, কাপড়, আসন, অঙ্গুরীয়, রুদ্রাক্ষ মালা, পূজার বাসন আবার কখনো ঘড়ি বেঁধে বরণ করতেন। কুমারীদের কুমারী পূজায় মহার্ঘ্য বস্ত্র এবং অলংকার নৈবেদ্য ষোড়শোপচারে পূজা করতেন। ব্রাহ্মণদেরও অজস্র দান করতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শিষ্য ভক্তদের কাপড়, চাদর এবং সধবা মায়েদের শাড়ী প্রদান করতেন। তারপর দরিদ্র নারায়ণ, আশ্রমের পরিচারকবৃন্দ, অন্যান্য সকল অতিথিদের যথাযোগ্য দানে ভূষিত করতেন। মহারাজও কল্পতরু হতেন।

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি মাত্র ৩/৪ বছর বয়সে। একরাশ শিশুর বিস্ময় নিয়ে তাঁকে দর্শন করলাম। শিশুর অন্তরে তখন অন্য কিছুই নেই। শুধু তাঁকে দর্শন কবার পর মনটা খুশীতে ভরে গিয়েছিল। তারপর থেকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে দর্শন করেছি। ১৬-১৭ বছর ধ'রে। আমার বয়স যখন ৭/৮ বছর তখন আমার এক আত্মীয়ার বাড়ীতে মহারাজ আসেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য মহারাজ এসেছেন তাই সবাই খুব ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি প্রণাম চলছে। বাড়ীর সকলের সাথে আমিও প্রণাম ক'রে পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। কারণ এতো ভীড় যে সামনে যাওয়ার রাস্তা নেই। আমি মনে মনে শুধু আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। কীর্তনের পর মহারাজ লুঠ দিচ্ছেন বাতাসা, টফি, লাড্ডু, সিঙ্গারা প্রভৃতি। আমি ভীড়ের মধ্যে শুধু একটি টফি পেয়েছি। তাই পেয়ে মনে খুব আনন্দ। দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। লুঠ দেওয়া শেষ হয়েছে। বাবা এবার চলে যাচ্ছেন। দরজার দিকে এগিয়ে গেছেন। সবাই বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি প্রসাদ পেয়েছো তো!" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সেদিন এতো ভীড়ের মধ্যেও বাবা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন! আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল। ঐ মুহূর্তটুকু আমার জীবনের পরম মুহূর্ত। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়ার অবসান। তারপর থেকে মহারাজকে বিভিন্ন জায়গায় দর্শন করেছি। কিন্তু শিশু বয়সের সেই স্মৃতিটুকু মনে পড়লে আজো মনটা এক অনির্বচনীয় আনন্দে, তৃপ্তিতে ভ'রে ওঠে। আজো আমার সেই আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। একবার বাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছি। প্রতিবারই বাবাকে ফুলের মালা

শ্রীচরণে অর্পণ করে প্রণাম করি। কিন্তু সেবার গেটের সামনে কোন মালাওয়ালা আর বসে নেই। মনে খুব কষ্ট নিয়ে বাবাকে প্রণাম করছি। শ্রীচরণ থেকে মাথা তুলে দেখলাম যে মহারাজ একটা বিরাট ফুলের মালা আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। সেদিন ভক্তের আকুল প্রার্থনা ভগবানের অন্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। বিদেশে থাকাকালীন বাবাকে বার বার চিঠি দিয়েছি। পরীক্ষার সময়, কোন কাজ করবার সময় চিঠি দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ চেয়েছি। তিনিও বিদেশ দেকে আশীর্বাদ পাঠিয়ে মনের ভয়, কুণ্ঠা দূর করেছেন। আমার জীবন সার্থক হয়েছে—যে আমি তাঁকে দর্শন করেছি, তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছি সকল কাজে।

একবার মহারাজ ১৯৫৭ সালে ৭০/৮০ জন ভক্ত-শিষ্য নিয়ে অমরনাথ যাত্রা করেন। শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শনের শুভদিন। আগের দিন সন্ধ্যা হতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। কাশ্মীর সরকার মাইকে ঘোষণা করলেন যে তীর্থযাত্রীরা এই রকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন না। শ্রীশ্রীমহারাজ শুধু স্নিগ্ধমধুর হাস্যে বললেন যে পরের দিন ঠিক সূর্যদেব উঠবেন। ভয়ের কিছু নেই। পরের দিন সকালেই মেঘকে অপসারিত করে সূর্যদেব হাসলেন। মহারাজও অমরনাথ দর্শন করে হোম যাগযজ্ঞ করে সবাইকে হোমের টীকা প'রিয়ে দিলেন। সেদিন কাশ্মীরের অনেকেই তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে জীবন ধন্য করেছিলেন। আমরা সাধারণ মানুষ। ভগবানের অলৌকিক লীলার মাহাত্ম্য বুঝে উঠতে পারি না।

অমরনাথের দুর্গম তুষারাবৃত পথে একবার মহারাজ মোটরে করে যাত্রা করেছেন। পথে যেতে যেতে হঠাৎ চালককে বললেন যে গাড়ী অন্যদিকে ঘোরাতে। চালক ঠিক পথেই যাচ্ছিল কিন্তু মহারাজের বাক্য সে লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই গাড়ী উল্টোদিকে ঘুরিয়ে চালাতে লাগলো। কিছুদূর গিয়েই দেখতে পাওয়া যায় যে কিছু ভক্ত পরিবার ভুল জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা মহারাজের দর্শনের আশায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা ভেবেছেন মহারাজ এই পথ দিয়েই যাবেন। মহারাজ স্মিত হাস্যে তাদের দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করে চালককে বললেন গাড়ী পূর্বের সঠিক রাস্তায় ঘোরাতে। গাড়ীর চালক মহারাজের অলৌকিক মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় তিনি কখনো সাড়া না দিয়ে পারেন না। শ্রীশ্রীমহারাজ তাঁর বিভূতির প্রচ্ছন্নতায় সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখতেন যে ভগবানকে চিনে নেওয়া

ভক্তের পক্ষে মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে পড়ত। কত পাপী, তাপী, কঠিন রোগী, অনাথ, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই তাঁর চরণতলে আশ্রয়লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাঁর অপার মহিমা আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে কি করে বুঝবো!

শ্রীশ্রীমহারাজ বলেছেন—"গার্হস্থ্য জীবন, সংসার, বিষয় বা কর্ম কিছুই বন্ধনের কারণ নয়। অজ্ঞানই, বস্তুর যত্তবার্থ জ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞানই বন্ধনের কারণ। সংসারে দারাপুত্র পরিবেষ্টিত কর্মময় জীবনে অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক গিরিকন্দরে বাস করিলেই যে মুক্তি হইবে তাহা নহে, প্রত্যুত মুক্তি জ্ঞানে বা প্রেমে ভগবদনুরাগে অথবা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' হিংসা পাপত্যাগ কর, ধর্মে ব্রতী থাক, সৎ সঙ্গ সৎ বিচার পরায়ণ হও, সংযম দ্বারা কামকে পরাভূত কর, পরের দোষগুণ সমালোচনা পরিত্যাগ কর, নিরন্ত সত্য বাক্য ও সত্যাচরণ তৎপর হও এবং এইরূপে কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির অর্চনা করিয়া জীবনটিকে যজ্ঞরূপে সংকল্পে উৎসর্গিত করিয়া দেবলোকে বিচরণ কর।" "মানব-জীবনের প্রগতি ও কল্যাণ দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। এক, সর্বদাই নূতন নূতন শ্রেষ্ঠ কার্য্য করা। দ্বিতীয়, মনকে সর্বদাই নূতন অধ্যাত্ম বিচারে নিযুক্ত রাখা। কর্ম দ্বারা মানুষের লৌকিক অনুভব ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইবে; উহার মানসিক ভাবশুদ্ধি এবং তদ্দারা নিজেই নিজের স্বরূপ অবগত হইবার অবকাশ প্রাপ্তি হইতে পারে। ভগবান মানুষকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয় দিয়াছেন—কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়। তাই উভয়েব সম্যক পরিচালনা, পুষ্টি ও সাধন দ্বারা ঐহিক অভ্যুদয় ও আত্মিক নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে।

মহারাজ বলেছেন—"ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ সকল চিন্তার, ভাবনার ও স্মরণের শ্রেষ্ঠ। যেমন সূর্য্য ও তাঁর প্রভা, প্রদীপ ও তার শিখা অভিন্ন, সেই-রূপেই শ্রীনামই হলেন কৃষ্ণস্বরূপ এবং নামই আবার রসমূর্তি। ভাবেরই ঘনীভূত মূর্তি নানাকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে—তার নামই চৈতন্য স্বরূপ। এই নামই নিত্য শুদ্ধ, কোনও অপবিত্রতা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং নাম ও নামীর অভিন্নতা হেতু ইহা মুক্ত স্বভাব। আকাশ যেমন সর্বব্যাপী, বায়ু যেমন সর্বত্র-গামী সেইরূপই নামের তরঙ্গ বিভু ব্যাপক ও শাশ্বত স্থায়ী; তাই ব্যক্ত নাম স্পন্দনে অব্যক্ত চিদানন্দ লোকেও নামীর সঙ্গে নিত্যযুক্ত ও স্পন্দিত হইয়া তার সম্বেদন দ্বারে আঘাত করিতে থাকে। অব্যক্ত চৈতন্য সত্তার প্রথম অভিব্যক্তিই হইল শব্দ বা নাম এবং এই শব্দই ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জক তাই ইহাকে

শব্দ ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সমস্ত নামের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় চৈতন্য স্বরূপ বা ওঁকারে। সকল ছন্দের ঘনীভূত মূর্তিই হলেন ওঁকার বা প্রণব। অসংখ্য দেব দেবতার যে মন্ত্র সমস্তই পর্য্যবসান লাভ করে এই প্রণবেই এবং প্রণবই পুনঃ লয় প্রাপ্ত হয় অব্যক্ত চিৎ সত্তায়। আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, নিয়ত সৎ ভাবনায় ও সৎ উপাসনার দ্বারা সৎমতি ও সৎ স্মৃতি জাগাইতে পারিলেই আমাদের রসনাতে স্বতঃই পবিত্র নাম স্ফুরিত হইয়া ওঠে। ভগবানকে যদি আমাদের জীবনের মধ্যে বরণ করে নিতে পারি তাহলে আমাদের জীবনেও কোন অপূর্ণতা থাকবে না। তাঁর এই পরশ পাবার জন্য তারই এই অমৃতত্বের সামান্যতম আস্বাদন পেয়ে কত রাজা মহারাজা ধন, মান, সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠা সব ত্যাগ করে আত্মনিবেদন করেছেন—এই হোল পূর্ণ বৈরাগ্য। শ্রীগুরু কেবলমাত্র যন্ত্র নহেন তিনিও মানুষ। তিনি নিষ্ক্রিয় মানুষ নহেন তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব গঠনের লক্ষ্যে প্রবৃত্ত। তাঁর তাপস জীবনের গতিশীল ধারায় শিষ্যের চিত্তকেও গতিশীল করিয়া তোলাই ছিল শ্রীগুরু সাধনার অঙ্গ। তাই শিষ্যও জীবনে প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ হতে।"

"ভগবানের এই বিশ্বব্যাপ্ত মোহিনী আকর্ষণকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁকে আমরা ফাঁকি দিতে পারি না। জগৎভোগের বৈচিত্র্যতার মাঝে আমরা তাঁর ফাঁদে মাঝে মাঝে ধরা পড়িয়া যাইতে বাধ্য। বাহির মোদের শুক্তির মত কঠিন আবরণ হইলেও অন্তরে তাঁর তরে একটি কান্না ধন আছেই, তাঁকে বাদ দিয়া জীবনের মূল্য নাই। ভোগাসক্ত জীবনে শান্তি নাই, নিরুপদ্রবতা নাই, ভয়শূন্যতা নাই। নিজের স্বরূপ স্বনিলয়ে আত্মজ্ঞানে চিরন্তনী প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই তবেই শান্তি পরিতৃপ্তি ও পরানিবৃত্তি··· ইহাকেই মোক্ষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।"

গুরু প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ বলেছেন—"এই বেসুরো জীবনে আমরা সুর খুঁজে বেড়াচ্ছি। যেমন যাঁরা গানের শিক্ষা করেন তাঁরা যেমন সুর মিলিয়ে দেবার জন্য একজনার সাহায্য নেন—যাঁরা বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তাঁরা যেমন বিজ্ঞানকে জানবার জন্য শিক্ষক খোঁজেন। এই জন্য শিক্ষা এবং দীক্ষা এ দুটো হলো একই বস্তু। যে বিষয়ে আমাদের অনভিজ্ঞতা রয়েছে, যে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে সেটা যদি পরিহার করার জন্য, সে অজ্ঞানকে সে অনভিজ্ঞতাকে পরিহার করার জন্য, সে অজ্ঞানকে সে অনজ্ঞতাকে পরিহার করার জন্য যাঁদের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আছে কিম্বা যাঁরা আমার এই অজ্ঞানতাকে সরে যাওয়ার পক্ষে সহায়তা করতে পারেন,

এইরূপ ভাবে যদি আমার মধ্যে বিশ্বাস হয় এবং শ্রদ্ধা হয় তাহলেই গুরুর প্রয়োজন। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা।"

—আমাদের ভেতর যদি এই কাঙালত্ব ভাব আসে, এই তৃষ্ণা আসে যে আমরা এই অছন্দময় জীবনটাকে ছন্দময় করবো তাহলেই মন্ত্রের প্রয়োজন। মন্ত্রের অর্থই হলো শব্দ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। সেই শব্দ যেখানে ছন্দময় হয়েছে সেটাই মন্ত্র বা ছন্দময় শব্দ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ভেতরে এই সুরের কাঙালত্ব না হচ্ছে—এই সুরের জন্য একটা বাসনা, তৃষ্ণা বা স্পৃহা না জাগছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এই অসার জগতের মধ্যে অছন্দময় জীবনের ভেতর শান্তি খোঁজবার চেষ্টা করি কিন্তু পাই না। যখন বুঝতে পারবো যে এই মর জগতের ভেতরেও একটা অমরত্বের সন্ধান আছে তখন যাঁরা এই অমরত্বের আস্বাদন পেয়েছেন কিম্বা যাঁরা এই মরজগতে থেকেও অমর পথাশ্রয়ী হয়েছেন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সহকারে গ্রহণ করি। আমরা মনে করি তাঁরা আমাদের পথ দেখাতে পারবেন।"

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ সম্পর্কে শ্রীশ্রীমহারাজ বলেন—"এই জন্যেই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ জগতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু বাস্তবিক গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে পৃথকত্ব কিছু নেই। কারণ শিষ্যের ভেতর যে চৈতন্যময় সত্বা রয়েছেন গুরুর ভেতরেও সেই একই সত্বা রয়েছেন। তবে আমি সেটা যখন উদ্বোধন করতে পারছিনে তখন বাইরের কারো সহায়তা নিতে হচ্ছে, যাঁর দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে। গুরু শিষ্য সম্বন্ধও যদি স্বার্থ প্রণোদিত না হয় তবে জন্ম-জন্মান্তরের। একটি চৈতন্যময় একটি শরীর ধারীর দ্বারা মন্ত্র চৈতন্য করার জন্য দরকার। এমনকি আমরা স্বপ্নেও যদি মন্ত্র পাই তবুও সে মন্ত্র একজন শরীরধারী গুরুর দ্বারা চৈতন্যময় করিয়ে নিতে হয়। যারা এরূপভাবে গুরুকে সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম বলে নিতে পেরেছে তারা এইজন্য সেখানে চৈতন্যময় রূপ দেখবে। সেই জন্যই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। এটা হয়ে গেলে যেখানে নয়ন যায়—"যত্র যত্র নেত্র হেরে তত্র কৃষ্ণ স্ফূর্তি। স্থাবর জঙ্গমে হেরে না হেরে অন্য মূর্ত্তি।"

শরীর যদি নষ্টও হয়ে যায় কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই—আত্মা চিরন্তন—আত্মা শাশ্বত, তার কোন জন্মও নেই। মৃত্যুও নেই। তিনি কোন সময় ছিলেন না, কোন সময় থাকবেন না। এমন কল্পনা করা যায় না। এইরূপ

ভাবে আমাদের ভেতর এই সত্তাটা আমাদের মধ্যে Unconsciously self existence দিচ্ছে ও eternal existence-কে সর্বদাই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। আমাদের তাঁর থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। False identification-এর জন্য আমরা মনে করি এইসব বাধা বিপত্তি সরিয়ে দিয়ে আমাদের existence-কে রাখতে পারি। সেইজন্য মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করতে থাকি যাতে আমার মৃত্যু না হয়। "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।"

শ্রীশ্রীমহারাজের দীক্ষায় যোগ্য অযোগ্যের বিচার নেই। তিনি বলেছেন—"তুমি আমাকে চেয়েছো, পাবে।" আকুল হয়ে যে তাঁকে চেয়েছে, সেই তাঁর কৃপা লাভ করেছে। দীক্ষা প্রসঙ্গে মহারাজ বলেছেন—"যেদিন গুরু তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন—সেইদিনই তিনি শক্তিপাত করে নিজেকে তোমার মধ্যে দান করেছেন। তোমাকে এখন কেবল সাধনের দ্বারা তাঁর সেই দানের স্রোতটিকে চিরমালিন্য মুক্ত এবং অবাধ ক'রে রাখতে হবে।"

শ্রীশ্রীমহারাজ বলেন—"আমি শ্রীরাধাকেই সর্বদা স্মরণ করি। ওঁর ভাবেই নিজেকে সর্বদা ভাবিত রাখবার চেষ্টা করি।" সর্ব অলংকারে ও বেনারসী বস্ত্রে এবং উত্তরীয়ে সুসজ্জিত হয়ে তিনি যখন দেবীর পূজা করেন—তখন তার সেই অপরূপ রূপ শ্রীরাধাকেই মনে পড়িয়ে দেয়। তাই তিনি বলেছেন—

"দর্পনাদ্যে দেখি নিজ স্বরূপ মাধুরী,
আস্বাদিতে সাধ হয় আস্বাদিতে নারি
বিচার করিনু তারে আস্বাদ উপায়
রাধা তনু ধরিবারে মোর সাধ হয়।"

"রাধাকৃষ্ণলীলা একেরই দ্বিধা অভিব্যক্তি করিয়া হইয়াছে। নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পুনঃ নিজেকে নিজের মধ্যে আনিয়া এক হইতেছেন। রস স্বরূপে প্রেম স্বরূপে নিজের আত্মপরম আপন জ্ঞানে এক হইয়া নিজেই নিজের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। তাই রাসলীলায় এই কৃষ্ণগোপীমণ্ডলে প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক হইয়া লীলা করিয়াছেন। শ্রীরাধাই বহু বিগ্রহ গোপীগণ। শ্রীকৃষ্ণ বহু বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। এই রাসলীলায় বহুত্বের মধ্যেই পূর্ণ মিলনের একত্ব সূচিত হইয়াছে। দেহজ্ঞান নাই, আত্মীয়তা জ্ঞান নাই, কুলমানশীল পরমর্যাদাজ্ঞান নাই, কেবল আছে আত্মমিলনের রসাস্বাদন।"

শ্রীশ্রীমহারাজ বলেছেন—"যতক্ষণ একেবারে তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে না পারছো, ততক্ষণ সংযোগ আর বিয়োগ আছে। বস্তুত তিনি আর জীব তো

আলাদা নয়, তিনিই সর্বভূতের মধ্যে লীলা করছেন। সকলের মধ্যেই সেই তিনি, তাকে কি ব'লে বোঝাবে? তাকে শুধু সুন্দর বললে যে তাকেও সীমাবদ্ধ করা হয়। তিনি বিভু বস্তু, তাঁর সীমাকরণ করা সম্ভব নয়। অসুন্দরের মাঝেও সুন্দরকে উপলব্ধি করা—যে কথাটাও এক হিসাবে কথার কথা মাত্র, সেই সত্য দৃষ্টির বিকাশ হ'লে অসুন্দর ব'লে এই ত্রিভুবনে আর কিছুই থাকবে না। সবের মাঝেই তাকে দেখবে—তিনি সুন্দর, অসুন্দর, সূক্ষ্ম, স্থূল—সবই তিনি। তিনি অণু হ'তেও অণু, কেশাগ্র শতেক ভাগ—পুনঃ শতাংশ ক'রে তার চেয়েও সূক্ষ্ম। আবার তিনি মহৎ হ'তেও মহৎ। তাঁকে ধরবার, বুঝবার, জানবার চেষ্টাটি ভক্তিপথে, জ্ঞানপথে, কর্মপথে এবং যোগপথে—সকল পথেই হয়। সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞানও সাধন, ভক্তিও সাধন, কর্মও সাধন, যোগও সাধন। কিন্তু একাগ্র হয়ে জানবার চেষ্টা করতে করতে তিনি নিজে যখন স্বয়ং এসে সাধককে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নেন সাধক যখন তার মধ্যে প্রবেশ করেন—সেইটি হচ্ছে "পরাজ্ঞান"। তাঁর সঙ্গে মিশে গিয়ে 'তিনি' না হয়ে গেলে তাকে সমগ্র রূপে তত্ত্বতঃ জানা যায় না।

"যাহাকে আশ্রয় করিয়া কিছু করা যায় তাহাই শক্তি। মহাপ্রলয়ের সময় একমাত্র নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত চৈতন্য মাত্র সত্তায় শক্তি ও অনভিব্যক্ত বীজাকারে চৈতন্য মধ্যে সুপ্ত ছিল। শক্তির ইহাই সাম্যাবস্থা, ইহাই চৈতন্যের একাবস্থান অবস্থা। জগতের সর্বাবিকার, সর্ব দুঃখ-সংকট, আবিলতা-মলিনতা এই শুদ্ধ চৈতন্যের অব্যবহিত পরম প্রেমাস্পদা অভিন্নাত্মা-স্বরূপিণী। জগদম্বা বা মাতৃ-আশ্রয় না করিলে পরাহত করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বয়ং ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেও রাবণ বধের জন্য এই শক্তির অকালবোধন করিয়া তার প্রসন্নতা অর্জন করিয়া তবে অসুর নিধনে তাঁর সামর্থ্য লাভ হইয়াছিল।

মহারাজ প্রণাম প্রসঙ্গে বলেছেন—"শুধু কথায় কি হবে? গুরুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ ভক্তি—সেইটেই সবচেয়ে বড়। এই যে গুরুকে একবার মাহেন্দ্র ক্ষণে স্পর্শ করে প্রণাম করবে ব'লে শত শত নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। এই যে ব্যাকুলতা—শুধু একবার স্পর্শ ক'রে প্রণামের জন্য, এর মধ্য দিয়েও বহুজনের কল্যাণ হচ্ছে। গুরুর দু'টি অভিজ্ঞান হচ্ছে তাঁর দক্ষিণামূর্তি ও তার ধাম। দক্ষিণামূর্তি মানে যিনি তাঁর প্রসন্ন বরাভয় কল্যাণ মূর্তিতে তোমাকে নিত্যদিন পালন করছেন। যাঁর অভয় আশ্রয়ে তোমাকে জন্মজন্মান্তর ধ'রে পরিরক্ষণ করছেন। দক্ষিণামূর্তি মানে এমন একজন কেউ আছেন যাঁর কোলের উপরই আমরা রয়েছি। আর ধাম মানে প্রকাশ।

ভগবান যিনি স্বয়ং প্রকাশ, তাঁর প্রকাশকে শিষ্যের কাছে গোচর ক'রে দিয়ে যিনি শিষ্যকে সেই নিত্যধামের পথ প্রদর্শন করেন। সেখানে গেলে আর জন্ম মরণের পুনরাবৃত্তি থাকে না। যার বর্ণনায় উপনিষদ বলেন—"যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" তাই জন্ম "দক্ষিণামূর্তি" আর "ধাম" গুরুর স্বরূপের সঙ্গে এক। তাই গুরুই আমাদের আশ্রয়, আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের পরমাগতি।"

শ্রীশ্রী মহারাজ পৃথিবীর সর্বত্র যাতায়াত করছেন। পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অগণিত শিষ্য ভক্ত। তাঁর করুণাধারায় অবগাহন ক'রে কত শত পাপী, তাপী, দুঃখীজন শান্তি লাভ করেছেন। তিনিই স্বয়ং ব্রহ্ম। ভগবান স্বয়ং সকলের মঙ্গলের জন্ম কল্যাণকর কর্ম করে চলেছেন। সকলের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করবার জন্ম তিনি আধ্যাত্মিকতার বীজমন্ত্রে সকলকে দীক্ষা দিয়ে চলেছেন। এর আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু তাঁর অসীম করুণার ফল্গুধারা অবিরাম ব'য়ে চলেছে। এই ফল্গুধারায় আমরাও যেন অবগাহন ক'রে ধন্য হ'তে পারি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। শ্রীশ্রীমহারাজের আশীর্বাদ যেন সবসময় লাভ করতে পারি, এই প্রার্থনাই তার শ্রীচরণে সর্বদা জানাই।

মধুমিতা দাশগুপ্ত

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ

"হরি ওঁ মানে ঈশ্বর এক। হরি ওঁ মানে ঈশ্বরই সব। হরি ওঁ মানে ঈশ্বর আছেন। আর ঈশ্বর সাধনও আমার একার মুক্তির জন্ত নয়। আমাদের তপস্যা সকলের কল্যাণের জন্ত।" কে এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী কথা বললেন? কে বললেন—'আমার দেহ-মন প্রাণ আত্মা সব জগতের মঙ্গলের জন্তে তৈরী হচ্ছে? কোন মহাসাধকের উক্তি—"একটি মাত্র মন্ত্রের ভিতরে সর্ব মন্ত্রের বিরাজমানতা ও পরিপূর্ণতা স্পষ্টত উপলব্ধ হল"? কে তিনি যিনি বলেলন—"উল্লাসভরে গেয়ে উঠলাম, পেয়েছি ভাই আসল বীজের পেয়েছি সন্ধান?" "ওঙ্কার সর্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্বমন্ত্রের সমন্বয় এবং সর্বতন্ত্রের স্বীকৃতি"—কে এই উক্তির দ্বারা সাধন জগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন? হিন্দু-মুসলমান, ইহুদি, বৌদ্ধ-খৃষ্টান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার দিলেন কে? কে সেই মহাপুরুষ যিনি অভিক্ষু সন্ন্যাসী, আজীবন ব্রহ্মচারী? কে তিনি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করতে নিজের লেখা 'কর্মের পথে' বই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্রি করেছেন ও চারবার ইংরেজ-রোষে কারারুদ্ধ হয়েছেন? গুরুবাদের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দিলেন কে? কে 'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য'—এ অশ্রুতপূর্ব আদর্শের প্রচারক? কে দিলেন 'আদর্শ ছাত্রজীবন'? কার সৃষ্টি মানবজীবনের গীতা অখণ্ড-সংহিতা? কে সেই মনীষি যিনি চরিত্র গঠন আন্দোলনের প্রবক্তা?

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করে বলি ;—

—"আমি স্বরূপানন্দ বলছি। বলছি ইংরেজী ১৯৭৮ সালে। বলছি চরিত্রগঠন আন্দোলন সম্পর্কে। বলা শুরু করেছি ইংরেজী ১৯১৪ সালের কিছু আগে পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর শহরের নিকটবর্তী বিশাল ঘোড়ামারার মাঠে এক বিস্মৃত সন্ধ্যায়। চরিত্র-গঠন আন্দোলনের শুভ জন্ম সেখানে। আন্দোলন বিজয় পেলো কয়েক বছর পরে, কলকাতায় হেদুয়া মাঠের ঈশাণকোণে, আরেক সন্ধ্যাকালে। সে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।

ভিক্ষা বর্জিতভাবে কাজ চালু হল। আন্দোলন আর থামল না। ধারাবাহিকভাবে কাজ চলতেই থাকল। চলতে থাকল পত্রে, চলতে থাকল পুস্তকে, চলতে থাকল চিত্রে, চলতে থাকল প্রদর্শনীতে, চলতে থাকল ভাষণে, আর চলতে থাকল সঙ্গীতে। তারই ইতিহাস গানে গানে শোনাব। উদ্বোধ

এক নবমহাজাতির সৃষ্টি। যাঁদের বংশধরেরা হবেন ভাবী মানবজাতীয় সর্বজনীন সৌরভ, গৌরব এবং বৈভব। আপাততঃ আমাদের লক্ষ্য তিনশত বৎসর পরে এক অভ্যুত্থিত মানবজাতী অর্থাৎ আগামী নব্য প্রজন্মবাদে আমরা কাজ চালু রাখতে চাই।"

কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা, লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দের পথপ্রদর্শক ও প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রী স্বামীস্বরূপানন্দ ভারতবর্ষের মহাপুরুষের জগতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

শ্রীশ্রী স্বামীস্বরূপানন্দ ছিলেন নীরব কর্মযোগী, স্বাবলম্বী, সাধক, অভীপ্সু-সন্ন্যাসী, শিল্পী, একাধারে কৃষক ও কৃষি-বিজ্ঞানী, রাজমিস্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়ার, সুচিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ, কাঠমিস্ত্রী, দিগ্বিজয়ী বাগ্মী, সমাজসংস্কারক, বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক, দেশব্যাপী চরিত্র-গঠন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং দশলক্ষাধিক লোকের ধর্মগুরু, জগন্মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ পরমপুরুষ শ্রীশ্রী বাবামনি।

স্বরূপানন্দ অর্থাৎ যিনি নিজের স্বরূপের মধ্যেই, নিজের আত্মার মধ্যেই, নিজের সত্তার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঞ্ছিত সেই আনন্দের আস্বাদন লাভে ধন্যাতিধন্য;—সেই নিত্যানন্দ, সেই দিব্যানন্দ, সেই আত্মানন্দ, সেই পূর্ণানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিষ্ঠিত অযাচক সংঘ—যে সংঘের মূলমন্ত্র হল—

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

ভিক্ষার দ্বারা কোন দিনও মোক্ষলাভ সম্ভব নয়—কোন দিনও না। আর

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

যিনি বলহীন বা দুর্বল, তিনি আত্মাকে বা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন না।

অভীপ্সা ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। স্বাবলম্বন ছিল তাঁর লক্ষ্য। মহাপুরুষের নাম, প্রতিপত্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা থেকে তিনি ছিলেন শত সহস্র মাইল দূরে।

আনুমানিক ১৮৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর শহরে পৌষ মাসের এক পুণ্য মঙ্গলবারে শ্রীমৎ স্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রাদুর্ভূত আবির্ভূত হন। পিতা সাধক কবি শ্রীরমাকান্ত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতা

মমতাময়ী দেবী। শ্রীশ্রী ভোলাগিরি পরমহংসদেব যাঁকে কলির বশিষ্ঠ বলে ডাকতেন সেই পুণ্য শ্লোক হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পিতামহ।

দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরূপে স্বামী স্বরূপানন্দ—মানুষের প্রতি ভালবাসাই পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর শহরের বঙ্কিমচন্দ্র গাঙ্গুলীকে চরমপন্থী বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় বি-এ পরীক্ষা দেবার আগে। দেশপ্রেমের আগুন বার বার তাঁকে কারান্তরালেও নিয়ে যায়। তিনি বলতেন, দেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করে ফেলে দেশকে মুক্ত করতে হলে দেশকে সত্যি সত্যি নিজের মায়ের মত ভালবাসতে হবে। তা না হলে মাতৃভূমির যথার্থ মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

স্বামীস্বরূপানন্দের লেখা "কর্মের পথে" বৈপ্লবিক বইটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের গীতা। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বইতে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান—

"দেশ চায় মানুষ। যে মানুষ অশনি আঘাতে নতশির হইয়া পড়িবেন না, যাহারা তেজস্বিতা বিভীষিকা দেখিয়া ম্লান হইবেন না, কায়-কলুষে জীবন সাধনাকে যিনি বিসর্জন দিবেন না,—দেশ চায় তেমন মানুষ। দেহ যাহার বজ্রের ন্যায়, বীর্য্য যাহার অপরিমেয়, মনুষ্যত্ব যাহার অভ্রভেদী, দেশ চায় তেমন মানুষ। দেশ চায় তাঁহাদের—যাঁহাদের স্বজাতি প্রীতির শান্তি সিঞ্চনে দুঃখ দগ্ধ দেশের অনন্ত দুর্ভাগ্য ঘুচিবে, যাঁহাদের কর্মপ্রেরণায় তোমরা আপন চিনিবে। দেশ চায় তোমাকে—জাগ্রত তোমাকে, কর্মঠ তোমাকে,—আত্মশক্তিতে চিরনির্ভর পরায়ণ তোমাকে। স্বদেশ তোমার সাধনা চায়, তোমার তপস্যা চায়, পতিতের উত্থান লাভে তোমার আত্মোৎসর্গ চায়।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সকল বিপ্লবী যুবক তরুণ ইংরেজের বুলেটের মুখে নিজেদের বুকের তাজা রক্ত অঞ্জলি দিয়েছিলেন দেশমাতৃকার চরণে তাঁদের অনেকেরই ছিল এক হাতে রিভলভার আর এক হাতে কর্মের পথে। তাই ইংরেজ-সরকার অন্ততঃ চার বার স্বামীস্বরূপানন্দকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ—শ্রীশ্রী বাবামণির সান্নিধ্যে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনেক বই পড়েছেন এবং কর্মের পথে ইত্যাদি বই নিয়ে বিপ্লবী দলের নেতা, দলের নেতা মাষ্টারদা সূর্য সেনকে দিতেন। মাষ্টারদা সেই বই বিপ্লবী তরুণ কর্মীদের পড়বার ব্যবস্থা করে দিতেন।

বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন খ্যাত বিপ্লবী লোকনাথ বল শ্রীশ্রী বাবামণির আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

দেশকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে ভালবাসতে হবে দেশের মানুষকে, দেশের

দুঃখী মানুষকে ; করু মানুষের সেবা করতে হবে, তাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করবার জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং অন্তরের সঙ্গে সে দায়িত্ব নিলে তবেই সত্যি সত্যি দেশকে ভালবাসা হবে। শ্রীশ্রীবাবামণির এই দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রানিত বহু জ্ঞানী-গুণি এবং দেশনেতা।

আমাদের প্রাণের বাবামণি শুধু মাত্র সাধু ছিলেন না ; তিনি একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকও ছিলেন। ভারতমাতার মুক্তি আন্দোলনে বাবামণির অবদান তুচ্ছ নয়. কম নয়, অ-নে-ক।

কর্মযোগী, স্বাবলম্বী, অভিক্ষু সন্ন্যাসী স্বামীস্বরূপানন্দ—সারা বিশ্ব জুড়ে যে বিরাট কর্মপ্রবাহ চলেছে সেই কর্মপ্রবাহ শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমবেদনা ছিল। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"Work is God, work is Religion."

মানভূমের রুক্ষতাকে দুপায়ে মাড়িয়ে, শক্ত পাথর খুঁড়ে, মঙ্গলসাগর সৃষ্টি করেছেন। বছরের পর বছর তিনি গাইতি চালিয়েছেন, লাঙ্গল চালিয়েছেন. কোদাল চালিয়েছেন ; সিকি মাইল দূর থেকে জল এনে চাষ করে নানা শাক-সব্জী ও ফসল ফলিয়েছেন। কৃষির উৎসাহ বর্ধনের জন্ত উৎপাদিত ফসল, নানাপ্রকরে ফলের ও বৃক্ষের চারা, শাক-সব্জীর বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন জনসাধারণের মধ্যে। সবুজ বসন্তকে নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ধানবাদের চাষ-থানায় পুপুনকিতে। সেখানকার গৃহনির্মাণ জলাশয় কোন কিছুর জন্তে তিনি কোন স্থপতির দ্বারস্থ হন নি। পুপুনকি আশ্রমের একশত বিঘা অরণ্যভূমি তাঁরই কর্মপ্রবাহে শস্ত-শ্যামলা অপরূপা।

১৩৩৮ সালে শ্রীশ্রী বাবামণি কর্মযোগ সম্পর্কে বলেন—

"কর্মযোগই যে এ যুগে অবলম্বনীয়. তাতে সন্দেহ নেই। কর্মহীনের জ্ঞান ও ভক্তি এ যুগে ক্ষীণ ও কৃশাঙ্গ হয়েই থাকবে। কিন্তু কর্মযোগীকে ভুললে চলবে না যে, তার সকল কর্মের পূর্ণসার্থকতা ভগবানকে জানায়, ভগবানকে ভালবাসায়। কর্মযোগ প্রচার কত্তে গিয়ে আমরা যদি আবার ভক্তি বিদ্বেষী জ্ঞানবিরোধী একটা cult সৃষ্টি করে বসি, তাতে কিন্তু কোন লভ্য নেই।"

কর্ম ও কর্মযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"মাটিতে কোদাল মারতে যে শব্দটি হবে, তাকে ওঙ্কার বলে মনে মনে কল্পনা কর্বে। মাটির বোঝা ফেলতে যে ঝুপ করে শব্দটি হবে, তাকেও প্রণব বলেই চিন্তা কর্বে। অত্যন্ত কোলাহল কর্বে না, নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলবে না, বোঝা নিয়ে এক এক পা অগ্রসর

হবে আর পদধ্বনিকে ঈশ্বরের নাম বলে অনুভব কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। শুধু কর্মই আমি তোমাদের কাছে চাই না, চাই—কর্মের মধ্য দিয়েও পরমাত্মার সঙ্গে অফুরন্ত যোগ।”

কৃষি সম্পর্কে শ্রীশ্রী বাবামণির ১৩৩৮ সালের বক্তব্য ১৩৭৪ সালেও ভাস্বর এবং সর্বজন গ্রাহ্য।

“কৃষির আয় অতি পবিত্র আয়। কোনও মানুষকে প্রতারিত না করিয়া, কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া না নিয়া, নিজের সম্মান অটুট অক্ষত রাখিয়া, স্বকীয় চরিত্রে একটি মাত্র কলঙ্ক রেখাও পড়িতে না দিয়া অন্নার্জ্জন একমাত্র কৃষকেই করিতে পারে। ভূমি-লক্ষ্মীর সেবা এই জন্যই আর্য্য-ঋষিরা স্বহস্তে করিতেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে করিতেন। পেট ভরিয়া খাইবার মত পুণ্য নাই,—একথা তোমরা আমার নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছ এবং পেট ভরিয়া পরমা তৃপ্তির সহিত খাইতে হইলে যার যার অন্ন তার নিজ নিজ হস্তে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।”

‘ভিক্ষা করব না অথচ জনসেবা করব’—এই ছিল শ্রীশ্রী বাবামণির পণ। এ যেন সোনার পাথরবাটি। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাই করেছেন—তার স্বাক্ষর পুপুনকি আশ্রম। জনসাধারণ তো দূরের কথা শিষ্যবর্গের কাছেও তিনি একটি কপর্দকেও যাচ্ঞা করেন নি। বরং প্রয়োজনে তাঁদের দিতেন।

শ্রীশ্রী বাবামণির আশ্রমের নাম অযাচক আশ্রম। তাই তাঁকে বলা হয়,—‘অভিক্ষু সন্ন্যাসী’। ‘অভিক্ষা ব্রত’ অবলম্বনের মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছে। এই ব্রত পালনের জন্য বিরাট ধনী পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি দিনের পর দিন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাটিয়েছেন। তবু কারো কাছে ভিক্ষে চান নি বা চাঁদার খাতা নিয়ে ঘোরেন নি। সর্পসঙ্কুল বাসস্থানে থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে কাঁচা ঝিঙে, পলাশফুল সেদ্ধ, ঢেঁকল পাতা সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছেন। একদিকে অনবরত উপবাস ও অন্যদিকে দিনে আঠার ঘণ্টা পরিশ্রমে প্রায় দু'বছর রক্তবমি করেন; তবুও তিনি অভিক্ষাব্রত ছাড়েন নি। আর তাইতো তিনি অভিক্ষু সন্ন্যাসী আমাদের প্রাণের শ্রীশ্রীবাবামণি!

এক ছাত্রকে লেখা শ্রীশ্রী বাবামণির কবিতার কিছু অংশ মনে পড়ে—

“দুর্ব্বলের তরে নাই
জগতের কোনও মঙ্গল,
ভিক্ষা আর শক্তিহীন

একমাত্র ক্রন্দন সম্বল,
পর মুখ পানে চায়
করে শুধু হায়,
দুয়ারে দুয়ারে তার
ঘটে শত লাঞ্ছনা কেবল,
দুঃখে আর অপমানে
তার নেত্রে সদা বহে জল।"

অভিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীশ্রী বাবামণির বক্তব্য সুস্পষ্ট :—

"অভিক্ষা শুধু তোমাকেই কষ্টসহিষ্ণু করিবে না, তোমার স্পর্শে যত লোক আসিবে, সবাইকে করিবে : এইজন্য অভিক্ষা নবযুগের নূতন মন্ত্র।"

সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার ও গায়ক স্বামীস্বরূপানন্দ—শ্রীশ্রী বাবামণির রচিত শতাধিক গ্রন্থ মানবজাতির এক অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। গল্প, উপন্যাস বাবামণি লেখেন নি। কিন্তু যে লেখা একটি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, যে লেখা মানুষকে স্বাবলম্বী করে, চরিত্রবাণ করে, যেলেখা মৃত্যু-পথযাত্রীকে বাঁচিয়ে তোলে, যে লেখা পাপীকে সাধুক করে সেই লেখা লিখে শ্রীশ্রী বাবামণি মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। আমরা পূর্বতন ঋষিদের কাছ থেকে পেয়েছি মনুসংহিতা, ইত্যাদি। আর বর্তমান যুগের ঋষি স্বামী—স্বামীস্বরূপানন্দের কাছ থেকে পেয়েছি এক অমূল্য মহাগ্রন্থ—অখণ্ড-সংহিতা। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন হতে আরম্ভ করে অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু ও মরণোত্তর পর্যন্ত জীবনের এমন কোন জটিল সমস্যা বা প্রশ্ন নেই যার উত্তর শ্রীশ্রী বাবামণির মহাগ্রন্থ অখণ্ডসংহিতায় নেই। এই মহাগ্রন্থ ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যের এক বিস্ময়কর চূড়ামণি, ভারতীয় কর্মজীবন ও ধর্মজীবনকে একসূত্রে গ্রথিত এক মহাভারত।'

একদিন প্রমাণিত হবে এই অখণ্ডসংহিতা মানুষের বাল্যকালের লীলাভূমি, যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

শ্রীশ্রী বাবামণির সহস্র সহস্র কবিতা ও গান যুগ যুগ ধরে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। কবিতার মাধ্যমে তিনি প্রায়ই চিঠির উত্তর বা উপদেশ দিতেন। বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন ছাত্র যুবককে লেখা কয়েকটি কবিতার কিছু অংশ :

শত বাধা শত বিঘ্ন করুক গর্জ্জন,
সিংহ ব্যাঘ্র করুক না তীব্র আক্রমণ
তথাপি নির্ভীক প্রাণে. ১

আপন লক্ষ্যের পানে
উল্কার মতন বেগে করহ গমন,
ভয়ে ভুলিও না চিরসাধনার ধন।
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর শত অপমান,
নির্যাতন, অত্যাচার পর্ব্বত-প্রমাণ,
সব দলি পদতলে
আত্মবিশ্বাসের বলে
আপন অভীষ্ট পথে হও আগুয়ান,
—তিমির নিবিড় নিশা হোক্ অবসান।
সম্মুখে চাহিয়া দেখ, তব ভবিষ্যৎ
কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল, কেমন বৃহৎ,
ধ্যান মগ্ন বিধাতার
অপরূপ সৃষ্টিকার
রচিছে বৈচিত্র্যময় মূরতি মহৎ!
অগ্রসর হও পুত্র, এ তোমারি পথ।"

আর একটি পত্রের কিছু অংশ :—

"চাহি সেই প্রেমময়
প্রাণময় সুন্দর হৃদয়,
কোনো দুঃখে, কোনো বিঘ্নে
যাহা কভু বিচলিত নয়,
যে পরাণে বাজে শুধু
পরার্থের মোহন রাগিনী,
যে অন্তরে জাগে সদা
ব্যথিতের সুকরুণ ধ্বনি,
পরেরে আপন করি'
নিজ বক্ষে ঠাঁই দিতে চায়,
হে পুত্র, জানিও নিত্য,
সেই স্বর্গ পায় এ ধরায়।

শ্রীশ্রী স্বামীস্বরূপানন্দ কয়েক হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার ও গায়ক ছিলেন। কয়েক হাজার সঙ্গীতের অধিকাংশই বাবামণির সুর দেওয়া। স্বরচিত ও নিজের সুরারোপিত গান

যখন তানপুরা বাজিয়ে গাইতেন তখন মনে হত যেন দেবী সরস্বতীর বরপুত্র বীণার ঝংকারে একটার পর একটা সুর বাজিয়ে চলেছেন, কোথাও তার ছন্দের পতন নেই, লয়ের বিরাম নেই—এক অপূর্ব স্বর্গীয় মূর্চ্ছনায় দেবলোকের পরিবেশ বিরাজিত। ভক্ত শ্রোতাদের দু'চোখ বেয়ে অবিরাম তৃপ্তির আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।

শ্রীশ্রীবাবামণি রচিত দুটি গান :—

একলা আমি মুক্ত হতে
চাই না প্রাণনাথ ;
আমায় তুমি যুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ ॥
সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক এ জীবন-পাত ॥
সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক না সেদিন ;
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত ॥

*　　*　　*

মধুর শ্রীনাম জপিতে জপিতে
জীবন যেন গো বহিয়া যায়,
বিষয়ের বিষ—প্রলোভন পানে
নয়ন যেন না ফিরিয়া চায় ॥
রসনা যেন গো গাহি নাম-গান
আকুলিত করে জগতের প্রাণ
প্রাণ ভরি করি প্রেম-রস পান
নিজে জাগে আর সবে জাগায় ॥
তোমারি সরস পরশ লভিয়া
হরষে নাচিয়া ওঠে যেন হিয়া,
আপনারে তব চরণে সঁপিয়া
তাপিত পরাণ যেন জুড়ায়।

নাহি যেন বাছি ছোট বড় জাতি,
সকলেরে যেন দেই কোল পাতি,
তোমারি সেবায় রহি দিবা-রাতি
প্রাণ যেন লোটে সবার পায় ॥

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ বহুবার শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে সঙ্গীত আলোচনায় গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন।

দু' একটি ক্ষেত্রে বাবামণির গানের স্বরলিপি অতি বিনম্র-চিত্তে আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব নিজের হাতে লিখে পাঠিয়েছেন। আলাউদ্দীন খাঁ বাবামণির একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

মন্দির, মূর্চ্ছনা, মধুমল্লার, মংগলমুরলী প্রভৃতি শ্রীশ্রী বাবামণির রচিত গানের বই। শ্রীশ্রী বাবামণি তাঁর মায়ের নামে নামাঙ্কিত করে নিজেই এক রাগিনীর সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম—"মমতারাগিনী"। ভক্তজনের কাছে স্বরূপানন্দ সংগীত এক বিরাট আকর্ষণ। শ্রীশ্রী বাবামণির কণ্ঠের রেকর্ড শুনলে মনে হয় তিনি কত উচ্চাংগের সংগীত সাধক ছিলেন।

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা" চলচিত্র শ্রীশ্রীবাবামণির এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।"

সঙ্গীতের শক্তি সম্বন্ধে শ্রীশ্রী বাবামণির বক্তব্য অতি স্পষ্ট :—
"সঙ্গীত একটা জাতিকে অতলে ডুবাইয়া দিতে পারে, আবার ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রে নিরাপদ ভেলার ন্যায় পারও করিয়া দিতে পারে। কুসঙ্গীত বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ, উন্নতিশীল বীর্য্যবান জাতিকে দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্ত ও ক্রীতদাসে পরিণত করিতে পারে। সৎসঙ্গীত অধঃপাত বিপন্ন নিরুপায় দুর্ব্বল জাতির কর-চরণ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। কেমন গান গাহিবে, কেমন গান শুনিবে, কেমন গান লিখিবে, তাহার সিদ্ধান্ত ইহা বুঝিয়াই করিও। যাঁহাদের সঙ্গীত মানুষকে বল বিতরণ করে, তাঁহারা সর্ব্বজীবের নমস্য।"

আয়ুর্বেদাচার্য স্বামীস্বরূপানন্দ :—লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে স্বামী স্বরূপানন্দ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন একজন সুচিকিৎসকরূপে স্বীকৃত। আশ্রমে ১৩৩৪ হইতে ১৩৫৩ পর্যন্ত বছরে দুই হাজার এবং ১৩৫৩ হইতে মাসে দেড় হাজার রোগীর চিকিৎসা বিনামূল্যে হইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ রকমের আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তিনি তাঁর আশ্রমে প্রস্তুত করেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা, সর্পাঘাতের চিকিৎসা প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। তাঁর ওষুধের মধ্যে অমৃতারিষ্ট, অশোকারিষ্ট, শূলশঙ্কর, মৃত্যুঞ্জয়রস, মৃত্যুরাজ রসায়ন, পর্ণপত্রী, বিশুদ্ধ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, প্রসিদ্ধমাম্রিস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুপুনকির আশ্রমের বিভিন্ন ঔষধপত্রাদির নানা গাছ-গাছড়ার চাষ করা হয় এবং ইহার পর এই সকল হতে ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বেনারস আশ্রমে নিত হয় ও তথায় ঔষধাদি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ সকল কাজে অনাথ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক বহু নরনারীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্নসংস্থান হচ্ছে। বহু ঔষধ শ্রীশ্রী বাবামণি হিমালয় থেকে সংগ্রহ করেন। উন্মাদ, মৃগী, সর্পাঘাতে চাপট চিকিৎসা, রক্তচাপ এবং বহু দুরারোগ্য-ব্যাধির চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। এমনকি স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ও বহু রোগী চিকিৎসার জন্যে স্বামীস্বরূপানন্দের কাছে পাঠাতেন। স্বয় চৈতন্যপূর্ণ, ব্রহ্মচর্য সাধনে সহায়ক বীর্যধারণে সক্ষম বিন্দু বন্ধু ব্রহ্মচর্য বান্ধব প্রভৃতি অসাধারণ ঔষুধ।

বহু ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও ভাল করতে না পেরে অগত্যা ১৯৩৪-৩৫ সালে বাংলাদেশের রংপুরের রায়বাহাদুর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃগী রোগে আক্রান্ত তাঁর পুত্র শ্রীসুহৃদ কুমারকে চিকিৎসার জন্য স্বামীস্বরূপানন্দকে পুপুনকি আশ্রম থেকে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য সুহৃদকুমার শ্রীশ্রী বাবামণির চিকিৎসায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন।

বর্তমানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিখ্যাত কবিরাজ আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়কে ১৯৮৪ সালের ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় কলকাতার কাকুড়গাছি আশ্রমে নিয়ে যাই শ্রীশ্রী বাবামণিকে দেখাবার জন্যে শ্রীশ্রী মামণির নির্দেশে। বহু বিখ্যাত বড় বড় এলোপাথ ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার শ্রীশ্রী বাবামণিকে দেখেছেন। শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয় একবার দেখুন এ ইচ্ছে শ্রীশ্রী মামণি অনেক বার প্রকাশ করেছেন। শ্রীশিবকালি ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে শ্রীশ্রী বাবামণিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন—"উনি খুব ভাল আছেন—বহু দিন থাকবেন।" আমিও এ্যালোপ্যাথী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখলাম—বেশ ভালই আছেন। চেয়ারে বসে যেন কোন এক সাধন-মার্গে বিচরণ করেছেন। আমি শ্রীশিবকালীবাবুকে বললাম—ঈশ্বর করুণ আপনার কথা যেন ঠিক হয়; তবে আমরা মনে করি উনি ভক্তদের আকুল প্রার্থনা উপেক্ষা করতে পারছেন না।

বর্তমান আশ্রম কেন্দ্রবিন্দু শ্রীশ্রী মামণি তখনকার আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সংহিতাদি—পরম যত্ন ও সমাদরে শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রসাদ খাওয়াতে খাওয়াতে শ্রীশ্রী বাবামণির শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করলেন। শিবকালীবাবু চরণ স্পর্শ করে শ্রীশ্রী বাবামণিকে প্রণাম করে বলেন—আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রে ওঁনার অগাধ পাণ্ডিত্য আমি জানতাম—তবে আজ একজন প্রকৃতিজ্ঞানের মহাপুরুষ দর্শন করে আমার জীবন সার্থক হল।" রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময়ে শ্রীশ্রী বাবামণির গল্প করতে করতে গাড়ী করে বাড়ী ফিরলাম।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে স্বামী স্বরূপানন্দ

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে একটা অগ্নিগর্ভ সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নেতৃবৃন্দ হিমসিম খাচ্ছেন। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন। শত সহস্র লোক বক্তক্ষরা আন্দোলনে মৃত। এ সমস্যার কথা শ্রীশ্রীবাবামণি একাধিকবার বলেছেন এবং তার সমাধানের নির্দেশও দিয়ে গেছেন ; আজ নয়, আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে।

সাম্প্রদায়িক উদারতার আবশ্যকতা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন,—"হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নাই। ভেদের কল্পনা যারা করেছে বা কচ্ছে তারা মানবজাতির বন্ধু নয়, তাহারা সভ্যতার শত্রু। যে, যেভাবে আনন্দ পায়, সেই ভাবে নিজের ধর্মের আচরণ সে করুক, তাতে সহিষ্ণুতা থাকা সভ্যতার পরিচায়ক। মুসলমান আল্লাহো ধ্বনি কর্লে হিন্দুর ধর্ম যায় না, হিন্দু হরি ওঁ ধ্বনি কর্লে মুসলমানের ধর্ম যাওয়া উচিত নয়। মুসলমান মহরমের বাজনা বাজালে হিন্দুর ধর্ম যায় না, হিন্দু দেবারাধনার বাজনা বাজালে মুসলমানের ধর্ম যাওয়া উচিত নয়। মুসলমান তাঁর আজানের ধ্বনি কর্লে হিন্দুর ধর্ম যায় না, হিন্দু তার স্তোত্রপাঠ কর্লে মুসলমানের ধর্ম যাওয়া উচিত নয়। এইরূপ উদারতার মনোভাব যতকাল না আসবে বন্ধুগণ, ততকাল ভারতের শত শত জননেতা বৃথাই তাঁদের বক্ষরক্ত দেশ এবং সমাজের সেবায় অঞ্জলি ভরে দান কর্বেন।"

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলেন,—"আমি হিন্দু চিনি না, মুসলমানও চিনি না, আমি চিনি মানুষকে। তুমি কি পরস্বাপহরণ কর? যদি কর, হিন্দু হলেও তুমি নিন্দনীয়, মুসলমান হলেও তুমি নিন্দনীয়। তুমি কি পরের দুঃখে ব্যথা অনুভব কর? যদি কর, হিন্দু হলেও তুমি বন্দনীয়, মুসলমান হলেও তুমি বন্দনীয়। তুমি কি নারীর সতীত্ব-মর্যাদায় হস্তক্ষেপ কর? যদি কর হিন্দু হলেও তুমি অমানুষ, মুসলমান হলেও তুমি অমানুষ। তুমি কি নারীর সতীত্ব মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ কর্ত্তে পার? যদি পার হিন্দু হলেও তুমি দেবতা, মুসলমান হলেও তুমি দেবতা। তুমি কি মিথ্যা, জুয়াচুরী, অন্যায় ও অধর্ম আচরণ কর? যদি কর, হিন্দু হলেও তুমি পতিত, মুসলমান

হলেও তুমি পতিত। তুমি কি প্রাণের বিনিময়েও সত্যপথ ও ধর্মপথ পরিত্যাগ করতে সম্মত? যদি অসম্মত হও, তবে তুমি হিন্দু হলেও পূজার পাত্র, মুসলমান হলেও তুমি পূজার পাত্র।…আমি মানুষ চাই এবং সেই মানুষ যে সম্প্রদায়ের ভিতরেই দেখতে পাই না কেন, তারই আমি পূজা কর্ব্ব।"

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের উদাত্ত আহ্বান……"সাম্প্রদায়িক অন্ধতা-রূপ যে বিষধরী সর্পিনী নিরন্তর দংশন করে আমাদের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে, তার হাত থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাবার জন্য আজ আমাদের সকলের সম্মিলিত ভাবে একাগ্র চেষ্টার প্রয়োজন পড়েছে।"

অলৌকিকতা প্রচারে বিমুখ শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ

অলৌকিকতা থেকে শত যোজন দূরে থাকতেন শ্রীশ্রী স্বামীস্বরূপানন্দ এবং ভক্তদের বলতেন অলৌকিকতা প্রচার থেকে দূরে থাকতে। মানুষকে অবশ-অকর্মণ্য-নির্বোধ করতে তথাকথিত অলৌকিকতা বা ভোজবাজি অদ্বিতীয়। দুঃখি মানুষের অশান্ত মনকে মোহাচ্ছন্ন করে দেয়—জ্ঞানবুদ্ধি বিবর্জিত হয়ে এর পিছনে ঘুরে বেড়ায়, মানুষের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা লোপ পায়। তবু অলৌকিকতা আমাদের আকৃষ্ট করে চুম্বকের মত। গুরুদের অলৌকিক কাহিনী ভক্তরা প্রচার করে থাকেন অনেকেই। আমিও আমার গুরুদেবের কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা শুনেছি এবং দেখেছি যার বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা মেলেনি। আর তাই মেনে নিয়েছি—এ সকল একটা শক্তি—সাধনার ফলশ্রুতি।

"ওঙ্কারের জয়যাত্রা" সিনেমার শুটিংয়ে একটা দৃশ্যে ছিল—ব্রহ্মপুত্রের জল দু'কূল ভাসিয়ে আশে-পাশের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সে সুটিং যখন চলছে তখন ব্রহ্মপুত্র শুকিয়ে শীর্ণ-ক্ষীণস্রোতা। সবাই শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞেস করলেন—'এ দৃশ্য কি করে নেওয়া সম্ভব।' শ্রীশ্রীবাবামণি বললেন—'ক্যামেরা রেডি কর, সব ঠিক আছে।' তারপর উপস্থিত সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলেন—ব্রহ্মপুত্র উত্তাল, খরস্রোতা, দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত—শ্রীশ্রীবাবামণির তিনটি তুরিতে। ছবি তুলতেই আবার যে-কে সেই।

একবার বেনারসের এক জনবহুল বস্তীতে আগুন লেগেছে। আগুন নির্বাপণের কোন ব্যবস্থা নেই। সব দাউ দাউ করে পুড়ছে, চারিদিকে

কান্নার রোল, বাঁচার আকুতি, আর্তনাদ। আশ্রম কর্মী ও ব্রহ্মচারীগণ ছুটেছেন বালতি-কলসী নিয়ে জল দিয়ে আগুন নেবাতে। শ্রীশ্রীবাবামণি খুবই অসুস্থ তাই যেতে পারলেন না। কিন্তু যখন দেখলেন বহু চেষ্টায়ও আগুন নিব্‌ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে;—তখন তিনি কোন রকমে উঠে মন্ত্র পড়ে এক গণ্ডুষ জল ছুঁড়ে দিলেন ;—মুখে বললেন—'আগুন নির্বাপিত হোক।' আগুন নিবে গেল, বহু মানুষ, ঘরবাড়ী বাঁচল। জানি না এসব কি অলৌকিক না মন্ত্রশক্তি না ইচ্ছাশক্তি! নয় নয় করে এরকম হাজারো ঘটনা ঘটেছে—যা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমিত ছিল বা এখনও আছে।

আশ্রমবাসিনী আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া মাতা ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর গল-ব্লাডার ও অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের পর রাজেন্দ্রলাল স্ট্রিটের আশ্রমে পেথিডিন ইন্‌জেকশান দিয়েও ঘুম হচ্ছে না ; যন্ত্রণায় ছটফট করছেন আর—'বাবা আর পারি না' বলে কাতর হয়ে কাঁদছেন। ভক্তের ভগবান শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ মাকে বললেন—'সাধন তুই বিদেহী হইয়া যা'। মা কিছু সময়ের জন্য বিদেহী হয়ে যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেলেন। এ ঘটনা সাধন ভজনের শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়া মা সাধনা দেবী ঘাটশীলায় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমতি ছায়া রায় ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দদের নিজের মুখে বলেছিলেন।

বিরাট অপারেশনের পর ভক্তগণের অনুরোধে মা সাধনা দেবীকে ঘাট-শীলার চাঁদমহলে কিছুদিন রাখা হয়েছিল। সেই বাড়ীতে ভূতের ভয়ে কোন লোক যেতে পারত না। নানা প্রকার অদ্ভুত ভীতিপ্রদ ঘটনা ঐ বাড়ীতে ঘটত। শ্রীশ্রীবাবামণি একরাত্রি কাটাবার পর বললেন—"দ্যাখ এই বাড়ীতে অনেকগুলো অতৃপ্ত আত্মা মুক্তির জন্য ছটফট করছে। আমি এদের মুক্তির জন্য তোদের নিয়ে একটা সমবেত উপাসনা করতে চাই। তারপর তিনি নিজে হাতে ওঙ্কার-বিগ্রহ তৈরী করে উপাসনা করলেন। তারপর থেকে চাঁদমহল সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায়নি। লোকজন বাস করছে। প্রসঙ্গত সেই 'ওঙ্কার বিগ্রহ' এখনও ঘাটশীলার ছায়া নীড়ে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে রয়েছে।

আমিও সামান্য দিনের সান্নিধ্যে যা দেখেছি তা যুক্তি তর্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। আমি ডাক্তার বলে অধিকাংশ শারীরিক অসুস্থতার উপরই কৌতুহলী ছিলাম। হেমিপ্ল্যাজিয়ার অর্থাৎ অর্ধাংগ অবশ, নাড়তে পারেনা বহুদিন ধরে বহু চিকিৎসাও করেছেন—ভাল হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই ; এমন একজন ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে এলেন। আমি দেখলাম। কথা

বলতে বলতে শ্রীশ্রীবাবামণি বললেন—'কৈ দেখি কি হয়েছে তোর' বলে হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—'যা কিছুই হয়নি'। অবাক ও বিস্ময়ে দেখলাম গুরুভাইটির হাত ঠিক হয়ে গেছে। এ ম্যাজিক, না অলৌকিক কিছু; মন্ত্রশক্তি না ইচ্ছা শক্তি। এমন কি মৃত্যুপথযাত্রী মেডিক্যাল কলেজের রোগীমায়ের জন্য কন্যার আকুতিতে সাড়া দিয়ে বিগ্রহের প্রসাদি ফুল শ্রীশ্রীবাবামণি হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন—'যা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে।' পরবর্তীকালে দেখলাম তিনি আরোগ্য লাভ করে আশ্রমে এসেছেন।

একবার আমি বলেছিলাম,—'বাবা দেহধারীরূপে আমাদের মধ্যে আপনি আরও পঞ্চাশ বছর থাকুন, আমরা কত সমস্যার পরি—আপনার কাছে আসি। আপনি তার সমাধান করে দেন—পথ দেখান। মন দিয়ে শোনেন।' একটু চেয়ে থেকে হেসে বললেন—'ত্যাখ বলার মত বলতে পারলে ছবির সামনে বললেও আমি শুনতে পাই।' আমি বল্লাম—আমরা তো বাবা সেরকম ভক্ত নই, আর বলার মত বলতে পারবও না। কিছু না বলে শ্রীশ্রীবাবামণি শুধু হাসলেন। তার কিছুদিন পর একদিন সকালে উঠে ঘণ্টাখানেক জপ করলাম। তারপর ছবির সামনে বল্লাম—'আমি তোমার তেমন ভক্ত নেই—কিন্তু মনে দ্বিধা—কি করে সম্ভব ছবির সামনে কথা বল্লে শুনবে—এটা আমায় জানিয়ে দাও। দুদিনের মধ্যে তুমি আমায় খবর দিয়ে আশ্রমে নেওয়াবে।" বলে চেম্বারে যাব বলে কাপড়জামা পড়তে পড়তে মনে মনে এ ছেলেমানুষির জন্য হাসছি ;—এর মধ্যে ফোন বেজে উঠল, —আশ্রম থেকে ; শ্রীশ্রীবাবামণি আমায় ডেকেছেন আশ্রমে দেখা করার জন্য।' আমি অধম কিন্তু অপার তাঁর করুণা, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।— সেদিন বিকেলে আশ্রমে গিয়ে প্রনাম করতেই হেসে বল্লেন—কি হয়েছে,— গুরুকৃপা করলে সবই সম্ভব। তবে বিশ্বাস করাই ভাল। সেই থেকে এ ধরনের পরীক্ষা আর করিনি। তখন শ্রীশ্রীবাবামণির একটা লেখা মনে পড়ল—

"অনাদি অসীম অনন্ত আমি
সসীম হইনু তোদের তরে,
উদার বিশাল বিপুল আকাশ
প্রবেশিল এক ক্ষুদ্র ঘরে॥
সবারে শিখাতে প্রেমের মিলন,
ধরিনু মুরতি কত অগণণ ;
সবারে লইয়া খেলিতেছি খেলা
দিবস-রজনী বিশ্বভরে॥"

ব্রহ্মচর্য প্রচারে স্বামী স্বরূপানন্দ

শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ আজীবন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যের ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপে স্বামীস্বরূপানন্দ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সরল ব্রহ্মচর্য, সংযম সাধনা, কুমারীর পবিত্রতা, সধবার সংযম, জীবনের প্রথম প্রভাত, আত্মগঠন, অসংযমের মূলোচ্ছেদ, বিবাহিতের জীবন সাধনা, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি গ্রন্থ এক-একটি অমূল্য সম্পদ।

অভিক্ষার ঋষি জাতিকে স্বাবলম্বী করার জন্যেই ব্রহ্মচর্য প্রচার করেছেন, কারণ তিনি মনে করতেন স্বাবলম্বের মাধ্যমেই ভারত তাহার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করবে। ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে স্বামীস্বরূপানন্দ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ওজস্বিনী ভাষায় মর্মস্পর্শী অভিভাষণ সমূহ প্রদান করে তরুণ যুবকদের আত্মগঠনে সহায়তা করেছেন। শিক্ষার সহিত চারিত্রিক মাধুর্যের সমন্বয়-সাধনাকে বিদ্যার্থিবর্গের ইহপরকালের অভ্যুদয়ের পক্ষে একান্তই আবশ্যকীয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তাই তাঁর এই প্রচার-অভিযান।

দেশের একটা চরম সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ উল্কার বেগে প্রদেশের পর প্রদেশ পর্যটন করে বেড়িয়েছেন এবং বজ্রকণ্ঠে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে উদ্ধারের নিশানা দেখিয়েছেন। সেই উপদেশে কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষের দুর্বলতা ছিলনা, ছিলনা কোন মিথ্যাকে সত্য বলে চাপিয়ে দেওয়ার বাহাদুরী কিংবা মানুষের বিভ্রান্ত মনকে বিপথে পরিচালনা করে নিজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের কুমতলব ;—বরং ছিল তাতে অকপট শুভেচ্ছায় জাতিকে বিনা প্রতিদানে সেবা দেওয়ার শুভ ইচ্ছা।

১৩২৬-২৭ সালে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছিলেন—"বলহীন বীর্যহীন, ক্লীবপ্রায়, আত্মচেতনাহীন জাতি কি কখনও নিজেকে দুঃখ, দৈন্য ও পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারে? শক্তিহীনের কি কখনও পর-মুখাপেক্ষিতা ঘোচে? দুর্বলের ললাটে কি কখনও রজতরাগদীপ্ত রাজটীকা শোভা পায়, না, চিরদাসত্বের পুতিগন্ধময় পঙ্কলেখা সে-ললাট হইতে কেহ কখনও মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়?"

স্বামী স্বরূপানন্দ উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানান—"অধঃপতিত, সর্বস্বান্ত, পরপদবিদলিত ভারতবর্ষে আজ যে সর্বাগ্রে চাই মানুষ, আজ যে সর্বাগ্রে চাই তেজোদীপ্ত, অদম্যসাহসী, দৈববলে বলীয়ান, অসাধ্য সাধনক্ষম, বলবান্ বীরের আত্মোৎসর্গ।

আমি তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই ॥
বিভীষিকা দেখি হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যার সকল স্বার্থ,
দীন-দুঃখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই" ॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নিঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই।
তাদেরি লাগিয়া পিপাসী নয়ন
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদেরে
পাগল হইয়া যাই ॥"

সংযমসাধনায় শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন—"দরিদ্রের যেমন ক্ষুধা বেশী, দুর্ব্বলের তেমন কাম বেশী। ঋণ-প্রার্থিগণ যেমন মহাজনের পিছনে পিছনে ঘোরে, কাম এবং রোগ, দুঃখ, মনঃপীড়া, হতাশা, অবসাদ প্রভৃতি কামের পরমপ্রিয় অনুচরেরাও তেমন দুর্ব্বলের পদানুসরণ করে। সুতরাং যে প্রকারেই হউক, তোমাকে সবল ও শক্তিমান হইতেই হইবে।" আর "ব্রহ্মচর্য্যই মহাশক্তির মূল উৎস।"

'বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য' শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সমাজ সংগঠনমূলক তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ। বিবাহের অভিব্যক্তি, বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্যে প্রচলিত আপত্তিসমূহ ও তাহাদের যোগ্য উত্তর, সন্তান জনন, আদর্শ দম্পতির কি কি আবশ্যক, দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন এবং এই ধারাতেই আগামী দিনে সৃষ্টি হবে এক অভ্যুন্নত মানবজাতি।

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ বলেন—"একাগ্র, উদগ্র, দৃঢ় এবং একনিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা ক্রোমোসোমের সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ যে করা যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস না করিবার কারণ দেখিনা। যোগীরা যে ইচ্ছার শক্তিতে দেহের প্রত্যেকটি

অণু-পরমাণুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নদীর উপর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতে পারেন, ঊর্ণনাভতন্তু অবলম্বনে শূন্যে বিচরণ করিতে পারেন, সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করিতে পারেন, বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারেন, শিলামধ্যে বা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে পারেন—এই সকল কথা জড়বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত করিবার উপায় না-ও থাকে, তথাপি সঙ্কল্পের শক্তিতে যে ইচ্ছানুযায়ী পুত্র-কন্যা জনন সম্ভব, তাহা অতি সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ইহাকে অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া বিধিমত সঙ্কল্পের সাধনা করিবে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, সন্তান জরায়ুতে প্রবেশ করার পরে চেষ্টা-উদ্যোগ করার অপেক্ষা সন্তান জরায়ুতে প্রবেশের পূর্বে চেষ্টা-উদ্যোগ করা অধিকতর ফলপ্রসূ এবং বুদ্ধিসঙ্গত।"

"স্বামী এবং স্ত্রী যখন দৈহিক মিলনে রত হন, তখন সদ্যো দেহত্যাগী মৃতদের আত্মাসমূহ এই গর্ভে প্রবেশ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে জড় হয়। বায়স্কোপের টিকিট কিনিবার জন্য বা চন্দ্রনাথের মেলার সময়ে রেলের কামরায় ঢুকিবার জন্য লোকে যেমন ঠেলাঠেলি করে, ব্যাপার কতকটা তদ্রূপ। পিতার শুক্র শুক্রকোষ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাতৃযোনীতে পতিত হইবামাত্র বিশকোটি পুংবীজ বা শুক্রকীটের প্রত্যেকটিকে এক একটি আত্মা আসিয়া আশ্রয় করে এবং এই নির্দ্দিষ্ট মাতৃগর্ভের পবিত্রতার অনুযায়ী পবিত্র যে আত্মা আছে, মাতৃগর্ভস্থ স্ত্রীবীজের আকর্ষণের দ্বারা সে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অপর সকল পুংবীজাশ্রয়ী আত্মাসমূহকে পিছনে ফেলিয়া নিজে সবলে যাইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতঃ স্ত্রীবীজ মধ্যে মিলিত হয়।"

"সহবাস ব্যতীত কখনও সন্তান জন্মাতে পারে না, একথা ঠিক; কিন্তু কামগন্ধহীনভাবে সহবাস হতে পারে। সেই সহবাসে ভোগলিপ্সা নেই, আছে কর্ত্তব্যবুদ্ধি। তাতে মত্ততা নেই, আছে মনের গভীর স্থিরতা, আছে হৃদয়ভরা কল্যাণ-প্রেরণা। আছে আত্মবিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, দেহাতীত তত্ত্বে মনকে ডুবিয়ে রাখার অপার যোগ্যতা।"

"যোগী জানেন, বীর্য্যাধানে জীবোৎপত্তি হয়, কিন্তু বীর্য্যাধান কালেও মানুষ তার মনকে এমন অপার্থিব অবস্থায় রাখতে পারে, যার খোঁজ পেতে বৈজ্ঞানিককে আরও অনেক শতাব্দী খাটতে হবে।"

"সন্তান জননরত গৃহীরা সকলেই কামুক নন, কিন্তু কামাচারী প্রত্যেকেই। মনশ্চাঞ্চল্য প্রশমনের জন্য জননকালে তিনি প্রাণায়াম কত্তে পারেন, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি ও লক্ষ্য রেখে দেহের স্পন্দনে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, এবং এইসব

কৌশলের মাহাত্ম্যে দেখসুখের প্রার্থনাকে এবং দেহসুখের অনুভূতিকে দূর করে দিয়ে নিষ্কাম হতে পারেন, কিন্তু তাঁর যা ব্যবহার, তাকে কামাচারই বলব। শত শত জনে যা করে থাকে কামের দায়ে, যোগাভ্যাসী গৃহী তাই করে যাচ্ছেন কামলিপ্সাহীন হয়ে—এইটুকুমাত্র পার্থক্য। উনি কামাচারী, কিন্তু কামুক নন। কামাচারকালে, কামের অভাব হেতু তাঁর কোন প্রকার দৈহিক কামানুভূতি থাকে না। গৃহস্থ যোগী বলেন, দেহটাকে দেহের কাজে নিযুক্ত করে দিয়ে তিনি এমন এক অপূর্ব অবস্থায় এসে পড়েন যে, দেহ তাঁর আছে কি নেই, সেই খেয়াল পর্যন্ত থাকে না। সে-সময় কেউ যদি তাঁর পায়ের একটা আঙুল কেটে নিয়ে যায়, তিনি তাও টের পান না।"

তাই শ্রীশ্রীবাবামণি মানবজাতির উদ্দেশ্যে বলেন—

"প্রেম বিনা জীবনের
সব অন্ধকার,
চিত্তশুদ্ধি বিনা প্রেম
ধরে মিথ্যাচার,
সাধন বিহীন শুদ্ধি
বৃথা পণ্ড শ্রম,
না হয় সাধন
বিনা ইন্দ্রিয়-সংযম।"

"কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সাধক মাত্রেরই সংযমের সাধনা একান্ত আবশ্যক। কারণ, ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে না। ভোগলালসায় যে অধীর, তার নিকটে শ্রীভগবানের প্রেমরাজ্যের কোনও নয়ন-বিমোহন আলেখ্য আসিয়া আত্মপ্রকটন করে না, কোনও অনুভূতি সহজে ধরা দিতে চাহে না।......যেখানে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম ব্রত পালন করা একান্ত অসাধ্য, সেই স্থলে অন্ততঃ ঋতুমতী অবস্থায় পাঁচদিন, রবিবার, বৃহস্পতিবার এই দুইটি বারে, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এই তিনটি তিথিতে জিদ করিয়া স্বামী-সংসর্গ-বিরহিতা হইয়া থাকিবার চেষ্টা করা উচিত।"

সাধকরূপে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ

যে শিশুর জন্ম এক অলৌকিক, অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব অকল্পনীয় ঘটনাবলীর প্রবাহে সমৃদ্ধ তাঁর সাধন জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে এ আর আশ্চর্য কি? শিশু

জন্মগ্রহণ করে নয়দিন হাসেনি, কাঁদেনি, চোখ মেলে দেখেনি, মলমূত্র ত্যাগ করে নি—বিশেষজ্ঞদের মতে যে ছিল নিষ্প্রাণ—সাধনভজন কীর্তন মুখর গৃহে নয়দিন পরে সেই নিষ্প্রাণ শিশুটি আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়ে কাঁদল, হাসল, চোখ মেলে চাইল। এক অলৌকিক জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সূচনা করল। ধরাধামে আবির্ভূত হলেন শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ আমাদের প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ের রাজা শ্রীশ্রীবাবামণি।

গৃহে, বনে-জঙ্গলে, গুহায়, পাহাড়ে পর্বতে বছরের পর বছর সাধনা করলেন এবং অবশেষে সিদ্ধিলাভ করে মানব কল্যাণের জন্য মানুষের মাঝে এসে কর্ম ও ধর্মের সমন্বয় করলেন শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ। খুঁজে পেলেন বীজ মন্ত্র। গঠন করলেন অখণ্ডমণ্ডলী। প্রচার করলেন হিন্দু মুসলমান ইহুদি স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যে প্রণব মন্ত্র।

তাঁর ভাষায়—

"আবাদ করতে মন ছিল না,
বন্ধু কে এক এসে চাষার বিদ্যা
শিখতে হবে বললে হেসে,
বন্ধ কঠিন এই পাথরে,
ফুটবেরে ফুল থরে থরে
মরুভূমির শুষ্ক বেলার মাজরে
সবুজ বেশে
বললে হেসে হেসে——!"

তিনি বলেন,—

"মনের জমির তো চাষ চলল। কিন্তু কোন বীজ এতে বপন করব? বীজে বীজে দ্বন্দ্ব, বীজে বীজে পার্থক্য। শাক্তের, শৈবের, বৈষ্ণবের মন্ত্র আলাদা আলাদা। হিন্দুর, মুসলমানের ইহুদির আর খৃষ্টানের মন্ত্র এক নয়। কোনটা ধরব, কোনটা ছাড়ব, কোন বীজ সব ঋতুতে বপন চলে? কোন বীজ সব মাটিতে ফলে?

একটা একটা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম জপ শুরু হল। প্রত্যেকটি নামের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার চেষ্টা চলল। পরীক্ষা চলল সমাধানও হল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেল। একটিমাত্র বস্তুর ভিতরে সর্ববস্তুর উপস্থিতি, একটিমাত্র তত্ত্বের ভিতরে সর্বতত্ত্বের প্রতিশ্রুতি এবং পরিণতি। একটিমাত্র মন্ত্রের ভিতরে সর্বমন্ত্রের বিদ্যমানতা ও পরিপূর্ণতা স্পষ্ট উপলব্ধ হল। নির্ভুলভাবে জানা

গেল সব মন্ত্রই এক, এক মন্ত্রই সব। উল্লাসভরে গেয়ে উঠলাম, পেয়েছি ভাই আসল বীজের পেয়েছি সন্ধান।

পেয়েছি ভাই আসল বীজের পেয়েছি সন্ধান
বীজের জন্ম খুঁজেছি এই বিশ্বজগৎখান।
....
পরশমণি ঘরে এল
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল
পরশমণি ঘরে এল ওঁ—ওঁ—ওঁ।
অভয় পরাণ সবার সুখে
করল আত্মদান
হরি ওঁ, হরি ওঁ হরি ওঁ ।

হরি ওঁ মানে ঈশ্বর এক। হরি ওঁ মানে ঈশ্বরই সব। হরি ওঁ মানে ঈশ্বর আছেন।"

শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন—"ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু। ভগবানই সত্যি-কারের 'তুমি', সত্যিকারের 'আমি' সত্যিকারের 'সে'। 'আমি', 'তুমি', 'সে' এদের কোনও পৃথক তাত্বিক সত্যতা নেই, এ সবই সত্যস্বরূপ সারাৎসার ভগবানের বিচিত্র প্রকাশ। নিত্য সত্য ভগবানকে সকলের ভিতর দর্শন কর। পুত্রকে কোলে নাও, দোষ কি? পুত্রের মধ্যে ভগবান যে আছেন, দেখে নাও। স্বামীকে সোহাগ কত্তে দোষ কি? স্বামীর ভিতরে যে ভগবান আছেন, তা দেখে নাও। সকল কাজে সকল ব্যাপারে যখন যার যেটুকু সংশ্রবে আসছ, তার সম্পর্কে যোগ্য কর্তব্য পালন কর, কিন্তু তার ভিতরে যে ভগবান আছেন তা দেখে নাও। যখন একাকিনী থাকবে, তখন তোমার নিজের ভিতরে যে ভগবান আছেন, তা দেখে নাও। জেনে নাও, ভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং একমাত্র সত্য। 'আমি' 'আমি' বলে যখন পড়শীর সঙ্গে কলহ কর, তখনও জানো যে 'আমি' বলে কেউ নেই, আছেন একমাত্র ভগবান। 'তুমি' 'তুমি' বলে যখন প্রিয়জনের সঙ্গে প্রেম কর, তখনও জানো যে, 'তুমি' বলে কেউ নেই, আছেন একমাত্র ভগবান।"

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

অর্থাৎ "যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে প্রেরণ করেন, সেই ত্রিলোক প্রসবিতা ত্রিগুণস্রষ্টা ত্রিকাল-সৃজনকারী পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ স্বতঃপ্রকাশ তেজের ধ্যান করি।" শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলেন—"ব্রহ্মগায়ত্রী গানকালে মনে মনে

এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তুমি স্ত্রী বা পুরুষ যাহাই হও না কেন এবং যে বংশেই জন্মিয়া থাক না কেন, গায়ত্রী-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেছ, ব্রহ্মতেজ তোমার মধ্যে স্ফুরিত হইতেছে; ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্রাদি তপঃসিদ্ধ ঋষিদিগের সামর্থ্য তোমার মধ্যে পুঞ্জীভূত হইতেছে।"

শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ তাঁর প্রবর্তিত উপাসনা সম্পর্কে বলেন—"সমবেত উপাসনা সবাইকে এককরার জন্য প্রবর্তিত। সমবেত উপাসনাকালে একমাত্র ওঙ্কার বিগ্রহই পূজার বেদীতে থাকবেন; কেন না—ওঙ্কার সর্বমন্ত্রের প্রাণ, সর্বমন্ত্রের সমন্বয় এবং সর্বতত্ত্বের স্বীকৃতি। এই একটি মন্ত্রের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত মন্ত্র বিরাজিত, সমস্ত তত্ত্ব স্বীকৃত। সুতরাং ওঙ্কার বিগ্রহ পূজার আসনে বসলে আর অন্য কোনও বিগ্রহ বা প্রতিচিত্রের সেখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আর নানাবিধ বিগ্রহ বা প্রতিচিত্র একজায়গায় জড় করলে কৌলিন্য-অকৌলিন্য নিয়ে দ্বিধা আসবে। কি দরকার সে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সৃষ্টি করার?"

নাম জপ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের সহস্র উপদেশ বাণী আছে, আছে নাম জপের প্রক্রিয়া, কৌশল ও উপযোগিতা সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য। তিনি বলেন—"অমৃতময়, আনন্দময়, নিত্যসুখপ্রদ নাম পাইয়াছ। সেই নামের সেবা করিতে থাক—এক মনে, এক প্রাণে, এক ধ্যানে এক লক্ষ্যে। ......শ্বাস-প্রশ্বাসে কর, হৃৎস্পন্দনে কর, হস্তপদ সঞ্চালনে কর, শরীরের উত্থান পতনে কর, সর্ব্বাবস্থায় কর, সকল ধ্বনির সাথে কর।... ...নাম করিতে করিতে আপনিই সকল অজ্ঞাত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার তুমি লাভ করিবে। নাম করিতে করিতেই বেদ ব্রহ্ম তোমার মধ্যে জাগরিত হইবেন। অজ্ঞান মানব তখন তোমার স্পর্শমাত্র জ্ঞানলাভ করিবে।

.... সংসারে শাশুড়ী, দিদি শাশুড়ী প্রভৃতির সেবা যত্ন প্রভৃতি কর্তব্য কর্ম নিষ্ঠাপূর্বক করিবে এবং সেই সমস্ত কার্য্য করিবার সময়ে মনে মনে চিন্তা করিবে, যেন তুমি ভগবানেরই সেবা করিতেছ।......স্বামী, পুত্র, দেবর, ভাসুর, শ্বশুর, শাশুড়ী, চাকর, চাকরাণী, প্রতিবেশী, প্রতিবেশিনী সকলের ভিতরই ভগবান রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি নিজ নিজ সাংসারিক মর্য্যাদানুযায়ী কর্তব্য পালন করিবার সময়ে মনে রাখিবে যে, উহাদের ঐ ঐ ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড পরমেশ্বরই লীলা করিতেছেন এবং প্রত্যেকের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কর্তব্যানুরূপ সেবা

দিবার কালে তুমি সেই একেরই সেবা করিতেছ।...কখনও দারুণ ভয়ের উদ্ভব হইলে মন বক্ষে রাখিয়া, চরিত্র মধ্যে অত্যধিক বাচালতা প্রকাশ পাইলে মন কণ্ঠমূলে রাখিয়া, ইন্দ্র চপলতা প্রশ্রয় পাইতে চাইলে মন যোনিমণ্ডলে রাখিয়া নাম জপিবে। অপরাপর সময়ে নাম জপ করিতে সচরাচর মনকে ভ্রূমধ্যে রাখিবে।

......"এই নাম দিয়েই ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব। এই নামেই দেবতার দেবত্ব, ঋষির ঋষিত্ব। এই নামেই আত্মারাম পুরুষের পরিপূর্ণত্ব।......নামকেই জান বন্ধু, স্বজন, মাতা, পিতা, প্রভু এবং পতি। নামকেই জান গুরু এবং আশ্রয়দাতা।"

গুরু ও গুরুবাদ সম্পর্কে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ

গুরুবাদ, গুরুতত্ত্ব, গুরু ও শিষ্য সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষের মনের শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর সহজ সরলভাবে শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ দিয়েছেন। সেই সকল উপদেশাবলীর সংকলিত গ্রন্থ 'গুরু' বর্তমান এবং ভবিষ্যত মানবজাতীর বেদরূপে পরিগণিত হবে। সেই অমূল্য পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার গ্রন্থ থেকে দু-এক পৃষ্ঠা তুলে দেওয়া হল।

"প্রকৃত গুরু" সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তব্য : "আমার মতে তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বুক ঠুকে বলতে পারেন,—সত্যের জন্য আমাকে অগ্রাহ্য কর, এমন কি অবাধে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত কর, কেন না এ জগতে সত্যই সর্বাপেক্ষা গুরু, তার তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর সকল কিছুই লঘু, যোগৈশ্বর্য্যও লঘু, ইন্দ্রপদ ও লঘু, তেত্রিশকোটি দেবতার প্রসাদও লঘু। তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বলতে পারবেন, যদি প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে কিছু পাও, তবেই আমাকে যেন, নইলে ছেঁড়া কাঁথার মত আমাকে বর্জন করো, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের মত আমাকে বর্জন করো, রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের অশুচি বস্ত্রখণ্ডের মত আমাকে বর্জন করো। যথার্থ গুরু বলবেন,—অনুমানে আমাকে মানতে যেও না, মানতে হয় ত' প্রত্যক্ষে নির্ভর করে মানো। যথার্থ গুরু বলবেন,—আমার কথায়, আমার চিন্তায়, আমার কার্য্যে যদি অসত্য দেখতে পাও, ওটা আমার একটা লীলা বলে মনকে ফাঁকি দিও না, অসত্যের প্রতিবাদ কর্ত্তে—নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান হয়ো, মিথ্যা অমান্য করো।"

গুরু ও ভগবান সম্পর্কে তিনি বলেন—ভগবানকে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কে দেখিয়ে দেবে? যিনি দেখেছেন, তিনিই দেখিয়ে দেবেন এবং

যাঁকে দেখবেন, তিনিও দেখিয়ে দেবেন। ভগবানকে চাও কি? তবে শুধু ভগবানের কথাই ভাবো। পথ-প্রদর্শকের কথা ভেবে ভগবানকে ভোল কেন? ভগবানেরই জন্য পাগল হও, তোমার আর ভগবানের মধ্যে আবার আর একজনকে এনে ব্যবধান জুটাও কেন? ভগবানের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ যোগ হোক্। ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে যখন তুমি আকুল-অধীর হবে, তখন যদি মধ্যপথে সহায়ক কেউ জোটেন, জুটুন। না জুটলেই বা বৃথা চিন্তা কেন? ধ্রুবের গুরুর দরকার হয়েছিল। কিন্তু ধ্রুব 'গুরু' 'গুরু' বলে কাঁদেন নি, 'হরি' 'হরি' বলেই কেঁদেছিলেন। 'হরি' নামে কাঁদতে কাঁদতেই তাঁর গুরুলাভ হল। দীক্ষা লাভের পরেও ধ্রুব 'গুরু' গুরু' করে জীবন কাটান নি, গুরুকে ভুলে গিয়ে গুরুদত্ত নাম নিয়ে শ্রীহরিকেই ডেকেছিলেন। হরিই ছিলেন ধ্রুবের লক্ষ্য, নানা উপলক্ষ্যের মধ্যে গুরু ছিলেন একজন। লক্ষ্যের জন্য উপলক্ষ্যকে ত্যাগ করা যায়, বিস্মৃত হওয়া যায়।"

"গুরুর যোগ্যতা" প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামনি বলেন;—"কাণে একটা মন্ত্র দিলেই গুরু হওয়া যায় না, গুরু হওয়া বড় শক্ত কথা। আজকাল এই যে অত সহজে একজন আর একজনের গুরু হচ্ছে, তার ফল কি জানো? যত্ন করে, কষ্ট করে গুরুপদবী লাভ কত্তে হল না বলে গুরু তার মনুষ্যত্বে খাটো হন। আর মনুষ্যত্বে খাটো হন বলেই বিদ্রোহী শিষ্যকে ক্ষমা কতে পারেন না, আশীর্ব্বাদ করে বলতে পারেন না,—সত্যের জন্য আমাকে বর্জ্জন কর, আমার প্রতি মোহাবৃষ্ট হয়ে সত্যকে অবমাননা করো না।' বর্তমানের প্রচলিত এই গুরুবাদরূপ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র বিদ্রোহ দেখেও বুঝতে পাচ্ছে না যে, বর্তমান যুগধর্ম্ম exploitation (পরের মাথায় হাত বুলান) সহ্য কর্ব্বেনা। যুগধর্ম্ম চায় না, দুটো সংস্কৃত শ্লোক আউড়েই কেউ গুরু হয়ে যাক্, হঠযোগের দুটো প্রক্রিয়া দেখিয়েই কেউ তোমার জীবন তরনীর কর্ণধার হোক্। পরন্তু নিজের জীবনের জলন্ত মনুষ্যত্ব দেখিয়েই বর্ত্তমানের গুরুকে শিষ্যের মনুষ্যত্ব প্রযাসী চিত্তকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। তাতে গুরুরও লাভ, শিষ্যেরও লাভ।"

"কুলগুরুর সম্মান" সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট,—"সদগুরু যদি পেয়ে যাও আর সাধন কর্ব্বার জন্য অন্তরে যদি প্রবল আগ্রহ এসে থাকে, তাহলে "কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে নরক হবে," এরকম সেকেলে শাসন বাক্য অগ্রাহ্য কত্তে ভয় পেয়ো না। তবে কুলগুরু বংশ বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কিছু কিছু ধন প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং তা

থেকে তাঁদের বঞ্চিত করো না। দীক্ষা তাঁদের কাছ থেকে নাও নি বলে তাঁদের যোগ্য সম্মান কত্তে কখনো কুণ্ঠিত হয়ো না।"

'দীক্ষার শক্তি' প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন—"—দীক্ষার প্রতাপে জগতে অনেক মাতাল মদ ছেড়েছে, অনেক অসতী সতীধর্ম্মে ফিরে এসেছে, অনেক প্রবঞ্চক ও প্রতারক সৎ, সাধু, সজ্জনে পরিণত হয়েছে। দীক্ষা অনেক দোদুল্যমান-চিত্ত নরনারীকে একনিষ্ঠ, একলক্ষ্য, একমুখ, একাগ্র ও অধ্যবসায়ী করেছে। দীক্ষা অনেক দুর্ব্বলকে বল দিয়েছে, অনেক পাপীর পাপ হরণ করেছে। অনেক দুঃশাসন দুর্ম্মতিকে সুসংযত ও সুন্দর করেছে। দীক্ষা একটা হলেও সুপ্রথা, জীবের কুশলকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রথার আর্বিভাব।

বর্ত্তমান গুরুবাদ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেন,—গুরু কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিয়াছেন—'গু' মানে 'অন্ধকার', 'রু' মানে 'অন্ধকার নিবারক। সুতরাং তিনিই গুরু যিনি অন্ধকার দূর করেন। তাহা হইলে যিনি অন্ধকার দূর করেন না, তিনি কি করিয়া গুরু হবেন? যিনি অন্ধকার দূর করিতে পারেন না, তিনি কি করিয়া গুরুর গুরুতর পদবী দাবী করিবেন?—যাঁহারা বর্ত্তমান দেশ প্রচলিত গুরুবাদ সমর্থন করে তাহাদিগকে আগে এই প্রশ্নের জবাব পাইয়া লইতে হইবে।

অনেক শাস্ত্র যাঁহার অধ্যায়ণ করা আছে, কথায় কথায় যিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত শ্লোক উদ্গার করিতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাঁর নিজ জীবনের মধ্যে এক কণিকাও নাই, তিনিই কি গুরু?—বর্ত্তমান গুরু-বাদকে এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইবে।

যে সকল গুরু বলেন,—গুরুত্যাগে মহাপাপ, তাঁহারা কসাই। যাঁহারা বলেন,—অযোগ্য গুরু ত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ কর, তাঁহারাও কসাই। শিষ্যকে পরমার্থের লোভ দেখাইয়া উভয়েই জানিয়া শুনিয়া শিষ্যের গলায় ছুরি চালাইয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ গুরু হইতেছেন বর্ত্তমান গুরুবাদের প্রধানতম স্তম্ভ। শিষ্যের জীবনে সত্য লাভের বিদ্যুন্ময়ী প্রেরণা জাগিয়া বজ্রের সৃষ্টি না করিলে এই স্তম্ভদ্বয়ের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান শিষ্যের অন্ধ অনুরক্তিই ইহাদের প্রতিষ্ঠাকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতেছে।

আমি কখনই মনে করি না শিষ্যের পুরুষাকারকে পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া নিজের গুরুত্বকে স্পর্দ্ধিতশির হইতে দিবার অধিকার কোনও গুরুর আছে। বর্তমান গুরুবাদ যেখানে যেখানে শিষ্যকে পুরুষকার বিমুখ ও দৈব

নির্ভর করিয়াছে, সাধনে পরাঙ্মুখ কৃপার লোলুপ এবং অলস করিয়াছে, সেখানে সেখানেই সে তাহার স্বকীয় শেষ সমাধি নির্মাণ করিয়াছে।"

গুরু প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ আরও বলেন,—"মন্ত্র দিলাম, শিষ্য করিলাম, জীবনের মতন তোমাদিগকে আমার দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিলাম, বর্ষে বর্ষে তোমাদের কাছ হইতে টাকার থলি উপহার লইলাম, আর খুশী হইয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ পত্র পাঠাইলাম, তোমাদের সঙ্গে আমার এইটুকু সম্পর্ক নহে। আমি কি তোমাদের কাছে কোনও আদর্শ ধরিতে পারিয়াছি? আমি কি সত্যই তোমাদের জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে কোনও নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন মূল্যায়ণ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি? আমি কি তোমাদিগকে অচলায়তনের প্রস্তরপুঞ্জ ভাঙ্গিয়া কারাগারের বাইরে উন্মুক্ত দিবালোকে সাহস সহকারে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য কোনও পাথেয় দিতে পারিয়াছি? তোমরা আগে যাহা ছিলে, তাহা হইতে তোমাদের কোনও নূতনতর পরিবর্ত্তন বা বিবর্তন সাধন করিতে কি আমি পারিয়াছি? তোমাদের আজ আমাকে কঠোরভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার। আমি যদি তোমাদের দ্বারা পূর্ণ সুখী হইতে না পারিয়া থাকি, তবে তাহা কি একা তোমাদেরই দোষ? আমার কি তাহাতে কোনও দোষ নাই? আমি চাহি, আজ তোমরা আমাকে অতিশয় তীক্ষ্নভাবে বিচার কর, আমাকে আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, আমি খাঁটি সোনা কিনা, তাহার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হও।"

শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ বলেন— "আমি হিন্দুর ছেলে, মুসলমানের ছেলে, খৃষ্টানের ছেলে, বৌদ্ধের ছেলে এবং ইহুদীর ছেলেকে দীক্ষা দিয়াছি। দিয়াছি অখণ্ড মতে। আমি লোক প্রচলিত বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, সৌর, গানপত্য আদি মতের অনুবর্তী নহি, প্রচারকও নহি। আমি অখণ্ড মতের প্রচারক।

প্রচারক কথাটির মানে এক্ষেত্রে এই যে, আমি নিজ জীবনে অখণ্ড মতের অনুশীলনকারী। আমার আচারে ও আচরণে অখণ্ড মতের ছাড়া অন্য মতের প্রতিফলন নাই। সুদূর প্রতিফলন কিছু থাকিলেও তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

এই অর্থেই আমি অখণ্ড মতের প্রচারক। নতুবা আমি আমার সেই মতকে বাহিরের লোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কদাচ কোনও চেষ্টা জীবনে করি নাই। অখণ্ড মতবাদের ব্যাখ্যা দিবার জন্য আজ পর্যন্ত আমি

কোনও সভাসঙ্ঘকে স্থাপন করি নাই। আমার নিজ আচরণের দিকেই আমার লক্ষ্য, বাহিরের প্রচারণার দিকে আমার লক্ষ্য নাই।

তথাপি যে আমার কোনও শিষ্য আমার উপদেশবাণী পাঠ করিয়া অন্য স্থানের লোককে শুনায়, তাহার তাৎপর্য এই যে, আমার সেই শিষ্যগণের নিজ মতের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য চতুর্দিকের বাতাবরণ অনুকূল করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে নিজ নিষ্ঠা অনেক সময়ে দুর্বলতার প্রবণতা পায়। আত্মরক্ষার জন্যই বাতাবরণ বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন।

আমার শিষ্যরা যদি উদ্যম সহকারে আমার মত প্রচার করিত, তাহা হইলে তাহাতে কোনও দোষ হইত না। এমন কি আমি নিজেও যদি নিজের মত প্রচার করিতাম, তাহাতেও দোষ হইত না! যীশু, শঙ্কর, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য আদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে দোষ হয় নাই। তথাপি আমি যে আমার নিজস্ব মতকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া প্রচার করি না, তাহার কারণ এই যে, অপরকে তার মতে পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া চলিবার অধিকার দিতে আমি সম্মত। আমি যাহা প্রচার করি তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় শুদ্ধ সংযত সত্যময় সরল পথ, নৈতিক শুদ্ধতার পথ, সচ্চরিত্রতার পথ। আমি যাহা প্রচার করি, তাহা ঈশ্বর বিশ্বাসের পথ, ঈশ্বরকে ভালবাসিবার পথ। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণার সহিত আমার ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে। সেই পার্থক্য বিদূরণের জন্য আমার কোনও মাথা ব্যথা নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা যাহাই হউক, তুমি তাঁহাকে ভালবাসিলেই আমি খুশী। আমার ধারণার অনুযায়ী ধারণা তোমার নাই বলিয়া আমি তোমার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিব না। এই জন্যই আমার পক্ষে অকাতরে বলা সম্ভব হইয়াছে—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" অন্যের পক্ষে ইহা বলা সম্ভব হইত কি না ঈশ্বর জানেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলেন,— দীক্ষাগুরু, বা শিক্ষাগুরু নয়, আমার গুরু ও ব্রহ্মগুরু। ব্রহ্মই গুরু, যিনি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপে, একমাত্র, অদ্বিতীয় যিনি জ্ঞানস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, পবিত্রাস্বরূপ, যিনি অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং সনাতনঃ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের পরমপ্রভু, যিনি সীমাতীত, অনাদি, অনন্ত, সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মই আমার গুরু।'

অবশ্য মানুষ গুরুরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্রহ্মগুরুর অভিমুখী হবার জন্যই মানুষ গুরুর প্রয়োজন। মানুষ গুরু শিষ্যকে যদি ব্রহ্ম গুরুতে বিমুখ করে, তবে তাকে বর্জন কত্তে হবে।"

আমি যেমন করে তাঁকে পেয়েছি।

১৯৭৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আমার জীবনের সবচাইতে স্মরণীয় দিন। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমার সম্মুখে উপবিষ্ট। মধুময় বৈদিক বিশুদ্ধ সুরের মাধুর্যে, প্রাণবত্তায়, গাম্ভীর্যে এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ধূপ আর ফুলের গন্ধের মধ্যে ভেসে আসছে যেন কোন এক দেবালোক থেকে অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কণ্ঠস্বর—"জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তুমি শয়নে-স্বপনে, তন্দ্রায় জাগরণে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিংবা কারো প্ররোচনায় দর্শনে-স্পর্শনে যত পাপ করেছ সব তুমি আমায় দাও, সব আমি গ্রহণ করলাম। আজ থেকে তুমি পবিত্র।" এই বলে দেহ স্পর্শ করে কানে ওঙ্কার মন্ত্র শোনালেন। বিদ্যুতের মত চকিতে দেহের প্রতিটি অনুপরমাণু রোমাঞ্চিত হল, এক অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল সমস্ত শরীরে। চোখ মেলে দেখলাম—সম্মুখে দণ্ডায়মান আজানুলম্বিত এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ। আমি দীক্ষিত হলাম। সে অনুভূতি ক্ষণিকের হলেও চিরদিনের, জন্ম জন্মান্তরের।

শ্রীশ্রীবাবামণিকে আমি পেয়েছি গুরুরূপে, উপদেষ্টারূপে, বন্ধু-সখারূপে, পথ নির্দেশক শিক্ষকরূপে, সর্বোপরি মানুষরূপী ভগবানরূপে। ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যাগুলি পাশে বসিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে একান্ত আপনজন—পিতার মত শুনে সমাধান করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন বোনদেব কোথায় বিয়ে দেবো, দিনে কঘণ্টা বই লিখবো, কেমন করে চিকিৎসা করবো। বিশ্বের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন বন্ধুর মত। আবার সব জেনেও বহু ডাক্তারী কথা—চিকিৎসা পদ্ধতি ভাল ছাত্রের মত শুনেছেন। বহু কথা, বহু ঘটনা ; সব লিখে শেষ করা যায় না। তবুও কয়েকটা ঘটনা না বলে পার্চ্ছি না।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে পেসমেকার বসাতে হবে নির্দেশ দিয়েছেন ডাঃ পি, কে, সেন, ডাঃ ছেত্রী, ডাঃ বি, ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ। পি, জি, তে অপারেশন হবে ; সব ঠিক কর্চ্ছেন শ্রদ্ধেয় বিনয়দা, অশোকদা, আনন্দদা, সত্যদা, গোবিন্দদা, তপনদা, প্রভৃতি ভক্ত ও আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারীগণ পরম শ্রদ্ধেয় আমাদের মামণি ও মা সাধনা দেবীর নির্দেশ মত। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি ব্যস্ত চরিত্র গঠন আন্দোলন সম্পর্কে রেকর্ডিংএর গানে। পার্চ্ছেন না, কষ্ট হচ্ছে। আমি প্রায় রোজ যেতাম

চেকআপ করতে। বলতাম, এসব এখন থাক বাবা; পেসমেকারটা আগে বসান হয়ে যাক। তিনি হেসে জবাব দিতেন 'না তা হয় না। আমাকে এটা যেমন করেই হোক আগে শেষ করতে হবে। আমি ঠিক আছি।" হিজ মাষ্টারস ভয়েস-এ পরম শ্রদ্ধেয়া মা সাধনা দেবী, শ্রদ্ধেয় কাকুমণি শ্রীসুখময় গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী অসীমদা প্রভৃতি গায়ক-গায়িকাগণের উপস্থিতিতে কয়েকদিন ধরে শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দেশে রেকর্ডিং হল। আমি শ্রীশ্রীবাবামণির একবার পালস দেখছি, একবার প্রেসার দেখছি। কষ্ট হচ্ছে; বলছি 'বাবামণি থাক না এখন—ক'দিন পরে হবে।' মৃদু হেসে বাবামণি নিজের কাজ করলেন। ভাষণ দিলেন,—গাইলেন, রেকর্ডিং হল। সে রেকর্ড এক অমূল্য সম্পদ। রেকর্ডিং করে সবাইকে দেখে শুনে খাওয়ালেন। আজও মনে পড়লে আনন্দে মধুর স্মৃতিতে দু'চোখ জলে ভরে আসে। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে ভিজতে ভিজতে তাড়াতাড়ি হেঁটে এলেন বাবামণি; বললেন— 'অসীম, অমূল্যকে প্রসাদ দে।' বলে নিজেই একখানা খাবার আমার হাতে দিয়ে বললেন—'নাও খাও।'

১৯৭৮ সালের ১৬ই অক্টোবর পি, জি, তে ডাঃ সৌমেন সেনগুপ্ত অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীবাবামণির পেসমেকার বসালেন। অপারেশান থিয়েটারে আমি উপস্থিত। লোক্যাল অ্যানসথেসিয়া ভাল হল না। পর্দায় দেখা যাচ্ছে কার্ডিয়াক ক্যাথিটার ঢুকছে না। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। ডাঃ সেনগুপ্ত জিজ্ঞেস করছেন—'কি বাবামণি লাগছে?" শ্রীশ্রীবাবামণি হেসে বললেন—'নিশ্চয়ই প্যালেটেবল নয়। গুন গুন করে বাবামণি গান ধরলেন—'আবাদ করতে মন ছিল না, বন্ধু কে এক এসে চাষার-বিদ্যা শিখতে হবে, বল্লে হেসে হেসে ......হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।"

নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা তিনগুণ সময় বেশী লাগল পেসমেকার বসাতে। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি ধীর স্থির, অচঞ্চল, স্বাভাবিক, হাসিখুশী। অপারেশান হচ্ছে, চোখ ঢাকা অবস্থায় তিনি গান গাইছেন। এ কি করে সম্ভব!

পরে পি, জি,-র ক্যাবিনে বসে বসে বলেছিলাম—'বাবা আপনি ইচ্ছে করলেই তো সুস্থ হয়ে যেতে পারেন। কেন হন না।' হেসে জবাব দিয়েছেন—"নিজের জন্য কিছু চাইতে নেই। পরমেশ্বর যেমন করে যতদিন ইচ্ছে এ 'দেহটা রাখবেন।' আর একদিন বললেন—'শোন অমূল্য, বলতো পেসমেকারের গ্যারান্টি পিরিয়ডের আগে আমি চলে গেলে তোমাদের পেস-

মেকারটা চলবে, না, বন্ধ হয়ে যাবে ?" আমি বললাম—না—না বাবা এসব বলবেন না। হেসে বলেছেন—'মৃত্যুকে ভয় কেন ? সবই পরমেশ্বরের ইচ্ছে। মৃত্যু সম্বন্ধে জান না বলেই ভয় করছ।'

ক্যান্সার ও নানাবিধ রোগ এবং আমার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, আন্দোলন—কত কথা তিনি মন দিয়ে শুনেছেন ও নিজের জীবনের বহুকথা বলেছেন পি, জি, হাসপাতালে। পরবর্তীকালে গুরুধামে, হ্যারিংটন নার্সিং হোমে, গুরুভাইর ফ্ল্যাটে রোগ সজ্জায় শুয়ে শুয়ে। আর কত উপদেশ, আদেশ দিয়েছেন আজ তা মনে হলে মনটা ভারী হয়ে ওঠে। তাই তিনি আমার শুধুই গুরু নন, শুধুই পিতা বা বন্ধু নন, তিনি একাধারে পিতা-মাতা, বন্ধু-সখা, ভগবান, আমার ইহকাল-পরকালের নির্দেশক।

১৯৮০ সালে শ্রীশ্রীবাবামণির হার্নিয়া অপারেশনের পর হাইপোগ্লাইসেমিক শক হলে একনাগাড়ে ১৩ রাত্রি গুরুধামে ছিলাম। তখন দেখেছি সেখানে সত্যিকারের ভক্ত কাকে বলে ? দেখেছি আমার পরমশ্রদ্ধেয়া দিদিভাই সংহিতাদি বর্তমানে আমাদের পথ নির্দেশিকা শ্রীশ্রীমামণিকে কেমন করে রাতের পর রাত জেগে হাসিমুখে প্রতিটি গুরুভাই-বোনদের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখে শ্রীশ্রীবাবামণির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছেন, নিজের হাতে ওষুধ-পথ্য খাইয়েছেন। দেখেছি বৃদ্ধ বয়সে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার ত্রিবেণীদা রাত-বিকেলে ছুটে এসেছেন—ডাঃ পি, কে, সেন ও আরও অন্যান্য চিকিৎসকদের নিয়ে। দেখেছি শ্রদ্ধেয় ভাইদা, বিনয়দা, অশোকদা, সত্যদা, অঞ্জনদা, গোবিন্দদা, আনন্দদা, তপনদা প্রভৃতি আরও আরও সব গুরুভাইদের অক্লান্ত সেবা যত্ন ও গুরুভক্তি। আমি তাঁদেব কাছে যেন বহিরাগত ডাক্তার, শুধুই ইমারজেন্সি দেখার।

১৯৮২-৮৩ সালের কোন এক সন্ধ্যায় গুরুধমে গিয়েছি। নিচে উপাসনা হচ্ছে। শ্রীশ্রীবাবামণি কিছুদিন ধরেই অসুস্থ। আমি পরীক্ষা করে কথা বলে তিনতলায় নেমেছি ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপরে ডাক পড়ল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন—'উপাসনার রেকর্ড চালিয়ে দাও। আমি আর দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাচ্ছি। আমি প্রায় আৎকে উঠে বললাম—'কি বলছেন বাবা ?' পরীক্ষা করে দেখলাম পাল্‌স, প্রেসার পাওয়া যাচ্ছে না,—পেসমেকার বোধহয় কাজ করছে না। নিচে ছুটে চলে এসে শ্রদ্ধেয় সংহিতাদি ও মাকে বললাম ;— ওনারা সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটে উপরে চলে গেলেন। আমি আর আনন্দদা

ডাঃ পি. কে. সেনকে ফোন করে সব বলে বললাম 'এক্ষুণি চলে আসুন—আমি না যাওয়া আপনি আসা পর্যন্ত থাকবেন কি না ?' এর মধ্যে ডাঃ গুপ্তকে ডাকা হল। আমি আর ডাঃ গুপ্ত আলোচনা করে ওষুধ দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে শ্রীশ্রীবাবামণি উপাসনা আরম্ভ করেছেন—

জয় জয় ব্রহ্ম, পরাৎপর, ঈশ্বর শমন গর্ব্ব পরিভঞ্জ। ··

শ্রীশ্রীবাবামণি পরম শ্রদ্ধেয় সংহিতাদি বর্তমানে আমাদের আশ্রমের কেন্দ্র-বিন্দু মামণির মাথায় হাত দিয়ে বলছেন—"আমি চল্‌লাম মা। আশ্রমের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমায় দিয়ে গেলাম। আমার সমস্ত ভক্ত পুত্র-কন্যাদের তুমি মায়ের মত দেখবে) আমার সমস্ত শক্তি তোমায় দিয়ে গেলাম। পরমেশ্বর তোমার সহায় হোন।" বাবামণিকে ধরে সংহিতাদি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন—আর্তনাদ করে উঠলেন, এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কণ্ঠস্বর শুনলাম—'না বাবা আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবো না—তোমায় আমাদের মধ্যে আরও থাকতে হবে।' শ্রীশ্রীবাবামণি বলছেন—'না মা ; আমাকে ছেড়ে দাও ; আমি চল্‌লাম।'

—'না বাবা আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবো না। তুমি থাকবে, তুমি যাবে না।'

গুরু-শিষ্যার সে এক অবর্ণনীয় লড়াই। পাশে দাঁড়িয়ে বাবামণিকে ধরে ইষ্ট নাম জপ করতে এই ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখলাম। সত্যিই ভক্তের ভগবান। —শ্রীশ্রীবাবামণি স্বাভাবিক হলেন। পাল্‌স, প্রেসার স্বাভাবিক হল ; ঝড় থেমে গেল। প্রশান্ত দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীবাবামণি সংহিতাদি অর্থাৎ মামণির দিকে তাকালেন। ততক্ষণে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ত্রিবেণীদা, ডাঃ পি. কে. সেনকে নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

এ ঘটনার ঘণ্টাখানেক পরে কাঁকুড়গাছির আশ্রমের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শ্রীশ্রীবাবামণির একটা লেখা মনে পড়ল—

"এত বিচিত্র তবু আমি এক ;
প্রকটিত তবু নিবিড় আলেখ ;
সব বিপরীত একের মাঝারে
মিলিত হইয়া এ চরাচরে
কভু হয় প্রভু, কভু বা সেবক,
নিজেরেই নিজে [illegible]"

তার পর ঘটনাবহুল বছরখানেক। ২০শে এপ্রিল রাত আটটায় কবিরাজ আচার্য্য শিবকালী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে নিয়ে ফিরলাম।

পরের দিন অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল ১৯৮৪ সাল। সকালে শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে সপরিবারে আশ্রমে আসার প্রসাদ পাওয়ার নির্দেশ ছিল মামণি সংহিতাদেবীর। সবে পুজো করে উঠেছি; ভোর ৬-৪০ মিনিটে কাঁকুড়গাছি থেকে ফোন এল, শ্রীশ্রীবাবামণি এবার সত্যিই আমাদের ফাঁকি দিয়ে শ্রী দেহ ত্যাগ করে সাধন ধামে গমন করেছেন। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এ অবিশ্বাস্য কথাটা বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলাম না। চিৎকার করে উঠলাম—'বাবামণি তুমি একি করলে'। মনে হল সমস্ত পৃথিবীতে একটা নিকষকাল জমাট অন্ধকার নেমে এসেছে। জল নেই,—বাতাস নেই—শুধুই শূন্যতা।

সকাল আটটাব মধ্যে সপরিবারে ফুলমালা নিয়ে কাঁকুড়গাছি আশ্রমে পৌছে শ্রীশ্রীবাবামণি, অখণ্ডকমলেশ্বর অভীক্ষু সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের শ্রীশ্রীচরণে শেষ অঞ্জলী দিয়ে মনে মনে বললাম—"তুমি স্বয়ং ভগবান, আচার্য্যের আচার্য্য, কবিরাজী, এলোপ্যাথী দিয়ে তোমায় বোঝা যায় না।'

এর মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে এ মর্মভেদী দুঃসংবাদ। গুরুধামে ওঙ্কার বিগ্রহের কাছে কয়েকজন মা আছড়ে পড়ে মাথা ঠুকে কাঁদছেন আর বলছেন—'ঠাকুর আমায় নিয়ে, আমার ছেলেকে নিয়ে বাবামণিকে ফিরিয়ে দাও।' চোখ মুছতে মুছতে রাস্তায় নেমে পড়েছি। কাতারে কাতারে বাঁধভাঙা বন্যার মত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাঁকড়গাছির আশ্রম গুরুধামে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দের দর্শনের জন্য কাঁদতে কাঁদতে চলছে।

বেলা প্রায় তিনটায় ইন্দ্রলোকের বাড়ীতে ফিরে অখণ্ড সংহিতা পাঠ কবলাম। মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবামণি বলেছেন—

"চিরকাল বেঁচে থাকাটা অস্বাভাবিক। মৃত্যুটাই স্বাভাবিক যেমন তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা স্বাভাবিক, আহার-নিদ্রা স্বাভাবিক, মৃত্যু তেমনি স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ব্যাপারকে ভয় করা ভুল। মৃত্যু তোমার প্রয়োজন, নইলে দীর্ঘকাল একটা জীর্ণ, রুগ্ন, অকর্মণ্য দেহের বোঝা বইতে বইতে শেষে তোমার সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যেত। মৃত্যু আছে বলেই জরা-ব্যাধির হাত থেকে

তুমি রক্ষা পাও। নীরোগ চিরযৌবন যদি না পাওয়া যায়, তা হলে অশ্বত্থামা বা হনুমানও প্রত্যহ মৃত্যু কামনা কত্তেন। মৃত্যুর মানে কি? দেহের পরিবর্তন ছাড়া ত মৃত্যু আর কিছুই নয়। পুস্তকের যেমন একটা মলাট ছিঁড়ল, তুমি আর একটা মলাট পরিয়ে নিলে। পরিধানের একখানা বস্ত্র ছিঁড়ল, তুমি আর একখানা বস্ত্র পরিধান কর্লে। কাপড় পুরানো হলেই তাকে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে। যা প্রয়োজন, তাতে আপত্তি করা ভুল। ছেঁড়া কাপড় ফেলে দেবার জন্য তৈরী হয়ে থাকাই সঙ্গত। মৃত্যু সর্ব্বজনীন। কার মৃত্যু হয় নি? রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, সব ঈশ্বরাবতারের সঙ্ঘ দেহত্যাগ করেন নি? কেউ হয়ত দীর্ঘকাল বাঁচেন, কেউ অল্পকাল বাঁচেন। কিন্তু সবাইকে মরতে হয়েছে। সুতরাং যা সার্ব্বজনীন তার সঙ্গে মনেই হোক, আর বাক্যেই হোক, ঝগড়া করা বিষম ভ্রম। মৃত্যুর মানে ধ্বংস নয়, মৃত্যুর মানে বিবর্তন। শীতকালে অনেক গাছের পাতা প'ড়ে যায়, আবার বসন্তে কচিপাতা গজায়। মৃত্যুতেও তেমন তোমার পুরাণো শরীর ঝ'রে প'ড়ে নূতন কাঁচা কচি সুন্দর শরীর লাভ হয়।

"—জীবন ও মৃত্যুর প্রতি সমভাব রাখ। আসক্তিও নয়, বিতৃষ্ণাও নয়, একেবারে নিরপেক্ষ উদাসীন।"

পড়তে পড়তে দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে—মনটাকে সান্ত্বনা দিতে পাচ্ছি কৈ? অনাথ শিশুর মত ঢুকরে সব কেঁদে উঠছে।

১৯৮৪ সালের ২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কলকাতার কাঁকুড়গাছি পি ২৩৮ সি, আই, টি, রোড গুরুধাম লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুজলে সিক্ত হল। অবাক ও বিস্ময়ে বিশেষজ্ঞগণ দেখলেন কোন প্রকার প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করে ৭ দিন সামান্য বরফের খণ্ড ঘরে রেখেই শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দের শ্রীদেহ যেমন ছিল তেমনই রইল—কোন বিকৃতি ঘটল না।

১৯৮৪ সালের ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার বাংলা ১৪ই বৈশাখ ১৩৯১ সাল একটি স্মরণীয় দিন। লক্ষ লক্ষ আবাল বৃদ্ধ-বণিতা অশ্রুসজল নয়নে কাঁকুড়গাছির আশ্রমের বাড়িতে অলিতে গলিতে রাজপথে দাঁড়িয়ে বসে টি, ভির পর্দায় সুশৃঙ্খলভাবে ইহকাল পরকালের ত্রাণকর্তা হৃদয়ের রাজা প্রাণস্বরূপ শ্রীগুরু শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দের শ্রীদেহের শেষযাত্রা দেখছেন। এই বিশাল ঐতিহাসিক সমাবেশের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন মাননীয় শ্রী প্রিয়রঞ্জন

বালমুখী। শ্রীদেহ ওপর থেকে নিচে নামাতে তিনি একদিকে কাঁধ দিলেন। বহু সাধক সমাবেশ ঘটল। ব্রহ্মসঙ্গীত ও হরি ওঁ কীর্তনে মুখরিত কাঁকুড়গাছির বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আকাশ বাতাস মুখরিত হল। আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ পুষ্প বিল্বপত্রে সংযম, সংহতি ও সম্প্রীতি এবং ভক্তির অঞ্জলী দিলেন,— যিনি জগৎকল্যাণে শ্রেষ্ঠ মানুষ গড়ার সাধনায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রত ছিলেন যিনি ধর্মের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান দিয়ে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান ইত্যাদি সবাইকে একসারিতে বসিয়েছেন যিনি নারীপুরুষ নির্বিশেষে আচণ্ডাল সবাইকে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপের অধিকার দিয়েছেন সেই মহাপুরুষ আজীবন ব্রহ্মচারী, অভিক্ষু সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দের শ্রীপাদপদ্মে।

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মামণি মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে বাবা বাবা বলে হাঁপুস নয়নে কাঁদছেন, আর শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীদেহ চন্দনে চর্চিত করে তাঁর ব্যবহার্য্য জিনিষগুলো সাজিয়ে দিচ্ছেন। সে এক করুণ হৃদয় বিদারক দৃশ্য। আমি শেষবারের মত শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীদেহ ও পাদপদ্ম স্পর্শ করলাম,—প্রণাম করলাম; কিন্তু নিষ্প্রাণ বলে মনে হল না। মনে হল সুখ নিদ্রায় শায়িত এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ।

একাল ও ভাবীকালের মানুষের কাছে কলকাতার কাঁকুড়গাছির পি, ২৩৮ সি, আই, টি, রোডের গুরুধাম এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের পীঠস্থান হয়ে রইল; যেখানে শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দের শ্রীদেহ অনন্তসজ্জায় যোগনিদ্রায় সমাধিস্থ হয়ে আছেন।

হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ।

[**লেখকের নিবেদন**—১৯৭৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর আমি শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি। যথার্থ অর্থে মাত্র কয়েক মাস তাঁকে সুস্থ অবস্থায় কাছে পেয়েছি। আমার শুধুই মনে হয়েছে বা আজও মনে হয় যদি কৈশোর বা যৌবনে শ্রীশ্রীবাবামণির চরণাশ্রিত হতে পারতাম; অন্ততঃ দশ বছর আগেও যদি হত তবে দেশ ও দশকে আমি কিছু দিয়ে যেত পারতাম। শ্রীমান রাখালরাজের অনুরোধে শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দ আমাদের শ্রীশ্রীবাবামণির সম্পর্কে কিছু লিখতে বসলাম। কিন্তু এই মহাপুরুষের মূল্যায়ণ আমার মত নগণ্য একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ যেন অগাধ সমুদ্র থেকে এক গণ্ডুষ জল তুলে সমুদ্র সিঞ্চনের অলৌকিক স্বপ্ন। তবুও সীমিত পরিসরে সীমিত ক্ষমতায় গুরুদেব শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীশ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে গঙ্গাজলে

গঙ্গাপুজো করার চেষ্টা করেছি মাত্র। ভুল ত্রুটির জন্ত আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। শ্রীশ্রীস্বামীস্বরূপানন্দের এক-একটি মাত্র বিরাট বাগান থেকে এক-একটি মাত্র ফুল চয়ন করে ছোট্ট সাজিটি সাজাতে চেষ্টা করলাম।

শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের বিন্দুমাত্র ভাল লাগলে শ্রীশ্রীমাবামণির এক নগণ্য ভক্ত হয়েও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।]

ডাঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্ত্তী

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীবালক ঠাকুর

পৃথিবীতে কীর্তিমান্ পুরুষদের আগমনের একটা সময় আছে, একটা স্তর আছে। এই সময়ের স্তরটা মহাপুরুষরা সময়ের আলেখ্যে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারেন। স্তরের পরিবেশটা কি রকম। নড়বড়ে কুসংস্কারে অন্ধকারে নিমজ্জিত গোধূলি আলো কুকীর্তি অপচয় দানবের দৌরাত্মে যখন জাহাজ ডুবি পৃথিবী—তখনই কে যেন অলক্ষ্যে টের পেয়ে যান—ডুবন্ত তরীর ধরতে হবে এবার হাল।

সংসারে যেমন—সমাজ চালিত হয় দক্ষ ও আদর্শ প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী। সমাজ তথা রাষ্ট্র তথা দেশ—নির্ভর করে সৎকাজের বলিষ্ঠ প্রশাসনের ভিত্তির উপর। এই প্রশাসন মূলে আক্রান্ত হলেই দেশ টলমল করে। সৃষ্টি হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। খুন রাহাজানি এবং অসভ্য আচরণে ছড়িয়ে যায় রাষ্ট্র। মুনাফা লোটে ইতর-বিশেষ এক ধরনের অসৎ লোক। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই—রাষ্ট্রে যখন ভয়ঙ্কর অন্যায় মেঘ নেমে আসে—রাষ্ট্র তখন হয়ে ওঠে টলমল। ঠিক তদ্রূপ গোটা মনুষ্য প্রাণীর মধ্যে ঢুকে যায় যখন কেউটে সাপের বিষ—মানুষ হয়ে ওঠে অস্থির। বোধগম্য হীন। অনাচারী। কুবৃত্তিকারী। লুন্ঠনময়। পরস্পর শত্রুতা মুখী। রক্ত বিদ্বেষ। জাতিভেদ। কুলাচার। আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তখনই যেন অমোঘ অন্ধকার থেকে ঘোষিত হয়—আমি আসছি। অর্থাৎ আমিটা কে? রথ চালাবার জন্য যেমন দরকার সারথি, সামরিক প্রশাসনকে সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য দরকার যেমন সুদক্ষ কমাণ্ডার—ঠিক তদ্রূপ বৃত্তাকার এই পৃথিবীতে গোটা মনুষ্য জাতির কুল বাঁচাতে দরকার একজন মহান সৈনিক। যে গোটা মনুষ্য জাতিকে নগ্নাবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। চরম কুলাচার ও ভ্রষ্ট বুদ্ধি থেকে দিতে পারে পরিত্রাণ।

কথিত আছে মানুষ দেবতার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সৃষ্টি দেবতা আছেন কিনা তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে স্পষ্ট ধারণা যে ইহা করা যায়—এক মহাশক্তির প্রভাব পৃথিবীতে আছে এটা খুবই সত্য। পরিশিলিত ধ্যান ধারণা বাদ দিলেও সূক্ষ্ম বোধের দ্বারা এটুকু আঁচ করা যায় সৃষ্টি এবং লয়—এই বিরাট দুটি জিনিষ কখনই আপনা থেকে সম্ভব নয়। যে কোন বস্তুর গড়ার পশ্চাতে থাকে

একজন কারিগব। স্বষ্টিকর্তা। কোন জিনিষই আপনা থেকে স্বষ্টি হয় না। স্বষ্টি মানেই এর পিছনে আছে স্রষ্টা।

লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা এমন কিছুর স্বষ্টির উপাদান দেখি যা মহাকাল তুল্য। যেমন গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র এসব শূন্যলোকের অবস্থানরত সুবিশাল বস্তু বিশেষ গ্রহ। পৃথিবীতে দেখি মরুস্থান পর্বতরাজি সমুদ্রশৈলি অগ্নি বায়ু ইত্যাদি। যা কখনই একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—এসব তৈরী করা। তাহলে এসব জিনিস কে বা কারা তৈরী করেছে। মানুষের অস্তিত্বই যেখানে দুদিন পর্যন্ত। কচু পাতায় টলমল নিয়ে প্রতিনিয়ত—এই গেল, গেল করছে প্রাণ। আর সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য বিষয় একবার দেহের পিঞ্জর থেকে অলৌকিক এই আত্মা ফুরুৎ করে বেরিয়ে পড়লেই খাঁচাটি লুটিয়ে পড়ল শ্মশানে অথবা কবরে। অর্থাৎ আমরা আছি এটাই আশ্চর্য! মৃত্যুই আমাদের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বার। সাগরের পুণ্য স্নানে যেমন জমায়েত হয়ে থাকে স্নান যাত্রীদের। তদ্রূপ এই গোলক ভূলোকে আমাদের আবির্ভাব তীর্থযাত্রী হিসেবে।

একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি তীর্থ স্থানের লক্ষ্য বিন্দুতে পৌছাবার জন্য। এই সুদীর্ঘ পথ হাঁটা চলে এক একজন অভিযাত্রীদের নিজস্ব ধ্যান চিন্তা এবং উপকরণের মাধ্যমে। কেউ লক্ষ্য স্থলে পৌছল। কেউ পারে না। কেউ শুরুতে—কেউ মাঝপথে কেউ একটু এগিয়েই চরম আঘাত পেয়ে ইতি হয়। কিন্তু মনুষ্য জীবের দাবী বা অভিযোগ বড়ই বাস্তব-ভিত্তিক সত্য। সে চায় সুখ আরাম শান্তি এবং আনন্দ। ঐক্যবদ্ধ এই মনুষ্য প্রাণী দুই ভাগে বিভক্ত। একদল ক্ষমতা, অন্যায় এবং প্রচণ্ড কুট বুদ্ধির প্রভাবে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে নিজের ভুরি বৃদ্ধি করে। প্রভাবশালী ব্যক্তি। যাদের বলা যায় 'অসুর'। এই অসুরের যখন দৌরাত্ম্য অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পায়—রাক্ষস বৃত্তিতে—সমাজ সংসার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই পৃথিবীতে একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রকৃতির সমস্ত মহান ও শ্রেষ্ঠ গুণগুলি নিয়ে ধরায় আসেন পৃথিবীর অসুরদের নিধন করতে। বা তাদের সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত করতে। ঈশ্বরের মহিমা এখানেই। এই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে আসেন—শতবর্ষে বা যুগোত্তর পেরিয়ে যুগান্তরে। এই মহান ব্যক্তির আবির্ভাবের লক্ষ্য বড়ই অদ্ভুতভিত্তিক ভাবে। তাঁদের স্বষ্টি মুহূর্তেই ঘটে যায় চারপাশে উৎসবের হৈ হৈ ঘটনা।

ইন্দ্রজিৎ হাঁপিয়ে উঠেছে। সব কাজেই ব্যর্থ। বারবার প্রত্যাবর্তনের

ফলে মনের ভিতর কথা বেঁধেছে অবসাদ। ছেড়ে-ছুড়ে যাবার পরিকল্পনা করছে। একবার সুদূর পণ্ডিচেরীতে গিয়ে এক বিদেশী যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভারতবর্ষে এই সাগর সংলগ্ন বিদেশী এবং স্বদেশী মানুষের সম আধ্যাত্মিক চিন্তায় গড়ে ওঠা পণ্ডিচেরি জায়গাটি সত্যি অতুলনীয়। এমন শান্তিবস্থান নিবিড় প্রশান্তিময় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সমন্বয় জায়গা ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কিনা ভাবতে হয়। এই অভুতপূর্ব স্থির ধ্রুপদী জায়গা বিশ্ব মানবের আধ্যাত্মিক জাগরণের—ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন একদা ভারত মানবআত্মা ঋষি পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। এবং তৎসহ স্ত্রী শ্রীমা।

একদিন ইন্দ্রজিৎ এখানে আবিষ্কার করে এমন একটি যুবককে—যার মানসিক প্রাপ্য সুখময় বস্তুটি বড়ই সুন্দর। জাপানি এই যুবক। তর তরে তাজা। উজ্জ্বল প্রাণময় অভিব্যক্তি বিরাজমান। অথচ চোখে মুখে স্থিতি স্থাবকতার পরিভাষ জাগ্রত।

ইন্দ্রজিৎ। —আপনি কোথায় থেকে এসেছেন?

যুবক। জাপান।

ইন্দ্রজিৎ এর বুক ছলাৎ করে ওঠে। কারণ একদিন জাপানের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত—ডি. এন. হাড়বাড়নি ইন্দ্রজিতের বাড়িতে এক পত্রিকার আলোচনা সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আলোচনার শেষে হাড়বাড়নির বিনয় স্বভাবের সঙ্গে জাপান সম্পর্কে যা বললেন তা অতুলনীয়। বাড়তি যে উপকরণ তিনি পরিবেশন করলেন—তা হল জাপানের কিছু বিশিষ্ট শহরের সঙ্গে উক্ত ভদ্রলোক টোকিও প্রভৃতি স্থানে ঘুরে আসা—ভিডিও ক্যাসেট থেকে জাপানের দর্শনীয় স্থানগুলি ১৬ মিলিমিটার পর্দা করে দেখালেন। ইন্দ্রজিৎ জাপান শহর দেখে অবাক। অতুলনীয় এই ফুলের দেশটির সত্যি তুলনা নেই। হিন্দীতে একটি ছবিও হয়েছে। 'লাভ হল টোকিও।' ইন্দ্রজিৎ সেই ছবিটা দেখেছে। তখন থেকেই জাপান সম্পর্কে তার দুর্বলতা বেড়ে যায়।

ইন্দ্রজিৎ বহুদিন পর সাক্ষাৎ এই জাপানি তরুণ যুবকের সঙ্গে আলাপে রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগল। এই মুহূর্তে এই যুবকটি যদি বলে বসে আপনি আমার সঙ্গে জাপান যাবেন। তাহলে ত ইন্দ্রজিতের পোয়াবারো। কে পায় ইন্দ্রজিতের টিকি। ভবঘুরে ইন্দ্রজিৎ যেন হাতে স্বর্গ পায়।

কি করেন?

আনন্দের সন্ধানে বেরিয়েছি।

ব্যঃ কি চমৎকার মানসিক প্রবৃত্তি। ইন্দ্রজিতের তর সয় না।

এতে আনন্দের উৎসটা কি ভাবে নেবেন?

সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব।

কি দারুন যুবক। এক দেশ থেকে আর এক দেশ তারপর থেকে তারপর শুধু চলা আর চলা।

ইন্দ্রজিৎ একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল আপনার প্রেমিকা নেই?

হ্যাঁ। ছিল। টোকিওতে প্লেনে ওঠার সময় ও আমাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছিল। আমি যখন ওর ঠোঁটে শেষ বিদায় চুম্বন দিয়ে প্লেনের ভেতর চলে যাই ওর চোখ দিয়ে বইছিল বেদনার মুক্তকণা তিরতির করে। আমি টাটা দিই। ও মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

আঃ বেচারি!

আপনি নিষ্ঠুর। এমন সুন্দর একটি ফুলকে কাঁদিয়ে তাকে চির বৈধব্য করে দিয়ে আসলেন; ছিঃ-ছিঃ এটা ঠিক করেন নি।

আপনার নাম?

ওকাবুরা।

ইন্দ্রজিৎ আজ ভাবছিল—যদি ওকাবুরার মত হতে পারত! জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে কিছু নিয়ে নিজের ভাব যুক্ত করে একটা লাইন তৈরী করল—

হাজার বছর আমি হেঁটে যাব—

ভারত থেকে জাপান—জাপান পেরিয়ে ইতালি—ফ্রান্স—এভাবে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে—নোনা জল আর মুক্ত ঝিনুক নিয়ে হেঁটে যাব আর হেঁটে যাব।

হঠাৎ হাতের উপর হাত রাখল ইন্দ্রজিৎ। রুমির নরম হাতের স্পর্শে ইন্দ্রজিতের সূক্ষ্ম শিরায়—বিদ্যুতের ঝলকানি বয়ে গেল গোটা শরীরে। রুমিকে বলতে যাচ্ছিল তার বহু গোপনের প্রিয় কথাটি। কিন্তু সেদিন বলতে পারে নি।

রুমি এসে আজ ইন্দ্রজিতের কাছে দাঁড়াল—তখন ইন্দ্রজিৎ বলল আজ তোমাকে একটি জীবন কাহিনী শোনাব।

যে জীবন কাহিনীর মধ্য দিয়ে তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। নিদ্রিত চেতনা জেগে উঠবে। তোমার অন্ধকার মোহগুলি মুছে গিয়ে জীবনের নতুন উৎসে তুমি যাবে ডুবে।

কি এমন ঘটনা তুমি আমাকে শোনাবে। যেখানে নিজেকে আমি খুঁজে পাব!

আছে—আছে। এই গল্প বা উপাখ্যান যাই বলো পৃথিবীর সর্বশ্রেণীভুক্ত মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলতে পার। তবে এই মুহূর্তে একান্ত তোমার জন্যই আমি তোমাকে এই উপাখ্যানটি শোনাব। তুমি অনেক দিন ধরে আমাকে বলছ ছাই ভস্ম তুমি লিখছ। যে সৃষ্টিতে মানবিক মূল্যায়ণ এবং জনচিত্ত জাগরণের বিন্দুমাত্র উপাদান নেই। সেই সঙ্গে নয়। সাহিত্য হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। এই সাহিত্যের আগুনে পৃথিবী পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতে পারে। এই সাহিত্যের দাবানলে—পৃথিবী পুড়ে আবার নতুন পৃথিবী তৈরী হতে পারে। সাহিত্য হল জাতির ব্রহ্মাস্ত্র।

ইন্দ্রজিৎ-এর ভেতরটা নড়ে-চড়ে উঠলে সেদিন থেকে। সংখ্যা তত্ত্বের দিকেই শুধু এগিয়ে যাচ্ছিল ইন্দ্রজিৎ। ঠিক আছে আমি এমন একটি কাজ করে তোমাকে দেখাব তুমি সমস্ত অবসাদ গ্লানি মুছে ফেলে আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করবে।

এক কাপ কফি নিয়ে আস।

রুমিকে ইন্দ্রজিৎ সব সময় আলাদা করে রাখে। রুমির ইন্দ্রজিতের প্রতি এক গভীর বিশ্বাস—ইন্দ্রজিৎ দশজন নয়। ইন্দ্রজিৎ একজন—শুধু একজন।

রুমির একদিন শরীর খারাপ করেছিল। ইন্দ্রজিৎ—সেদিনই এই গল্পটি রুমিকে শোনাতে চেয়েছিল—কিন্তু রুমি সেদিন সুযোগ দেয় নি। সেদিন ইন্দ্রজিৎ আর একটি আঘাত পেয়েছিল—ইন্দ্রজিৎ রুমিকে একটু সেবা করার জন্য নিজেকে ভীষণ রকম দুর্বল করে তুলেছিল। কিন্তু সেই দুর্বল ও রুমির কঠোর আপত্তিতে ইন্দ্রজিৎ মাথা নিচু করে বুক ভরা অভিমান নিয়ে ফিরে আসে বাড়িতে। ইন্দ্রজিৎ সেদিন ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। আজ ইন্দ্রজিৎ রুমিকে অন্য রকম দেখছে। চোখে অধ্যাত্মভাব। কেন এমন হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারছে না। তবে এই বিশ্বাস নিয়ে আজ রুমির কাছে এসেছে—যে আজ রুমিকে জীবনের এমন একজন পুরুষ বা ব্যক্তির আত্মদর্শন বা দিব্য দর্শন মূলক গল্প শোনাবে যা মধুর চেয়ে মুগ্ধকর।

আয়নার মত স্থির। অথচ দিব্য জ্যোতির্ময়—অলৌকিক প্রক্রিয়া যুক্ত জীবন দর্শন।

রুমি ইন্দ্রজিতের সামনে বসে।

কিসের টানের স্রোত ! দূর দূর থেকে শুধু আসছে। বিরামহীন স্রোত। ভীড়ের ঢেউ ভেঙে পড়ছে। তবু আসছে। আসছে বিহার থেকে। আসছে আসাম থেকে। আসছে কেউ কেউ সবুজ অরণ্যের তড়াই পর্বত পেরিয়ে সুখচর ধামে। কি সেই আকর্ষণ! রবিবার ছুটির দিন। এই ছুটির দিন যখন সবার কাটে ছুটির আমেজে। পুরো ছ'টা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের নির্যাস ব্যস্ততা রবিবারের অলস খামখেয়ালি এবং খোসমেজামে কাটাতে ব্যস্ত যখন সবাই তখন এক শ্রেণীর মানুষ সুদূর দিগন্ত রাস্তা পেরিয়ে আসছে গঙ্গা সংলগ্ন সুখচর ধামে। কেন আসছে? কিসের আকর্ষণে—এই জোয়ার? সোদপুর স্টেশনে নেমে দলে দলে ছুটে চলেছে আশ্রমের দিকে। কেউ রিক্সায়। কেউ সারিবদ্ধ ভাবে রামনারায়ণ রাম পতাকা উড্ডিন করে। বি, টি, রোড পেরিয়ে গীর্জার ভেতর দিয়ে সোজা চলে যাওয়া এগলি ওগলি বাঁক টেনে সব ক্লান্তি থমকে দাঁড়িয়েছে সেখানে—সে নিরাময় স্থির প্রশান্তি জায়গাটি হল সুখচর ধাম। গঙ্গার তীর ছিঁড়ে শিঁদুর বর্ণ ছটায় শৈব মন্দির চূড়া দাঁড়িয়ে এই ধাম। ধাম প্রবেশ লগ্নে বিক্রি হচ্ছে ফুলের ডালি। ধূপকাঁটি। বাতাসা। আর বিক্রি হচ্ছে সেই দিব্য পুরুষের ছবি। কোনটি কাগজের। কোনটি কোনটি শ্বেতপাথরের। কোনটি ধাতু নির্মিত। নানা আকারে তৈরী এই মূর্তি।

মাইক থেকে ভেসে আসছে শিশুর মত সুন্দর মধুমাখা ললিত কণ্ঠ। যে কণ্ঠ উচ্চারণে রয়েছে জীবনের কঠিন সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা। শব্দে যেন ঘোষিত হচ্ছে সরোদের সূক্ষ্ম ভাবের সংস্কৃত ধ্বনি। সেই শব্দ ধ্বনি হা-মুখো করে তৃষ্ণার্ত—পাখির মত গিলছে—মাইকের ঘোষিত উদ্ধৃত উক্তি।

তোমরা যারা এসেছ। শোন তোমরা সবাই আমার সন্তান। কি সন্তান ত?

জনতার প্রত্যুত্তর ধ্বনি হ্যাঁ—ঠাকুর আমরা তোমার সন্তান। তাই সন্তানের সুখ-দুঃখ দেখার ভার—নিয়োজিত হয় পিতার উপর। তাই তোমরা যখন আমাকে বাবা করেছ—তখন সন্তানদের ত দেখতেই হবে। দেখ, আজ আমরা আছি ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখে। একটা আত্মার কারখানায় তোমরা বাস করছ। যে কারখানায় মৃত আত্মারা সবাই চোর। কেউ ভেজাল দেয়, কেউ চরিত্রহীন, কেউ খুনি, কেউ লম্পট, কেউ অসুর, কেউ মিথ্যাচারী এরকম—ইত্যাদি সব। একে একে জমা হচ্ছে—মৃত আত্মার কারখানা। ভীড় উপচে উঠছে। এই যে তোমরা চাল খাচ্ছ এতে

দুই ভাগ আসল আর দুই ভাগ নকল। এভাবে ডাল তেল তরিতরকারী সব কিছুতেই নকলের ভাণ্ডার।

এ ওকে ঠেলছে। ও ওকে ঠেলছে। ফুটবলের লাথি খাওয়ার মত শুধু গুতোই খেলে যাচ্ছ তোমরা। গোটা সংসারে চলেছে জুয়ো চুরির জমাট ব্যবসা। একদল চুরি করছে। আর একদল শুকিয়ে মরছে।

মরবে ত নিশ্চয়ই। মধুসূদন বলছেন না—'অমর কে কোথা হবে।' মৃত্যুর জন্যই জন্ম। তবে যে মৃত্যুটা সত্তর বছর বয়সে আসত সেটা যদি তিরিশ বছরে এসে যায় কেমন কথা। এক ব্যাটা ভুরি ভোজ করে খেয়ে নাদুস-নুদুস গতর নিয়ে গোঁফে ঘি দিয়ে বেজায় খোসমেজাজে দিন কাটাবে। আর এক ব্যাটা ছটকাইয়া মরবে। মরার আগে একশ বার মরবে। এটা কেমন কথা। সবাই সমান ভাবে বাঁচবে। সত্যি একদিন চলেই যেতে হবে—তখন একটু সুখ শান্তিতে বাস করে গেলে ভাল না! তোমরা এই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লড়াই কর। লড়াই মানে রাজনীতি, বিপ্লব নয়। মানুষ খুন নয়। হিংসা নয়। প্রেমের বিপ্লব কর। তাদেরকে বোঝাও—একদিন তোমরাও মরবে। একদিন আমরাও মরব। এই মরার আগে সবাই সমানভাবে বেঁচে থেকে তারপর মরব।

কি অনিন্দ্য যুক্তিময় কথা। কথা নয় যেন সহজ সরলভাবে জীবন সম্পর্কে আত্ম সচেতন করা। এই সাধারণ মানুষরা ধর্ম বোঝে না। এরা সহজ সরল। এরা চায় শুধু বেঁচে থাকার এক বিশ্বাসী পুরুষের অবলম্বন। যে তাদের কথা বুঝবে তাদের কথা শুনবে। তাদের দুঃখে হবে দুঃখী। সুখে হবে সুখী। কে এই ব্যক্তি?

যার সদচ্চারণ এতক্ষণ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের মত ঝঙ্কৃত হচ্ছিল! কে—সে এই ব্যক্তি? ইনিই হলেন জন্মসিদ্ধ বালক ঠাকুর। ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী।

ইতিহাসের প্রবাহিত ধারায় তিনি আসেন। একান্ত স্ব মহিমা নিয়ে। তিনি সৃষ্টি হন জন্মসিদ্ধি নিয়ে। তাঁর সাধনা করতে হয় না। অর্থাৎ তিনি সাধক হয়েই আসেন।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মাতুল বিষ্ণুনাথ ঠাকুরের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে তিনি আবার মাতুল বংশের ত্রয়োদশ উত্তমপুরুষরূপে এ ধরায় অবতীর্ণ হবেন। মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা বংশ পরম্পরায় বিষ্ণুনাথ ঠাকুরের বংশে চলে আসছে। বিষ্ণুনাথ ঠাকুরের জামাতা গোপীনাথ কণ্ঠাভরণ এই ভবিতব্য বাণী তাঁর

'নাগার্জুন' বইতে লিখেছেন। এই বিষ্ণুনাথ ঠাকুরের ত্রয়োদশ উত্তম পুরুষ রূপে নানা শাখার ভাগিনেয়দের মধ্যে একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই অলৌকিক অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ জন্ম থেকেই দেখা যায়।

যোগসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারী সাধক অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে অর্ধেক মন্ত্র দিয়ে তিনি বলেছিলেন—যে আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীর পরে এক পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে অবতার আবির্ভূত হয়ে তার অর্ধ মন্ত্র পূরণ করবেন। তৈলঙ্গ স্বামী ও অশ্বিনী চ্যাটার্জীকে একই আশ্বাস দেন। অর্ধশতাব্দীর পর এক পূর্ণ ব্রহ্ম ভূমিষ্ঠ হবেন। এবং তিনি তাঁর অর্ধমন্ত্র পূরণ করবেন। এবং তিনিই হবেন তাঁর গুরু। যখন এই উক্তি ঘোষণা করা হয় তখন ঠাকুরের মার ও জন্ম হয়নি। কি আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা,—পরে অর্থাৎ পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট দিনে ছোট বালক ঠাকুর নৌকা করে মুন্সীগঞ্জে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নদীতে ঝড় ওঠে। তখন বাধ্য হয়ে নৌকা থামিয়ে চরে কাটাতে হয় রাত। সেই চরের কাছে ছিল অশ্বিনী চ্যাটার্জীর সাধন কুটীর। তিনি কি করে বুঝতে পারলেন তাঁর বাড়ির কাছে এক বালক ঠাকুর এসেছে।

অশ্বিনী চ্যাটার্জী নদীর ঘাটে গিয়ে দেখেন তার অনুমান ঠিক। শ্রীশ্রীঠাকুর বৃদ্ধ অশ্বিনীকে ডেকে তার অর্ধমন্ত্র পূর্ণ করে দিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হল এভাবে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর আর এক ভক্তকে কিন্তু তিনি মন্ত্র দিলেন না। তার পরিবর্তে তিনি একখানি গেরুয়া কাপড় দিয়ে বললেন "আজ থেকে ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে এক পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার তোকে এই গেরুয়া কাপড়টি পরে আসতে বলবেন। তুই কাপড়টি পরে আসলে তখন তিনি তোকে দীক্ষা দেবেন। যা বললেন তাই ঘটল। ঠিক যথা সময় আড়াই হাজার গ্রামে একদিন সকালবেলায় আচমকা ভুলবশতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর যোগেশ চৌধুরীর বাড়িতে কড়া নাড়েন। যোগেশ চৌধুরী অবাক। বললেন যাও তুমি গেরুয়া কাপড় পরে এসো। কবেকার কথা। পঞ্চাশ বছর পরে সেই ঘটনা মনে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই যে গেরুয়া কাপড় সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা খুঁজতে লেগে যায় দুটি দিন। গেরুয়া কাপড় পরে যখন বৃদ্ধ যোগেশ চৌধুরী এলেন ঠাকুর তাকে দীক্ষা দিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এই কথাও সেদিন ফলে গেল।

এরপর থেকে ঘটতে লাগল একে একে অলৌকিক ঘটনা। যার একটির পর একটি সাজালে মধুময় লাগে পাঠ করতে। এরকম একটি ঘটনা বলি

শোনা। তার আগে এই মহান ব্যক্তির আবির্ভাবের মুহূর্তটা কি রকম বিস্ময়কর সেই ঘটনাটা বলি। কালিপূজা শুরু হওয়ার কিছু আগে মুক্ত নীল আকাশের নীচে পূজামণ্ডপের উঠোনে এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ঠাকুরের আবির্ভাব। সেদিন ছিল ২৩শে কার্তিক ১৩২৭ সাল।

ঢাকার বিক্রমপুরে মেদিনীমণ্ডল নামে একটি গ্রামে ছিল একটি বিখ্যাত বৈদিক বাড়ি। সেই বৈদিক বাড়িতে হচ্ছে কালীপূজা। পূজার আগে চারুশীলা দেবীর কোন প্রসব বেদনা ছিল না। সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম করেছেন। রান্নাবান্না করেছেন। ঘরের কাজ কর্ম সেরে পূজার আয়োজন করছেন। পূজার লগ্ন কাল আসন্ন। পুরোহিত মন্ত্র পড়বেন। চারুশীলা দেবী এ ঘর ও ঘর করে আয়োজন গুলি গুছিয়ে দিচ্ছেন।—চিনির থালা নিয়ে পূজা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে আসছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে দু'এক পা এগোতেই চারুশীলা দেবীর শরীর কেমন করতে থাকে। চিনির থালা নীচে পড়ে যায়।

ব্যাপারটা বোঝার আগেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। মাটিতে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে হাসছে একটি শিশু। রূপ ফেটে পরছে গা দিয়ে। ফুলের মত খিলখিল করছে অবয়ব। কিন্তু নীরব। এই শিশুটি আসার ফলে বৈদিক বাড়িতে চিরপ্রথানুযায়ী পাঁঠা বলীর পড়ল বাধা। ছাগলটি পেয়ে যায় মুক্তি। আনন্দে লাফাতে লাফাতে ছাগলটি চলে যায়। শিশুর জ্যেঠাইমা মনোরমা দেবী এই অলৌকিক শিশুর জন্ম দেখে হাঁটু ভাঁজ করে শিশুকে প্রণাম করেন। বলেন এই শিশু আমাদের আলো করতে এসেছে। শিশুটির মুখ থেকে তখনো কোন শব্দ ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে না দেখে সবাই কেমন ভয়ে শুকিয়ে যায়। শিশুটি তাহলে বোবা? কিছুক্ষণ পর শিশুটি চিৎকার করতেই সব ভুল ভেঙে যায়। সুন্দর ঠাকুর এসে বললেন আমি এর জীবন পঞ্জিকা করব। সুন্দর ঠাকুর ছিলের জ্যোতিষী। অনেকে বললেন এ কখনো হয় না। নিয়ম বিরুদ্ধ। অন্তত ছ'দিন অপেক্ষা করতে হয়। ছ'দিন না কাটলে এ কাজ করা উচিৎ নয়। সুন্দর ঠাকুর এই সংস্কার মানলেন না। তিনি সবই উপেক্ষা করে গণনায় বসলেন। গণনা শেষ হতেই দু' চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। 'এ কালাপাহাড় নয়।' জন্মসিদ্ধ পুরুষ। উপযুক্ত সময়ে এই সংসারে এসেছে। এমন সময় উপস্থিত পাগল সাধক। কে এসেছে কে এসেছে বলে চিৎকার করতে করতে। তিনিই বলে যান ও এই বুঝি। ঠিক লোকই এসেছে।। তোরা পরে বুঝবি।। বলতে বলতে সাধক চলে যায়।

রুমি শুনছে এমন ভাবে। যেন সে সাক্ষাৎ দর্শন দেখছে। ইন্দ্রজিৎ এই ঘটনা বলতে বলতে যেন সত্যিই নিজেই সে ইন্দ্রজিতের মত হয়ে উঠেছে।

যখন শিশুর বয়স মাত্র ছ' দিন। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামে, থেমে আবার শুরু হয়। শিশু আনন্দে হাত পা নাড়েন। শিশু যখন হাত পা নাড়েন তখনই বৃষ্টি প্রবল বেগে আসে। আর যেই হাত পা নাড়া বন্ধ করে তখনই বৃষ্টি থেমে যায়।

আবার যেই হাত নাড়া শুরু করে ঝম্‌ঝম্ করে শুরু হয় বৃষ্টি। সারাদিন ধরে চলতে থাকে এই অদ্ভুত খেলা।

যে শিশুটির শুধু দুধই তখন খাদ্য। সেই অবুঝ দুগ্ধপোষ্য শিশুর কি অদ্ভুত বোঝবার ক্ষমতা,—আত্মীয় পরিজন এবং প্রতিবেশী মহিলারা শিশুটিকে নিয়ে নানা রকম খেলা করে। প্রতিবেশী মহিলারা মুখ লুকিয়ে শিশুর মুখের দিকে স্তন বাড়িয়ে দেয়। শিশু বুঝতে পারে এরা কেউ মা নয়। মুখ ফিরিয়ে দেয়।

এই ঠাকুর শিশুর পরিবার হচ্ছে যৌথ পরিবার। সুতরাং সমবয়সী শিশুর শেষ নেই। আত্মীয় পরিজনদের প্রত্যেকেরই রয়েছে কারো না কারো শিশু। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করে। যখন অন্য সব শিশুরা কাঁদে—তখন বালক শিশু চুপ করে থাকে। আবার সবাই যখন চুপ করে থাকে তখন বালক শিশু কাঁদে। বালক শিশুর এই কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়। বালক শিশুর গায়ের রং এত ফর্সা। উজ্জ্বলময়, যে অন্ধকারে রাখলে স্পষ্ট দেখা যায় বালক শিশুকে।

এভাবে দেখতে দেখতে যখন বালক ঠাকুরের বয়স ছয় মাস। বাবা শিশুকে নিয়ে আসেন কর্মস্থলে ত্রিপুরা জেলার উজানচর-কৃষ্ণনগর গ্রামে শিশু এখানেই নব বৃক্ষের মত বেড়ে উঠতে থাকে। যতই বয়স বাড়ে রূপ ততই ফুটে ওঠে। আর ঘটতে থাকে অযাচিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসম্ভব সব ঘটনা। যখন জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি করার জ্ঞান প্রকাশ হতে থাকে—তখন থেকেই শুরু হয় শিশু ঠাকুরের নিজস্ব শক্তি প্রতিভাবের ক্রিয়া। শক্তিকে সংযম করতে শেখে। যখন যেখানে যতটুকু নিজের মহিমা প্রকাশের প্রয়োজন মনে করেন—ঠাকুর ততটুকু প্রকাশ করেন।

একবার ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ঠাকুর তখন তাকায়। মামার-বাড়িতে। মায়ের সঙ্গে বালক ঠাকুর এসেছে জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখতে। তখন কত আর বয়স। দু'বছর বয়স হবে। মিছিল চলেছে। হঠাৎ মিছিলের

লোকে চিৎকার। শিশু ঠাকুর মায়ের সঙ্গে মিছিল দেখছিল দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে। মা মিছিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভোর চিত্তে তাকিয়ে থাকে মিছিলের দিকে। চিৎকার শুনে মা হকচকিয়ে দেখে শিশু ঠাকুর তার কাছে নেই। রেলিং থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে নীচে। এক বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে তাকে লুপছে। বৃদ্ধ অবাক। দু' বছর বয়সে শিশুর যে দৈহিক ওজন হওয়া দরকার—শিশু ঠাকুরের তা নেই। একটি ফুলের মত হাল্কা কি জানি উনি ধরলেন। মিছিল এগিয়ে চলে। আরো দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যায় মিছিল সামনের দিকে।

ধরলেন। মিছিল এগিয়ে চলে। আরো দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে যায় মিছিল সামনের দিকে।

এসব উক্তি অবশ্য কতখানি সঠিক জানি না। কারণ আমার বয়সের সঙ্গে ঠাকুরের বয়সের ত তুলনা করা যায় না। পঠিতব্য এসব উক্তি। তবে সম্ ধ্যান ধারণা দিয়ে ভাবলে গভীর সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে চিন্তা করলে একটা জিনিস পরিষ্কার হয় যে মহাপুরুষের যে সমস্ত অলৌকিক প্রক্রিয়া জীবনের উপর দিয়ে বহে যায় সেটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। যেমন একজন বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর দুনিয়া শুদ্ধ লোককে তার অভাবনীয় খেলার মধ্যে সবাইকে সম্মোহন করে রেখে অবাক করে দেয় তার সাধনাকে। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক যেমন দুনিয়াকে চমকে দেয় তার সারাজীবনের কঠোর পরিশ্রমের সাধনার ফলকে আবিষ্কার করে। তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে এ সব চিন্তা করলে মনে হবে এই অলৌকিক ঘটনাগুলো যুক্তির মত স্বচ্ছ। পরিষ্কার হয়ে যায় যারা পৃথিবীতে যে কোন দিকেই কোন দাগ রাখে তাদের জীবনের কর্ম পদ্ধতিটাই একেবারে ভিন্ন ধরনের। তাঁদের ভেতর এমন এক ক্ষমতা থাকে যা আর কারো মধ্যে দেখা যায় না।—হ্যাঁ কেউ যদি বলে মার্কসের থিসিস টেনে যে সব মানুষের ক্ষমতা একই। সব মানুষই পারে বিবেকানন্দ হতে. রবীন্দ্রনাথ হতে বা তদ্রূপ কোন ব্যক্তি হতে। ব্যাপারটা মেনে নেওয়া গেল। কারণ একজন কীর্তি পুরুষের শরীর ও বুদ্ধিতে যা যা আছে একজন সাধারণ মানুষের ও সেই উপাদানই আছে; তথাপি সেই সাধারণ ব্যক্তিটি কেন রামকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেব বা সেক্সপিয়র বা তদ্রূপ কিছু হচ্ছে না? এখন যুক্তি আসে সাধনার কথা। অধ্যাবসায়ের কথা। ঠিক ঠিক উপায়ে জীবনের স্তর গুলিকে সাধনা এবং শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ করার সুযোগের ব্যবহার। ব্যাপারটা সত্য হলেও তবু ত একটা কথা বলতেই হয় এই 'ক' ব্যক্তিটি যে·

আজ স্বামীজী বা ঋষি অরবিন্দ বা রামমোহন এ ধরনের মানুষের জীবনেও যে সমস্ত স্তর অতিক্রম করার ধারা আছে সেগুলো ভাবলে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের পক্ষে গল্পই মনে হয়। কারণ তার পক্ষে ঐ জীবন ছোঁয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই যা অলৌকিক বলে ধারণা করা হচ্ছে তা সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা ধ্যান করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যাহোক শিশু ঠাকুরের জীবনের রূপান্তরগুলিকে এমনভাবে দেখি যা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে প্রক্রিয়াগুলি অলৌকিক লাগে। এমনই আর একটি ঘটনা দেখি যখন শিশু ঠাকুরেব চার বছর বয়স। হঠাৎ তাঁকে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। যখন ঠাকুরকে পেল তখন দেখা গেল ঠাকুরের ভাবমূর্তি অন্য রকম। শিশু চার বছর বয়সে কলাবাগানে আত্মস্থ হয়ে ধ্যান করছে। সাধারণ গৃহস্থ শিশুদের কি এই প্রক্রিয়া করতে দেখা যাবে? আমার বিচার বুদ্ধিতে বলে ব্যাপারটা ভাবতে হবে। মনে হয় ত পাওয়াটা বড়ই দুষ্কর। তারপর দেখা গেল এই ধরনের ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলিকে বাড়ির আপন পরিজন অবজ্ঞা করছে। হাসিচ্ছলে কেউ কেউ উড়িয়ে দিচ্ছে ঘটনাগুলি। কিন্তু এসব দৈবিক ক্রিয়ার গুণে যখন পাড়া প্রতিবেশী এসে ভীড় করতে লাগল তখন কিন্তু গোটা ব্যাপারটায় শেষমেষ আত্মীয় পরিজনদেরও পরিবর্তন দেখা গেল।

দেশের বাড়িতে আত্মীয় পরিজনদের সাথে শিশু ঠাকুর বাগানে ফুল তুলতে যান। সবাই ফুল তুলে ডালিতে রাখছে ফুল। আব শিশু ঠাকুর তখন সেই ডালি থেকে ফুল তুলে নিজের পায়ে চড়াচ্ছেন। পরিজনরা বলে 'ভগবান শাপ দেবে'! ঠাকুর নাকি তখন বলে 'তোদের ঠাকুর বুঝি খুব রাগী? আমি যদি ঠাকুর হতাম তবে কখনও রাগ করতাম না। বরং সবাইকে ভালবাসায় ডুবিয়ে রাখতাম।' কখনও বলেছেন "পাথরের ঠাকুরকে ফুল চড়িয়ে কি লাভ? পাথর যদি ঠাকুর হয় তাহলে মশলা পেষা নোড়াটাও ভগবান।" এসব উক্তি নিশ্চয়ই সব শিশুর মধ্যে পাওয়া যায় না।

যতই দিন যায় মুখ দিয়ে পরিস্ফুটিত হয় নানা তত্ত্ব কথা। অ-আ ক-খ শিখছেন যখন শিশু ঠাকুর সবেমাত্র তখনই ঠাকুর মাষ্টার আনন্দকে বলেছেন, "আমরা সবাই চৈতন্যময়। আমরা বিরাজ করছি এই মহাশূন্যে। যার কোন সীমা নেই। সীমা হীন জগতে আমরা সবাই এক। আমি আপনি আমরা সবাই এক মায়াতে ডুবে আছি। বাস্তব বোধ নিয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর ক্রিয়া

করে যান।' বাস্তবের এই ধারা দিয়েই চলে যান, ঢুকে যান সেই ধারাতে যে ধারাতে এসেছেন।"

রুমি বলল দাঁড়াও। আমি একটু আসছি। এই বলে রুমি উঠে যায়। ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারে রুমি কি আনতে যাচ্ছে। রুমি কফি নিয়ে। ইন্দ্রজিৎ মলিন হাসি হাসে।

কেমন লাগছে?

এখন কিছু বলব না।

কেন?

পুরস্কারের জন্য এত অস্থির হচ্ছ কেন?

ইন্দ্রজিৎ শুরু করে।

লোকটি জন্মসিদ্ধ হয়েই এসেছে। অর্ধসিদ্ধ পুরুষ। শরীর দিয়ে প্রকাশ হতে থাকে অনিমা লঘিমা প্রাকাম্য প্রভৃতি জ্যোতি। সবার সঙ্গে মিশছেন। সবার সঙ্গে খেলা করছেন। এই খেলার মধ্যেই শিশু ঠাকুর নৈতিক কথা বলছেন সবাইকে।

পাঁচ বছর বয়স। এবার শিশু ঠাকুর ভর্তি হন পাঠশালায়। পাঠশালা পেরিয়ে উজনিচর কংসনারায়ণ হাইস্কুলে পড়েন। লেখা পড়াতেও ছিলেন, শিশু ঠাকুর মেধাবী ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনায় বেশি সময় দিতে পারে না। শিশু অবস্থা থেকেই তাঁর কথা শোনার জন্য ভীড় করতে থাকে মানুষ। ঠাকুরের কাছে আমার জন্য পাগল। আস্তে আস্তে তারা ভক্ত হয়ে ওঠে। তখন ভক্তদের আবার আর এক চাহিদা। তাদের সঙ্গো দাও। এভাবে যতই দিন যায় হিন্দু মুসলমান জাতপাত নির্বিশেষে উপচে উঠে ভীড়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি একবার জলের উপর দিয়ে হেঁটে যান। আধ্যাত্মিক শক্তি কতখানি প্রখর এবং উন্নত হলে যা এটা সম্ভব। ভক্তরা এসব দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই দীক্ষা দেওয়ার আবেদন আসতে থাকেন। ছয় সাত বছর বয়স থেকে এই আবেদন প্রচণ্ড রকম তীব্র হয়ে ওঠে। তাঁকে দীক্ষা নিতেই হবে। মানুষের আত্মিক চাহিদা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষ হয়ে ওঠে আর এক ধরণের উন্মাদ। ধর্ম ভীরু মানুষের এই প্রক্রিয়া ভয়ঙ্কর রকম নরম।

একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রতিনিয়তই নিত্য নতুন সব কাণ্ড। শিশু ঠাকুর সবাইকে নিয়ে জপ ধ্যান করতে বলেন। শিশু থেকে বয়স্ক ব্যক্তিরাও এই ধ্যানের সামিল হন। শিশু ঠাকুর ধ্যান করতে করতে হঠাৎ

অদৃশ্য হয়ে পড়েন। বন্ধুদের নিয়ে রাত্রে ধ্যানে বসেন। এভাবে শিশু ঠাকুর নানা জায়গায় ভক্তদের নিয়ে তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য ধ্যানে যোগ দেন। ঠাকুর ধ্যান করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেলে সবাই অস্থির হয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেল ঠাকুর নদীর পারে মিষ্টি সুর তুলে গান গাইছেন। ভক্তরা গিয়ে দেখে সেখানে তিনি নেই। এভাবে যখন ভক্তরা খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন এসে তিনি স্বশরীরে সবার কাছে এসে ধরা দেন।

একবার ভক্তরা ঠাকুরকে বিভূতি সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর সহজ সরল ভাষায় তার উত্তর দেন। ঠাকুর বলেছেন—একটা লাফ দিয়ে যদি শূন্যে এক সেকেণ্ড থাকা যায় তাহলে দশ বা কুড়ি মিনিট বা দু' ঘণ্টা বা তারও বেশী থাকা যাবে না কেন? তোমরা বলবে এ কি করে সম্ভব? অসম্ভব—অসম্ভব। এ কখনই সম্ভব নয়। তোমরা এই অসম্ভব আর পারব না পারব না বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছ। —যদি তোমাদের বলা হয় যাও নদীর উপর দিয়ে হেঁটে যাও—তোমরা শুনে আৎকে উঠবে। এ কি বলছেন। মানুষ কি কখনও এসব পারে? আসলে তোমরা না পারার সাধনাতে করেছ সিদ্ধিলাভ। জয় করার সিদ্ধিলাভ তোমরা অর্জন কর নি। পিনের খোঁচা দিয়ে মনের 'কিন্তু' টাকে দূর করে ফেল। আমার কাছে সব সমাধান হয় কেমন করে। আসলে আমি সমাধানের জন্য যা করা দরকার সেই সিদ্ধি কাজটি করে থাকি বলেই পেরেছি। তাই তোমরাও পারবে। যদি সেভাবে নিজেকে তৈরী কর। নিজের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শক্তি। শক্তির উৎসকে জাগাতে হবে। তার জন্য চাই জপ ধ্যান সাধনা। কঠিন পরিশ্রম।

এই জীবের প্রতি তাঁর অকাতর দয়ার উদাহরণ অজস্র। মনসাপূজা উপলক্ষে বণিকদের বাড়িতে 'রয়ানি' গান চলেছে। তিনি দেখলেন একটি মরা প্রজাপতি লুটিয়ে আছে একপাশে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে তার দেহের অংশগুলি। ঠাকুর একে একে কুড়িয়ে আনেন ছিন্ন দেহগুলি। তারপর জোড়া লাগিয়ে কোথা থেকে একটু জল ছিটিয়ে বললেন 'যা' উড়ে যা। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল প্রজাপতিটা।

বালক বয়স থেকেই ঠাকুর চিন্তা করতেন সাধারণ মানুষদের কথা। তাদের সুখ দুঃখের কথা। কিভাবে তাদেরকে সংসারের এই কঠিন নির্মম দুঃখ থেকে একটু মুক্তি দেওয়া যায়। তাদেরকে কি করে কাছে টানা যায়। এই সাধারণ মানুষদের ভাবনায় সব সময় ডুবে থাকতেন।

আচ্ছা ঠাকুরের এসব কি সবই সত্য। কেন শত শত লোক এসে ভীড় করছে। জাদু মন্ত্রে? কি এই কারণ। এক ভক্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম।

কিভাবে আপনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এলেন ?

ভক্তটি বলল। এক কথায় জানা এবং সত্যিকারের গুরুর সঙ্গ লাভ করার জন্য। ঠাকুরের কাছে আমার আগে আমি স্বরূপানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্য মনস্থির করেছিলাম। দীক্ষার দিনও প্রায় ঠিক। এই দীক্ষার দিন ঠিক করার চারদিন আগে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার উপর আবিষ্ট হন। এবং বলেন তুই আমার কাছে চলে আয়। আমি-ই তোর গুরু। এই আদেশ শুনে আমি মন পরিবর্তন করি। ঠাকুরের খোঁজ খবর নেবার পর তারপর একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। ঠাকুরের কাছে আমার বক্তব্য খুলে বলি। ঠাকুর সব শুনে আমাকে ভরসা দেন। এবং কাছে টেনে এনে আমাকে দীক্ষা দেন।

ঠাকুরের অলৌকিক ক্রিয়া এবং মহিমা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

ব্যক্তি জীবনে ঠাকুরের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। যা অভাবনীয়। এবং বাস্তব। কিন্তু আমাদের কাছে অসম্ভব বলে সেগুলি অলৌকিক বলে মনে হয়েছে। যেমন ঠাকুর একদিন হঠাৎ আমায় বললেন জীবনী গ্রন্থ পাঠ কর তুমি। তোমাকে অত পড়াশুনা করতে হবে না। ঠাকুরের একথা লেগে যায়। আমি জীবনীগ্রন্থ পড়া শুরু করি। এরপর যত রকম প্রশ্ন উদীত হয়েছে মনের ভেতর তার কাছে গিয়ে সব সমাধান হয়েছে। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে আমি আমার সমস্ত দেহমন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম এই জীবনীগ্রন্থ পাঠ হল আমারই জীবনের অজস্র কাহিনী। যা প্রকৃতির মাঝে অসংখ্যরূপে প্রতিভাস। এছাড়া একদিন আমি একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়ে যাই। ঠাকুর আমাকে সেই বিপদ থেকে তখন রক্ষা করেন।

এই ভক্তটির নাম অবনী সামন্ত।

জান ঠাকুর আবার কবিও। অর্থাৎ কবিত্ব সত্তা বিরাজমান তাঁর অন্তর জগতে। এই কবিত্ব সত্তার জন্য ঠাকুর প্রকৃতিকে খুব ভালবাসেন। মাঝে মাঝে তিনি আগে তিব্বতে চলে যেতেন। তিব্বতে গেলে পাহাড়ের মানুষরা তাঁকে খুব কাছের বলে মনে করতেন। একবার তিব্বতে গেলে সেখানে লং পাহাড়ে শিবের ছিল একটি ত্রিশূল পোতা। এত ভারী ছিল যে চার পাঁচ জন মিলেও নাকি সেই ত্রিশূল নড়ান যেত না। সেই ত্রিশূল ঠাকুর শিশু বয়সে

তুলে ফেলেন। ঠাকুরের এই মহস্ত দেহে পাহাড়ের মানুষরা ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। কথিত ছিল নাকি এই ত্রিশূল যিনি তুলবেন তিনি শক্তিতে শিবের সমতুল্য হবেন। পৃথিবীকে তিনি শাসন করবেন।

রুমি বলল এই মহাপুরুষ নাকি বেদ সম্পর্কে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই নাকি?

ঠিক বলেছ রুমি। ঠাকুর তাঁর তত্ত্ব দর্শন আদর্শের মাধ্যমে যে ধর্মের কথা বলেছেন সেই ধর্মের সঙ্গে কোথায় যেন অধিকাংশ তথাকথিত গুরুদেব ধর্ম-মতের সঙ্গে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ধর্মের কথা যদিওবা বেদের উপর ভিত্তি করেই। তবু তথাকথিত লিখিত বেদের সঙ্গেও যেন অমিল রয়ে গেছে।

বেদে যে সব মূর্তি যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলির এই অর্থ নয় যে স্বর্গ থেকে কোন দেবতা ধরে এনে পৃথিবীতে স্থাপন করা। মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব বা বিবেক রয়েছে তাকে সঠিকভাবে সাধনার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলা। মর্তকে স্বর্গে তৈরী করা।

মূর্তিপূজা হচ্ছে মানুষের মনের কল্পনা প্রসূত নানান তত্ত্ব সৃষ্টির ফসল। —যেমন সূর্য চন্দ্র অগ্নি পবন ইন্দ্র এদের মূর্তি তৈরী করে নিজেকে গড়ার জন্য এবং অপরকে ঘুমন্ত দশা থেকে জাগিয়ে বেঁচে ওঠার প্রেরণা জোগান।

বেদে আছে যারা বেদের সুর বিকৃত করে মানুষের মধ্যে প্রচার করছে আর সমাজকে বিভ্রান্ত করছে তারাই অসুর। তারাই রাক্ষস যারা নিজের স্বার্থের জন্য লোককে ঠকায়।

ঠাকুর বলছেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে।' অর্থাৎ আপনার ভেতরকার দেবত্বকে জাগিয়ে তোলা! যখনই দেখবে সমাজে দুস্কৃতকারী আর অপরাধীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সমাজকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখনই রুখে দাঁড়াবে।

জান আমি এই অল্প বয়সে বহু জায়গায় গিয়েছি। বহু মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি। কাজ এবং কিছু করার প্রবণতার তাগিদে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের কাছে ছুটে গিয়েছি বারবার। ছুটছি এখনও। কিন্তু পুরোপুরি স্থির হতে পারছি না। এরকম ভাবে ছুটতে ছুটতে একদিন ছুটে গেলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। কি দেখলাম সেদিন জানি না। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মানুষ তাকে দেখার জন্য তাঁর চরণ স্পর্শ করার জন্য উন্মত্ত। এক দৃষ্টিতে আমি দিনের পর দিন তাঁকে কাছে দেখেছি। অনিন্দ্যরূপ। যেরূপে ছড়িয়ে রয়েছে অভিষেকময় জ্যোতি। মুগ্ধ হতেই হবে। নির্বিকার সচ্চিদানন্দের

মত বসে আছেন তিনি। এই ঘোর কৃত্রিম জটিল বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়েও তিনি চৈতন্যময়। ছুটে যান না তিনি পাহাড়ে, অরণ্যে, গহ্বরে, আপন মহিমাকে নিয়ে একাকি জীবন কাটাতে। এই বাস্তবের মধ্যেই সংসারী ভক্তদের নিয়ে তিনি আত্মস্থ হয়ে আছেন। সবাইকে বুকে টেনে নিচ্ছেন। সংসারের মানুষরা তাঁকে পেয়ে যেন স্বস্তি পান। আমার দেখার এখনো শেষ নেই। প্রতিদিনই দেখছি। আগামী দিনে আরো দেখব।

রাস পূর্ণিমায় শুনেছি হাজার হাজার মানুষ আসছে ঠাকুরকে প্রণাম করতে। আসছে ভক্তির অর্ঘ তুলে দিতে। তাদের আর কোন দেবতা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরই দেবতা।

ঠাকুর নানা জায়গায় আজো ঘুরে লোক শিক্ষার জন্য সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে বিপাকে ফেলার জন্য জিজ্ঞাসা করেছেন আন্দোলন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদ ও শান্তি বর্তমানে কি করে পাওয়া সম্ভব?

ঠাকুর হেসে বলছেন, "সাম্যবাদ হল সমতার সুর। সমভাবে সমতালে কর্মীরা একত্রিত হয়ে কাজ করে। মধুকর যেমনটি। প্রকৃতির দিকে তাকালে এটা সহজেই বোঝা যাবে। তার সবদিক বিচার করলে দেখা যায় তার যা কিছু কর্ম পদ্ধতি যা কিছু কর্ম প্রবাহ সব সমসুরে সমতালে একই সুরে সমতালে একই সুরে সমন্বিত। প্রকৃতিকে আলাদা করে দেখলে শুধু একটি কণা। কিন্তু দেখ ঐ সহস্র কণা নিয়েই সব। যেমন মাটির কণা। বৃষ্টির কণা। শিশির কণা। এরা আলাদা কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃতির গুণে একত্রিত হয়ে যখন পৃথিবীতে নামছে তখন তারা কি না করছে। এই ভূ-লোক জীব-লোক ঐ কণা শক্তি হতেই সব কিছু। সেই শক্তি ও বস্তু নিয়েই জীব-লোক প্রতিষ্ঠিত।

ভক্ত আবার জিজ্ঞাসা করছেন সাধু মহানদের কি রাজনীতি করা উচিত?

ঠাকুর বলছেন। জোনাকি তার নিজের আলোতে থায়। ফণী থায় মণির আলোতে। আর দেখ সূর্যের আলোতে দুনিয়া শুদ্ধ থায়। ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যক্তির স্বার্থে সত্যিকারের সাধু মহানদের প্রভাব ব্যক্তির স্বার্থে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে ন্যায় ও নীতি তাই ধর্ম।

ভক্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করছেন আচ্ছা ঠাকুর আপনি কিভাবে বেদের মাধ্যমে দেশে সাম্যবাদ আনতে চান?

ঠাকুরেরও সহজ সরল উত্তর। বেদের সাম্যবাদটি কি এটা আমার আগে

তোমাদের এটা জেনে নেওয়া দরকার বেদ কি? আগেই এটা জানা দরকার। বেদ হল একটি শাস্ত্র। যার মৌলিক অর্থ জ্ঞান। তার আদি অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। বেদ হল সম্পূর্ণ প্রকৃতিদত্ত। বেদ হল সমাজভিত্তিক বিজ্ঞান—তার প্রথম কথাই হল সংস্কার বিমুক্তি।

বেদের দুটি ধারা। একটি হল আস্তিক্যবাদ। আর একটি হল নাস্তিক্যবাদ। এক একজন এক একটি ধারা চর্চা করে বড় হয়। যেমন চাণক্য মুনি তিনি বস্তুবাদের প্রতিনিধিরূপে খ্যাত। আর আস্তিক্যবাদিরা তারাও সমাধান দেখালেন বেদ থেকেই। আমি বলব বেদের এই উভয় ধারাই পরস্পর নির্ভরশীল। 'আছে' বা 'নাই' এর সমাধান বেদেই পাওয়া যায়। বেদ বলছে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলে কিছু থাকবে না। ধনী-দরিদ্র বলে কোন শ্রেণী থাকবে না। থাকবে সবাই এক সাথে সমান হয়ে। সবাই সমান অধিকার নিয়ে এই সংসারে বাঁচবে।

বেদ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে বেদের সাম্যবাদে একটি ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও থাকবে সমান অধিকার। বেদে রয়েছে সমানভাবে ভোগ্য দ্রব্য বণ্টন করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজে নিজে ভাগ করে নেওয়ার কথা। অর্থাৎ কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে না।

একটি লোকও অনাহারে দিন যাপন করবে না। ভিক্ষাবৃত্তি থাকবে না। সঞ্চয় বুদ্ধি রাখবে না কেউ। অব্যবহৃত ধন কাজে লাগাবে সবাই। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে সবাই। অভাব যারা তৈরী করবে তাদের বিরুদ্ধে করবে লড়াই।

ভারতবর্ষে যদি সাম্যবাদ আনতে হয় শুধু শ্রমিক কৃষকদের জাগালেই হবে না। পীড়িত লাঞ্ছিত ভিক্ষুকদেরও জাগাতে হবে। ভারতবর্ষ হল ধর্মের দেশ। বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদের সঙ্গে হাত না মেলালে মার্কসবাদ লেলিনবাদ বা মাওবাদ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। বৈদিক সাম্যবাদ ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদ শুধু নামেই পার্থক্য। নীতির দিক থেকে এক।

ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ, চীন আর রাশিয়া এই তিন সাম্যবাদের দেশ এক সাথে হাত মিলিয়ে একদিন গোটা পৃথিবীতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করবে।

ঠাকুর কতটা যুক্তি বিশ্বাসী। কতটা বিজ্ঞান বিশ্বাসী। তার ভক্তের প্রশ্নের দেওয়া ঠাকুরের উক্তিতে বোঝা যায়। ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আজকের বাংলা বা ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিগুলি যতই সাম্যবাদ

করে চেঁচাচ্ছে—আমার ত মনে হয় প্রকৃত সাম্যবাদের সুর কারুর মধ্যেই নেই। তাদের মূল উদ্দেশ্য গদী দখল করা। ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থই একমাত্র লক্ষ্য। আপনি কি বলেন ?

ঠাকুর ব্যাখা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভক্তের দেওয়া প্রশ্নটিকে।

জান ত উইপোকার কখন পাখা গজায়। যখন আগুনে পুড়ে মরার সময় আসে। তাই এত ভাববার কি আছে ? নিজের মধ্যে আগুন যখন লেগেছে তখন সে আগুনে পুড়ে সব একাকার হবেই। সব দল সাম্যবাদের নীতিতে ছেঁকে এক নতুন সংগঠন গড়ে উঠবে। তাদের নীতি হবে তখন বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ। আজকের দিনে বেঁচে থাকতে হলে এই বেদভিত্তিক সাম্যবাদই দরকার।

মহান দার্শনিক সক্রেটিস বলছেন 'সত্যের জন্য ছাড়িতে পারি না এমন সুখ নাই। সহিতে পারি না এমন দুঃখ নাই। করিতে পারি না এমন কঠিন কর্ম নাই।' শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ তাই। তিনি সত্যের পূজারী। আত্মানুসন্ধানী। যোগীবর।

—একি করছ ?

—তোমার চোখে যে জল। ছিঃ-ছিঃ তুমি প্রণাম করছ।

—না গো তুমি সত্যিই একজন বড় লেখক। তুমি এমন লোকের জীবনী লিখেছ যিনি সত্যি ব্রহ্মময় পুরুষ। আমি যাব শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে। ইন্দ্রজিৎ রুমিকে নিয়ে ঠাকুরের আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলে।

উমাশংকর